ধর্ম্ম-সাধন

———০:*:০———

শ্রীললিতমোহন দাস, এম, এ।

দ্বিতীয় সংস্করণ
সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত
(১৯৩২)

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন, বি, এ, কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য বার আনা মাত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

"ধর্ম্ম-সাধন" গ্রন্থখানি বহুবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি উহা নিঃশেষিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অর্থের অনটন বশতঃ উহা এবৎসর পুনঃ প্রকাশিত করিতে সমর্থ না হওয়াতে আমার ভ্রাতৃসম শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের উৎসাহে ও কন্যোপমা শ্রীমতী স্থরমা সেনের আংশিক অর্থ সাহায্যে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে অগ্রসর হইয়াছি। বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, স্নেহভাজন শ্রীমান্ অনিলকুমার সেন এম্-বি, ও শ্রীমান্ অপর্ণাচরণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, ইহার প্রুফ দেখিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত আমি এ রুগ্ন অবস্থায় পুস্তক প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতাম না। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেনের বিশেষ উৎসাহ উদ্যোগ ও শ্রীমতী স্থরমা সেনের অর্থ সাহায্য ব্যতীত এ কার্য্য সম্পন্ন হইত না। তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এতৎসঙ্গে কৃতজ্ঞতাসহকারে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের সময় আমি অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় শ্রীমান্ দীনবন্ধু রায় আমার রোগে অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের মধ্যেও এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠাইবার উপযুক্ত করিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সে সময় তাঁহার সাহায্য না পাইলে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ এত শীঘ্র প্রস্তুত হইত কিনা সন্দেহ।

২৮ বি, নন্দকুমার চৌধুরী
লেন, কলিকাতা।
৬ই ভাদ্র, ব্রাহ্মসংবৎ ১০৫।

বিনীত
শ্রীললিতমোহন দাস

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানির অধিকাংশই নলধা আলোচনা সভাতে পঠিত হইয়াছিল; তৎপরে তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকায় 'ধর্ম্মজীবন' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া "ধর্ম্ম-সাধন" নামে প্রকাশিত হইল।

স্মরণাতীত সময় হইতে যতগুলি প্রশ্ন মানব মনকে আন্দোলিত করিয়াছে, তন্মধ্যে বোধ হয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নই শ্রেষ্ঠ। চিরদিনই মানব হৃদয় হইতে কি এক ব্যাকুলতার উচ্ছ্বাস উৎসারিত হইতেছে। যুগের পর যুগ জ্ঞানিগণ ও সাধকগণ এই ব্যাকুল প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু মানবহৃদয় সেই একই উৎকণ্ঠিত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছে।

জড় জগতের ন্যায় আধ্যাত্মিক জগতেও কি এক সুমহৎ বিবর্ত্তন চলিতেছে। পূর্ব্বে জ্ঞানিগণ যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, বর্ত্তমান সময়ে জনসমাজ তদপেক্ষা উন্নততর সোপানে দাঁড়াইয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয় করিতেছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজগুলি আপনাদের জাতীয় ক্ষুদ্র পার্থক্য ভুলিয়া এক মহৎ একত্বের দিকে ধাবিত হইতেছে। এই বিশুদ্ধ ও উন্নততর ধর্ম্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে সাধন প্রণালীও বিবর্ত্তিত হইতেছে। ধর্ম্ম সাধন মানবীয় বৃত্তিগুলির বিকাশে ও সামঞ্জস্যে; বিনাশে বা নিষ্পেষণে নয়; বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানিগণ সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন। এ সাধন প্রণালী জ্ঞানবর্জ্জিত ভাবে নয়, শুষ্ক বৈরাগ্য অথবা অযথা সন্ন্যাসে নয়;—

ইহাতে সত্য, ন্যায়, পরোপকার, ইন্দ্রিয়সংযম, স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সমুদয় মানবীয় ভাবগুলিরই স্থান আছে; কেবল তাহা নয়, যে সকল বৃত্তিকে নিকৃষ্ট বৃত্তি বলা হয়, তাহাদেরও কার্য্য রহিয়াছে। এই মহৎ বিকাশই বর্ত্তমান যুগের সাধন প্রণালীর বিশেষত্ব। লেখক এই সাধন প্রণালীর কিঞ্চিৎ আভাস দিতে যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছেন।

ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, যাঁহারা বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিতে অর্দ্ধজীবনব্যাপী কত যত্ন, কত পরিশ্রম, কত আত্মত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারাই আবার দৈনিক নিয়মিত বা অনিয়মিত অর্দ্ধ ঘণ্টা উপাসনা করিয়া দুই চারি বৎসর পরে ধর্ম্ম সাধন হইল না বলিয়া ধর্ম্মেই অবিশ্বাস করিতে আরম্ভ করেন, অথবা আপনাদের সাধন প্রণালীতে ক্রটী দেখিতে পান। কিন্তু ধর্ম্ম সাধন যে বিদ্যোপার্জ্জন অপেক্ষা সহস্র গুণে কঠিন এবং ইহাতে যে কঠোর আত্মত্যাগ ও কঠোরতর আত্মসংযমের প্রয়োজন, তাহা তাঁহারা ভুলিয়া যান। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ধর্ম্ম সাধন মানব জীবনের কি উচ্চ অধিকার। ব্রহ্ম লাভই ধর্ম্ম সাধনের লক্ষ্য। চিরদিনই আমরা তাঁহার আরাধনা করিব এবং চিরদিনই তিনি আমাদের আরাধ্য থাকিবেন,—এই অনন্তকাল ব্যাপী সাধনাই কি মানব জীবনের মহত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে না?

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনই সাধনার পরিচায়ক ও পরিজ্ঞাপক। কিন্তু ভোগলিপ্সা, পরনিন্দা, চঞ্চলতা, যশস্পৃহা, ইন্দ্রিয়াসক্তি প্রভৃতি সাধনার কত গুলি অন্তরায় আছে। যাঁহারা প্রকৃত ধর্ম্ম জীবন লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে এ সমুদায় গুলিকে নিয়মিত করিতে হইবে। কিন্তু অনেক সময়ে সাধনার নামে জড়তা ও শিথিলতা, ধর্ম্মবিশ্বাসের নামে ভ্রান্তি, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। কঠোর আত্ম-

পরীক্ষাই তখন একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যক্ষ অন্তরায় গুলি যত না ক্ষতি করে, এই আত্ম প্রতারণা তদপেক্ষা সহস্রগুণে সর্ব্বনাশ করে এবং ইহাতেই অনেক সাধককে তাঁহাদের অবলম্বিত পথ হইতে দূরে লইয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের তুলনায় পরবর্ত্তী জীবনকে ম্লান করিয়াছে। সাধককে এই আত্মপ্রতারণা হইতে সর্ব্বদা মুক্ত থাকিতে হইবে। এ বিষয়টিও লেখক সাধ্যানুরূপ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় পুস্তকখানির অধিকাংশ দেখিয়া দিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়াছেন; এজন্য আমরা তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমাদের আত্মীয়া কোন সহৃদয় মহিলা সাময়িক অর্থসাহায্য করিয়া এ পুস্তকখানির প্রকাশের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন; তাঁহার সাহায্য না পাইলে এই পুস্তক কখনই এরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতে পারিত না। এজন্য আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিতেছি। যদি এ পুস্তকখানি কাহারও ধর্ম্ম জীবনের কিঞ্চিন্মাত্রও সাহায্য করিতে সমর্থ হয়, তবে লেখক আপনাকে ধন্য মনে করিবেন।

ব্রাহ্ম-ছাত্র-নিবাস,
১০৭, মেছুয়াবাজার রোড, কলিকাতা।
মাঘ, ব্রাহ্মসংবৎ ৭০।

শ্রীঅশ্বিনীকুমার সেন, বি, এ
প্রকাশক।

দ্বিতীয় সংস্করণের

প্রকাশকের ভূমিকা।

৩২ বৎসর পূর্ব্বে (১৯০০ খৃঃ অঃ) 'ধর্ম্ম-সাধন' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থকার নিজ ব্যয়ে ও কোন আত্মীয়ার অর্থ সাহায্যে গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন ও তাহার ৫০০ শত খণ্ড সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে দান করেন, এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রচারকার্য্যে ব্যয়িত হয়। এতদিনে পুস্তকখানি নিঃশেষিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অর্থের অনটন প্রযুক্ত পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে অসমর্থ হন। অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষার্থীদিগের পক্ষে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছে। গ্রন্থকারের স্নেহভাজন কোনও মহিলার আংশিক অর্থানুকূল্যে এই পুস্তকখানি পুনঃ প্রকাশিত হইবার সুবিধা হইল। গ্রন্থকার রোগশয্যাতে বসিয়াই ইহার সংশোধন, ও পরিবর্দ্ধনাদি করিয়াছেন। আশা করি, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের তরুণ তরুণীগণ এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন।

২৮ বি, নন্দকুমার চৌধুরীর লেন,
কলিকাতা ৬ই ভাদ্র, ব্রাঃ সং ১০৫

শ্রীঅন্নদাচরণ সেন
প্রকাশক।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
উপাসনা	...	॥০
ধর্ম্ম-জীবন	...	১
ধর্ম্মে পরীক্ষা	...	৬
জ্ঞান	...	১৫
সত্যনিষ্ঠা	...	১৯
আত্মচিন্তা ও দীনতা	...	২৬
প্রেম সাধন	...	৩১
উপাসনাতত্ত্ব		
উদ্বোধন	...	৩৩
প্রার্থনা	...	৪১
প্রার্থনার বিষয় ও দায়িত্ব	...	৪৬
আরাধনা	...	৫৩
ধ্যান ও সমাধি	...	৬২
সমবেত উপাসনা	...	৭১
(১) সামাজিক উপাসনা	...	৭২
(২) পারিবারিক উপাসনা	...	৭৪
সেবা ধর্ম্ম		
সংসার ও ধর্ম্ম	...	৭৫
ধর্ম্ম ও সংস্কার কার্য্য	...	৮৪

বিষয়		পৃষ্ঠা
সেবার বিধান	...	৯২
ধর্ম্মজীবনের অন্তরায়	...	১০১
বহিঃশত্রু	...	১০২
অন্তঃশত্রু	...	১২৪
বৃত্তিবিভাগ		
নিন্দাপরায়ণতা ও বিদ্বেষভাব	...	১২৭
প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ক্রোধ	...	১২৯
সন্দিগ্ধচিত্ততা ও ভয়	...	১৩১
ভোগলিপ্সা ও আহার বিহার	...	১৩৩
ইন্দ্রিয়াসক্তি ও প্রজাবৃদ্ধি	...	১৩৫
চঞ্চলতা ও কার্য্যতৎপরতা	...	১৪২
লোভ	...	১৪৫
আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ব	...	১৪৭
অনুশীলনপ্রিয়তা	...	১৫৫
ভাবপ্রবণতা ও প্রেমভক্তি	...	১৫৯
ন্যায়পরতা	...	১৮৪
বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য	...	১৮৬
সাধুর লক্ষণ	...	১৯৮
নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক নিয়ম	...	২০৭
ব্রাহ্মসমাজের বাণী	...	২০৯

উপাসনা*

সঙ্গীত

প্রতি দিন আমি হে জীবন-স্বামী
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।
করি যোড় কর হে ভুবনেশ্বর
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে,
নম্র-হৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে,
ওগো রাজ রাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।

উদ্বোধন

ওঁ পিতানোঽসি পিতা নো বোধি নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ।
বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরা সুব।
যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥

---

* ব্যারামে কিংবা অন্য কারণে লোকের এমন অবস্থা সময় সময় হয় যে তখন সে নিয়মিতরূপ উপাসনা করিতে সমর্থ হয় না। তখন উক্ত রূপ স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া উপাসনা করা যাইতে পারে। খৃষ্টীয় লর্ডস্ প্রেয়ারটী আমি একটু একটু পরিবর্ত্তন করিয়া নিজের উপযোগী করিয়া লইয়াছি।

নমঃ সম্ভবায় চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায় চ
ময়স্করায় চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।

ওঁ যোদেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু
যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
তস্মৈ দেবায় নমোনমঃ।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।
একো বশী সর্ব্ব ভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্ ॥

যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
যশ্চায়মস্মিন্নাত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥

ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

আরাধনা

ওঁ সত্যম্ জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি
শান্তং শিবমদ্বৈতম্
ওঁ সপর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূ
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্যধারিণী
ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।

ধ্যান

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং
ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ।

প্রার্থনা

অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।

আবিরাবীর্ম্ম এধি রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং

তেন মাং পাহি নিত্যম্।

Our Father, which art in Heaven,
Hallowed be Thy name,
Thy kingdom come
Thy will be done on earth as it is in Heaven

Give us this day and every day our daily bread, and resting place.

Give us this night and every night our nightly rest and sound sleep.

Give us strength and patience to accept cheerfully Thy benign providences.

Give us peace of mind and strength of character and capacity for loving and worshipping Thee and doing Thy will.

Forgive us our tresspasses as we should forgive those that tresspass against us.

Forgive us our sins and iniquities

Lead us not into temptation but deliver us from evil. For Thine is the kingdom the power and the glory for ever.

Amen.

ওঁ লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসার যাত্রা মনুবর্ত্তয়িষ্যে ।

স্তোত্র

নমো নমস্তে ভগবন্ দীনানাং শরণ প্রভো,
নমস্তে করুণাসিন্ধো নমস্তে মোক্ষদায়ক ।
পিতা পাতা পরিত্রাতা ত্বমেকং শরণং সুহৃৎ,
গতির্মুক্তিঃ পরা সম্পৎ ত্বমেব জগতাং পতিঃ ।
পাপ-গ্রাহ-সমাকীর্ণে মোহ-নীহারসংবৃতে,
ভবাব্ধৌ দুস্তরে নাথ নৌরেকা ভবতঃ কৃপা ।
ত্বৎকৃপাতরণীং দেহি, দেহি নাথ বরাভয়ং,
মৃত্যুমায়াময়ে ঘোরে সংসারে দেহিমেঽমৃতম্ ।
ক্ষিপ্রং ভবতু শান্তাত্মা ভক্তস্তে ভক্তবৎসল,
নির্ব্বাণং যাতু পাপাগ্নিস্তৎপ্রসাদাৎ পরেশ্বর ।

নমস্তে সতে তে জগৎকারণায়
নমস্তে চিতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায় ।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তি প্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে শাশ্বতায় ।
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎপালকং স্বপ্রকাশম্ ।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃপাতৃপ্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্ ।

ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্ ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষণং রক্ষণানাম্ ।
বয়ন্ত্বাং স্মরামো বয়ন্ত্বাম্ভজামো,
বয়ন্ত্বাং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ ।
এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পৎ
এষোঽস্য পরমোলোক এষোঽস্য পরমানন্দঃ
এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ।

ব্যক্তিগত প্রার্থনা ঃ—

সঙ্গীত

আমারেও কর মার্জ্জনা
আমারেও দেহ নাথ অমৃতেরকণা ।
গৃহ ছেড়ে পথে এসে ব'সে আছি ম্লান বেশে
আমারো হৃদয়ে কর আসন রচনা ।
জানি আমি, আমি তব মলিন সন্তান .
আমারেও দিতে হবে পদ তলে স্থান ;
আপনি ডুবেছি পাপে কাঁদিতেছি মনস্তাপে
শুনগো আমারো এই মরম বেদনা ।

হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী হৃদয় স্বামী
সকলই জানিছ হে,
যত দুঃখ লাজ দারিদ্র্য সঙ্কট
আর জানাইব কারে।

অপরাধ কত করেছি নাথ
মোহ-পাশে প'ড়ে;
তুমি ছাড়া প্রভু, মার্জ্জনা কেহ
করিবেনা সংসারে।

সব বাসনা দিব বিসর্জ্জন,
তোমার প্রেম-পাথারে;
সব বিরহ বিচ্ছেদ ভুলিব,
তব-মিলন-অমৃত-ধারে।

আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে,
তুমি লহ মোর ভার,
পরিশ্রান্ত জনে প্রভু ল'য়ে যাও
সংসার-সাগর-পারে।

ধর্ম্ম-সাধন।

ধর্ম্ম-জীবন।

মানব-জীবন গভীর রহস্য পূর্ণ। জগতে যত প্রকার পদার্থ আছে সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে অনন্ত বিধাতার অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে; কিন্তু এই পরিদৃশ্যমান্ জগতে মানব-জীবনই বিশ্ব-নিয়ন্তার অপার জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। মানব-জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া, গভীর চিন্তা সহকারে অনুধ্যান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেখানে যাবতীয় শক্তি ও গুণের বীজ নিহিত রহিয়াছে; গভীর সাধনা দ্বারা সেই সকল শক্তির অনুশীলন করিলে সুফল প্রসূত হইতে পারে। মনের শক্তির সীমা যে কোথায়, তাহা স্থির করা যায় না; শক্তিসকলের যতই অনুশীলন করা যায় ততই তাহারা ক্রমে বৰ্দ্ধিত হইয়া অনন্ত পথে ধাবিত হয়। ভগবান্ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই মানবকে নানা শক্তি সমন্বিত করিয়া ইহসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন। সাধনা দ্বারা সেই সকল শক্তির সৰ্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বিধান করিতে পারিলেই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়, মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ হয়।

ধর্ম্ম-জীবন কি, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন। যে সকল ভাগ্যবান পুরুষ কিংবা নারী গভীর সাধনা ও ঈশ্বরের কৃপা দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ বিষয়ে বলিবার উপযুক্ত। অথবা

যাঁহারা নানাপ্রকার শাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি আলোচনা দ্বারা গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও এ বিষয়ে কথঞ্চিৎ বলিতে পারেন। ধর্ম্ম-জীবনের বিষয় আলোচনা করিতে গেলে 'ধর্ম্ম কি' এই কথাটিই প্রথমে মনে উপস্থিত হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে ধর্ম্ম-জীবন ছাড়িয়া 'ধর্ম্ম কি' তাহা বুঝিতে পারা যায় না। জীবনে ধর্ম্মের বিকাশ দেখিয়াই তৎসম্বন্ধে মনে এক প্রকার ধারণা জন্মে। তথাপি ধর্ম্ম-জীবন আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্ম কি এই প্রশ্নটি কতক পরিমাণে মীমাংসিত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণতঃ মানবের মনে নানাপ্রকার ভ্রান্ত সংস্কার আছে; মানুষ সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার বাহ্য ব্যাপারকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং সেই সকল অনুষ্ঠিত হইলেই ধর্ম্ম জীবন লাভ হইল, এরূপ বিশ্বাস করে। একভাবে দেখিতে গেলে, সেগুলিও ধর্ম্মকার্য্য এবং ধর্ম্ম-সাধনের উপায়; কিন্তু কত ধর্ম্ম কেবল বাহ্য ব্যাপারে নিহিত নহে। এমন কিছু ভিতরের ভাব আছে, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এই সকল কার্য্য করিলে, এই সকল কার্য্যই ধর্ম্মকার্য্যে পরিণত হয়। ধর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড, কিংবা শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি অনুষ্ঠান নহে; বাল্য-বিবাহ উচিত কিংবা অনুচিত, জাতিভেদ ভাল কি মন্দ, বিধবা-বিবাহ যুক্তিসঙ্গত কি না, এই সকল মতের সমষ্টিও ধর্ম্ম নহে। নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গভীর গবেষণা দ্বারা উচ্চ উচ্চ মত লাভ করাও ধর্ম্ম নহে। অথবা প্রমত্ত সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিও ধর্ম্ম নহে। আবার পরোপকার, রোগীর শুশ্রূষা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা এই সকলও ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম কবিত্ব নয়, ধর্ম্ম চিন্তা নয়, ধর্ম্ম কার্য্য নয়; এমন কি শুধু নীতিও ধর্ম্ম শব্দে বাচ্য হইতে পারে না।

তবে ধর্ম্ম কি? এই সকল পরিত্যাগ করিলে এমন আর কি

থাকে, যাহা ধর্ম্ম শব্দে অভিহিত হইতে পারে? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্ম কোন বাহিরের অনুষ্ঠান নহে। ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য এই সকল অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে বটে এবং ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিলেও এই সকল কার্য্য করিতে হয় বটে; কিন্তু এই সকলকেই ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্ম জীবনের এক অবস্থা বিশেষ। ধর্ম্ম-জীবনের উদ্দেশ্য ও সীমা ব্রহ্ম-লাভ ও ব্রহ্ম-সহবাস। ব্রহ্মলাভ কি এই কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। যখন মানবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে জ্ঞাতসারে নিত্যযুক্ত থাকিয়া স্পষ্ট ভাবে তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও ব্রহ্মানন্দে মত্ত হইয়া তাঁহার আদেশ অনুসারে কার্য্য করে, তখনই ব্রহ্ম-লাভের অবস্থা বলিতে হইবে। সে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে মানুষের আর পতনের সম্ভাবনা থাকে না। একভাবে দেখিতে গেলে, আমরা সকলেই ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্যযুক্ত রহিয়াছি। তিনি ত আমাদের পক্ষে দূরে নহেন, কিন্তু আমরা তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমরা যে বায়ু-সাগরের মধ্যে রহিয়াছি তাহা অনুভব করিতে পারি, কিন্তু আমাদের আত্মা যে সেই মহান্ আত্মার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি কোথায়? আমাদের নিকটেও তিনি আদেশ প্রেরণ করিতেছেন; বিবেকের ধ্বনিতে, নানাপ্রকার ঘটনার স্রোতে, সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদের মধ্যে নিয়ত তাঁহার মধুর বাণী আমাদের নিকট গীত হইতেছে, কিন্তু আমরা তাহা নিঃসংশয়িত রূপে শুনিতে পাইতেছি কোথায়? যাঁহারা ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ অনুভব করিতেছেন এবং নিঃসংশয়রূপে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া ও তাঁহার আনন্দে মত্ত হইয়া তাঁহার কার্য্য সংসাধন করিতেছেন, তাঁহারাই ধন্য, তাঁহাদেরই ব্রহ্ম-লাভ হইয়াছে। এই অবস্থা ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য। তবে এই অবস্থাতে উপস্থিত হইলেই যে, উন্নতির

বিরাম হইবে তাহা নহে। অপূর্ণ মানব ক্রমাগত অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও পুণ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে ; এ গতির আর বিরাম নাই, অনন্তকালই চলিবে।

ধর্ম্ম-জীবনের লক্ষ্য যদি ব্রহ্ম-লাভ এবং ব্রহ্ম-সহবাস হইল, তবে উহার আরম্ভ কোথায়? ব্রহ্মানুগতিই ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। ব্রহ্মের অনুগত হওয়া, ভাব, চিন্তা ও কার্য্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হওয়াই ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম অবস্থা। যখন জীবনের সমস্ত চিন্তাতে তিনিই লক্ষ্য থাকেন, যখন সাধক সমস্ত সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদের মধ্যে তাঁহারই করুণা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাকে লইয়াই সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন, তখনই তিনি ব্রহ্মানুগত হইলেন। তাঁহার সুখ দুঃখ, সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই তিনি ; সাধক তখন আহার করেন, শয়ন করেন, তাঁহারই জন্য ; জীবিত থাকেন তাঁহারই জন্য। তখন সাধক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন তাঁহাকে জানিবার জন্য, নর-সেবা করেন তাঁহার আদেশ পালন করিবার জন্য। তখন তাঁহার আর স্বতন্ত্র কিছু থাকে না। এই অবস্থা যখন হয় তখন সাধকের প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইল। এই অবস্থাতেও হয়ত তিনি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই ; নিঃসংশয়িতরূপে তাঁহার বাণী শুনিতে পান নাই ; তবে প্রাণ, মন সমস্তই তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার বাণী শুনিবার প্রতীক্ষায় আছেন, এবং যাহা তাঁহার ইচ্ছাসম্মত বলিয়া বুঝিতেছেন, প্রাণপণে তাহাই করিতেছেন। এই অবস্থাকেই ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ বলা যায়। ইহার পূর্ব্বে আরও এক অবস্থা আছে, তাহাকে ধর্ম্মোন্মুখ অবস্থা বা ধর্ম্মোন্মুখতা বলা যাইতে পারে।

ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য যে ঐকান্তিক চেষ্টা, তাহাই ধর্ম্মোন্মুখতার লক্ষণ। মানুষ এই ধর্ম্ম-জীবন লাভের জন্য নানা প্রকার উপায় অব-

লম্বন করে ; সৎসঙ্গ, শাস্ত্রালোচনা, আত্ম-চিন্তা, প্রার্থনা প্রভৃতির দ্বারা সত্য লাভ করিবার জন্য উৎসুক হয় এবং যেটুকু সত্য লাভ করে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে ; সমাজ-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার, পরোপকার, ইন্দ্রিয়-সংযম প্রভৃতি নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, নানা প্রকার অনুষ্ঠান করিতে থাকে ; সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন, পূজা উপাসনা করিতে থাকে ; লক্ষ্য কেবল ধর্ম্ম-জীবন লাভ। এই সময়ের কার্য্য সকলকে ধর্ম্মার্থ কার্য্য বলা যাইতে পারে। যখন ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিবার জন্য, ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য মানুষ এই সকল কার্য্য ও অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তখনই ইহা ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়। আর সেই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে যে তদ্দ্বারা কোন উপকার হয় না তাহা নহে, তবে সে সকল অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এই সকল অনুষ্ঠান ঈশ্বর উদ্দেশ্যে করিতে করিতে সাধক যখন ধর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করেন অর্থাৎ জীবনকে ঈশ্বরানুগতির অবস্থায় আনয়ন করিতে পারেন, তখনও এই সকল কার্য্যের বিরাম নাই। তখন তিনি যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বিশ্বাস করেন, প্রাণপণে তাহাই সংসাধন করেন এবং তাঁহার আদেশ স্পষ্ট বুঝিবার জন্য ব্যাকুল ভাবে প্রতীক্ষা করেন।

এই ধর্ম্মোন্মুখতা ও ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ (ঈশ্বরানুগতি), ইহাদের মধ্যে যে সীমা কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই দুষ্কর। ধর্ম্মোন্মুখ অবস্থার মধ্যেই সময়ে সময়ে সাধক ঈশ্বরানুগতির ভাব প্রাপ্ত হন ; এবং ক্রমে সেই ঈশ্বরানুগতির ভাব যখন তাঁহার জীবনে স্থায়ী ভাব ধারণ করে তখনই প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয়। তখনও ইন্দ্রিয়-দমন, বিবেক-বৈরাগ্য সাধন প্রভৃতির আবশ্যকতা থাকে, তখনও সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক-সংস্কার, ধর্ম্ম-সংস্কার প্রভৃতি অনুষ্ঠানের

প্রয়োজন থাকে, তখনও শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, দুঃখীর দুঃখ দূর, রোগীর শুশ্রূষা প্রভৃতি সেবার কার্য্য থাকে, তখনও পাঠ, অনুশীলন, সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, পূজা, উপাসনা প্রভৃতি থাকে ; কিন্তু ইহাদের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন সকলই প্রভুর জন্য, সকলই তাঁহার প্রীতির জন্য। তিনিই তখন সাধকের জীবন-সর্ব্বস্ব। সতী নারী যেমন পতির জন্য সকল কার্য্য করেন, অনন্ত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকেন, সেইরূপ সাধক তখন ঈশ্বরের জন্য সকল কার্য্য করেন এবং যখন যেটুকু তাঁহার আদেশ বলিয়া মনে করেন, কায়মনোবাক্যে তাহাই সাধন করেন। তখন "প্রাণ ব্রহ্মপদে হস্ত কার্য্যে তাঁর, এই ভাবে দিন কাটুক আমার," সাধক কেবল এই কথাই বলিতে থাকেন। এই অবস্থায়, সাধককে কতদিন থাকিতে হয় জানি না। সকলই সাধকের ঐকান্তিকতা ও সর্ব্বোপরি ব্রহ্ম-কৃপার উপর নির্ভর করে। তবে ব্রহ্মের সঙ্গে জ্ঞাতসারে নিত্যযুক্ত অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বেও সময়ে সময়ে তিনি সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে প্রলুব্ধ করেন। এই প্রকার চলিতে চলিতে ব্যাকুল সাধক স্থায়ীরূপে ভগবানের সহবাস-সুখ লাভ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হন।

ধর্ম্মে পরীক্ষা।

ধর্ম্মপিপাসু নরনারীর হৃদয়ে প্রথমে ধর্ম্মোন্মুখ ভাব উপস্থিত হয় ; তৎপরে সাধন করিতে করিতে ঈশ্বরানুগতির ভাব প্রস্ফুটিত হইলেই ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ হয় এবং ক্রমে সাধনা দ্বারা তাঁহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করেন ; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে জগতে মধ্যে মধ্যে এরূপ

লোক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহাদের ধর্ম্মোন্মুখ ভাবের মধ্য দিয়া আর যাইতে হয় না; তাঁহারা এরূপ প্রকৃতি লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন যে স্বভাবতঃই তাঁহাদের ভক্তি নিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল; অতি অল্পকালের মধ্যেই তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হয়। কথিত আছে প্রহ্লাদ 'ক' দেখিয়াই কৃষ্ণ নাম স্মরণ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; চৈতন্যদেব গয়ায় বিষ্ণুপদ দর্শন করিয়াই ধর্ম্মভাব লাভ করেন এবং বাড়ী আসিবার পথেই তাঁহার ব্রহ্ম-স্ফূর্ত্তি হয়। অবশ্য ইহার মধ্যে কল্পনা থাকিতে পারে; তবে কোন কোন লোকের অতি সহজেই যে ধর্ম্মভাব জাগরিত হইয়া উঠে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতীয় লোকের সংখ্যা জগতে অতি বিরল। পৃথিবীর অধিকাংশ লোককেই ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে হইলে অনেক দিন ধর্ম্মোন্মুখ অবস্থায় থাকিতে হয় এবং নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন ও সংশয়ের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হয়।

ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কেহই ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে পারে না। "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্" ইহাই এখানে মন্ত্র। ঈশ্বর ত প্রত্যেক মানুষকে আপনার অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য আহ্বান করেন। উপনিষদে আছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য—
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্।

এই যে আত্মা তাঁহাকে প্রবচন দ্বারা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা কিংবা বহু শাস্ত্র-অধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না। ইনি যাঁহাকে বরণ করেন এবং যে ইঁহাকে বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে প্রাপ্ত হন। ভগবান—পরমাত্মা—মানুষকে বরণ করিবার জন্য ব্যস্ত। কখন

কাহাকে কোন্ অবস্থায় যে এসে ধরেন তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ ত তাঁহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না—দিদিমার মৃত্যুদিনে শ্মশান ঘাটে থাকিয়া অযাচিতভাবে কি দেখিলেন, কোন অপূর্ব্বজ্যোতিতে—আনন্দে হৃদয় মন পূর্ণ হইয়া গেল—তিনি তাহা আবার পাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন, পাগল হইলেন। ইহার পূর্ব্বেও ছাদের উপর অনন্ত আকাশ দৃষ্টে ঈশ্বরের আহ্বান তিনি পাইয়াছিলেন, তখন ঈশ্বরকে তিনি বরণ করিয়া ল'ন নাই, এখন ঈশ্বর যেমন তাঁহাকে বরণ করিলেন তিনিও ঈশ্বরকে বরণ করিয়া লইয়া সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

সলকে ডেমাস্কস্ যাইবার পথে ভগবান ধরিলেন। সল পল হয়ে গেলেন। তোমাকে আমাকেও তিনি নানা কার্য্য, নানা সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, তাপের ভিতর দিয়া আহ্বান করেন; বরণ করেন; আমরা তাঁহার ডাক শুনিয়াও শুনি না, তাঁহাকে বরণ করিয়া লইনা। তাই আমরা তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি না।

মোহাচ্ছন্ন জীব নানা প্রকার অবস্থায় পড়িয়া ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে; সকল লোক একই কারণে ধর্ম্মানুরাগ লাভ করে না। গীতাকার মানবের ধর্ম্মানুরাগের চারিটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন:—

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন!
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"

চারি প্রকারে লোকের মন পরমেশ্বরের প্রতি ধাবিত হয়; (১) যাহারা নানা প্রকার রোগ শোকাদিতে অভিভূত হইয়াছে তাহাদের মন সহজেই ঈশ্বরানুগামী হয়; (২) অনেকে আবার জগতের কার্য্য কলাপ দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং এই জগতের কারণ

অনুসন্ধান করিতে যাইয়া ধর্ম্মোন্মুখতা লাভ করেন ; (৩) কেহ কেহ বা ইহকাল ও পরকালে সুখ ভোগ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ধর্ম্মের প্রতি মনোনিবেশ করেন ; (৪) আবার এমনও লোক আছেন যাঁহারা আত্ম-জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ধর্ম্মের প্রতি অনুরক্ত হন। মানব-ইতিহাস হইতে এই চারি শ্রেণীরই দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধদেব নিজে রোগে শোকে অভিভূত ছিলেন না বটে ; কিন্তু জগতে জরা, মৃত্যু ও ব্যাধির অপ্রতিহত প্রভাব দর্শনে মানবজাতির দুঃখে তাঁহার কোমল হৃদয় ক্লিষ্ট হইল ; তিনি জরা, মরণ, ব্যাধি হইতে মানবমণ্ডলীকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে মহর্ষি * * অসংখ্য নক্ষত্র-খচিত বিচিত্র আকাশ দর্শনে হৃদয়ে অনন্তের ভাব উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং জগৎ রহস্য উৎঘাটন করিতে যাইয়া ধর্ম্ম-সাধনে তৎপর হইলেন।

পৌরাণিক ধ্রুব প্রথমে রাজত্ব প্রাপ্তির জন্যই তপস্যা আরম্ভ করেন, কিন্তু যখন তাঁহার হরি তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বর প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, তখন ধ্রুব করযোড়ে বলিলেন,—

> "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
> ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
> কাচং বিচিন্বন্নাপ দিব্যরত্নং
> স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।"

"রাজ্যাভিলাষী হইয়া আমি তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলাম ; কিন্তু দেবতা ও মুনীন্দ্রদিগেরও গুহ্যতম তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম ; কাচ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি দিব্যরত্ন লাভ করিলাম ; (অতএব) হে স্বামিন্, আমি কৃতার্থ হইয়াছি আর বর চাই না।"

আবার পৌরাণিক প্রহ্লাদ ও আধুনিক রাজা রামমোহন আত্মজ্ঞান

দ্বারা পরিচালিত হইয়াই ধর্ম্মকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রথম তিন শ্রেণীর ধর্ম্মার্থীই সংসারে সচরাচর দৃষ্ট হয়; সাধারণতঃ মানুষ নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয়; তাঁহাদেরই ধর্ম্ম-সাধনের উপায় যথোচিত নির্দ্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক।

যে ভাবেই মানুষ ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ লাভ করুক, প্রথম প্রথম ধর্ম্ম অতি মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের করুণায় যখন মানবের প্রাণ মোহ নিদ্রা হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের মধুময় রস আস্বাদন করিতে থাকে, তখন তাহার নিকট ধর্ম্মসঙ্গীত কেমন মধুময় বোধ হয়! ধর্ম্মকথা কর্ণে কেমন মধু বর্ষণ করে! মনে হয় যেন সে এক নূতন রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! বাহিরের পাপ ও কু-অভ্যাসগুলি সহজেই পরিত্যাগ করা যায়; তাহাতে মনে কত আনন্দ ও বলের সঞ্চার হয়! বাহিরের লোকেও তখন নানা ভাবে প্রশংসা করিতে থাকে; তখন মনে হয় ধর্ম্ম-জীবন যদি এতই মধুর হয়, তবে মানুষ এই অমৃত পানে বঞ্চিত থাকে কেন? অনেক সময়ে আবার এরূপও মনে হয়, এইত বুঝি ধর্ম্মলাভ করিলাম, এইত বুঝি হৃদয়ে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হইল। তখন মনে হয় এইরূপ নাচিয়া গাহিয়াই বুঝি ধর্ম্মলাভ হইবে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আদর্শ বড় উচ্চ থাকে না, তাই এই সকল ভাব সহজেই মনে উদিত হয়। কিন্তু এই সুখের ভাব, এই ভাসা ভাসা ভাব অনেক দিন স্থায়ী থাকে না; যখন ধর্ম্মের আদেশ বিশেষভাবে জীবনে পালন করিতে যাওয়া যায়, তখন নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হয়; বাহিরের ও ভিতরের পরীক্ষা মনকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। প্রথমে পরিবার ও আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে ও ক্রমে সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। যদিও আত্মীয় স্বজন ও সমাজের ব্যক্তিগণ,

সকলেই সাধু হউক, এরূপ ইচ্ছা করেন ; তবুও সমাজের নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শ তত উচ্চ নয় ; স্থতরাং মানুষ যখন সেই সীমা অতিক্রম করিতে চায়, তখনই তাঁহারা আসিয়া বাধা দেন। পরিবারস্থ লোকেরাও আপনাদের সন্তানগণকে সৎ ও ধার্ম্মিক দেখিতে ইচ্ছা করেন বটে, কিন্তু এই সততার তাঁহারা একটা সীমা নির্দ্দেশ করেন। সন্তান সন্ততিগণ সত্যবাদী হউক, ইহা কে না চায় ? কিন্তু যেখানে সত্য কথা বলিতে যাইয়া, সত্য সাধন করিতে যাইয়া স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে হয়, সেই স্থানেই আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া প্রতিকূলতাচরণ করেন। সেইরূপ সামাজিক ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শকে যখন সাধক অতিক্রম করেন, তখন সমাজ ও তাহাকে বক্ষ হইতে তাড়াইবার প্রয়াস পায়। এই সকল বাহিরের প্রতিকূলতায় নবীন সাধকের মন অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। অনেক সময় নানা রকম নির্য্যাতন, নানা প্রকার আর্থিক ও মানসিক কষ্ট ও দুর্ঘটনা আসিয়া উপস্থিত হয় ; তখন দুর্ব্বল সাধক আর কূল কিনারা খুঁজিয়া পান না। অনেকে এই সময়েই পৃষ্ঠভঙ্গ দেন ; সংগ্রাম করিতে আর ইচ্ছা হয় না ; কাজেই আপনার আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া দশজনের সঙ্গে মত মিলাইয়া চলিতে থাকেন। কিন্তু যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অধিক তেজস্বী তাঁহারা এখানেও পরাঙ্মুখ হন না ; বাহিরের এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, নানাপ্রকার নিন্দা, গ্লানি ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, ঘোর দরিদ্রতার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও সত্য পথ অবলম্বন করিয়া চলেন।

অনেকের ধর্ম্মের আদর্শ অতি নিম্ন-স্তরে রহিয়াছে ; তাঁহারা কতকগুলি বাহিরের অনুষ্ঠান করাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন ; স্থতরাং কতকগুলি সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ মত অনুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই ধর্ম্মলাভ হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়াই

সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু যাঁহার আদর্শ উচ্চ, আকাঙ্ক্ষা মহৎ, তিনি এই অবস্থায় থাকিয়াই নিশ্চিন্ত হন না। তিনি ভাবেন, আমার কি হইল? এত সংগ্রাম করিয়া আমি কি পাইলাম? এত নিগ্রহ সহ্য করিয়া আমার কি লাভ হইল? তাঁহার অন্তর্দ্দৃষ্টি খুলিয়া যায়; তখন তিনি দেখিতে পান যে, বাহিরের শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু ভিতরেব শত্রুর ত মৃত্যু হয় নাই। তিনি বিশেষ কোন পাপ কার্য্য করেন না বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে পাপের লিপ্সা যথেষ্ট রহিয়াছে। আত্মীয় স্বজন কিংবা সমাজ ধর্ম্ম পথে বাধা দিতে পারেন না বটে, কিন্তু ভিতর হইতে আরাম-স্পৃহা বাধা দিতেছে। তখন সাধক স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, তাঁহার অবস্থা অতীব শোচনীয়। কাম, ক্রোধ, হিংসা, যশোলিপ্সা, অহঙ্কার প্রভৃতি প্রাণের স্তরে স্তরে রহিয়াছে, সুবিধা পাইলেই গর্জ্জন করিয়া উঠে। বিলাস-বাসনা, সুখস্পৃহাও দূর হয় নাই। তখন মনে হয়, তবে আমি কি করিলাম? কেন আত্মীয় স্বজনকে কাঁদাইলাম? কেন এত নিগ্রহ সহ্য করিলাম? পরমেশ্বর কোথায়? প্রার্থনা করি, ফল ত পাইতেছি না। কত কাঁদিলাম, কত আত্ম-নিগ্রহ করিলাম, তবু ত পাপের জ্বালা নিবারিত হইল না। প্রেম, ভক্তির কথা লোকের মুখে শুনি বটে, কিন্তু আমাব প্রাণে ত তাহার আবির্ভাব অনুভব করিলাম না। তখন সাধক সকলই অশান্তিকর বোধ করিতে থাকেন; হৃদয় শুষ্ক, নীরস প্রতীয়মান হয়; সংসারের কাহাকেও বন্ধু বলিয়া মনে হয় না। তখন যেন তিনি প্রাণের কথা বলিবার কাহাকেও খুঁজিয়া পান না; কিছুই ভাল লাগে না; নিরাশার অন্ধকারে ঘুরিতে থাকেন। প্রাণ ভাঙ্গিয়া পড়ে; আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা হয় না; পূর্ব্বের মত উদ্যম, উৎসাহ আর থাকে না। তখন তিনি ভাবিতে থাকেন, আমার দ্বারা কি হইবে? আমি যে ঘোর পাপী, আমি সংসারে কোন

কার্য্য করিতে পারিব না। তখন তিনি জগৎ-সংসার অন্ধকারময় দেখিতে পান; তখন সাধকের মনের অবস্থা এই সঙ্গীতটিতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ঃ—

সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে,
কে আছে কাণ্ডারী হেন কে যাইবে সঙ্গে।
ভাস্‌ল তরী সকাল বেলা, ভাবিলাম জল খেলা,
মৃদুল বহিবে বায়ু বেয়ে যাব রঙ্গে।
গগনে গরজে ঘন, বহে ঘন সমীরণ,
কূল ত্যজি এলেম কেন মরিতে আতঙ্কে।
মনে করি কূলে ফিরি, বাহি তরী ধীরি ধীরি,
কূলেতে কণ্টক তরু বেষ্টিত ভুজঙ্গে।
যাঁহারে কাণ্ডারী করি, চালাইয়া দিনু তরী,
সে কভু দিল না পদ তরণীর অঙ্গে।

এই সঙ্গীতটি যদিও সাংসারিক ভাবে রচিত, তবুও ইহার আধ্যাত্মিক অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত অবস্থাপন্ন সাধকের মনের অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধগম্য হয়। সাধক এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, যে হায়! ছেলেবেলা এই জীবন-তরণী ধর্ম্ম-সাগরে ভাসাইয়া দিলাম; তখন চারিদিকে মৃদুমন্দ অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, এইরূপে সুখে স্বচ্ছন্দে ধর্ম্ম-সাগর পার হইয়া যাইতে পারিব। এখন দেখি চারিদিকে বিপদরাশি ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে; হায়! হায়! কেন এতদূর আসিলাম; এক একবার মনে হয় যে, আবার ফিরিয়া সেই সংসারে যাইয়া ডুবি, কিন্তু সেখানেও যেরূপ বিপদ তাহাতে আর যাওয়া যায় না; এখন অগ্রসর হইতেও পারি না, পশ্চাতেও ফিরিতে পারি না; আমার একূল ওকূল দুইই

গেল ! যাঁহাকে কাণ্ডারী করিয়া এ জীবন-তরণী অগাধ সমুদ্রে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, তিনি ত এ হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন না। এই ভাবিতে ভাবিতে সাধক একেবারে অধীর হইয়া পড়েন। কিন্তু এখানেই কষ্টের অবসান হয় না; ভগবান্ সাধককে আরও অনেক পরীক্ষার মধ্যে পাতিত করেন। সাধকের মনে নানা প্রকার সংশয় আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন তিনি ভাবেন যে ধর্ম্ম কি এতই কষ্টকর ? ভগবান্ কি তাঁহার অনুচরদিগকে এত কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখেন ? শান্তি অন্বেষণ করিতে করিতে ধর্ম্মপথে আসিলাম, কিন্তু শান্তি ত মিলিল না। বরং যাহারা সংসার লইয়া ব্যস্ত আছে, তাহারাই শান্তি সুখ ভোগ করিতেছে। এত পাপের জ্বালা, এত প্রলোভন, এত অপমান, এত নির্য্যাতন এ পথে কেন ? তবে কি আমার ভ্রান্তি হইয়াছে ? তবে কি এ ঠিক পথ নয় ? তবে কি বাস্তবিক জগতের কোন মালিক নাই ? তবে কি কেবল কল্পনারই সেবা করিতেছি ? ধার্ম্মিকেরা কি কেবল কল্পনারই পূজা করেন ? তবে কি ঈশ্বর নাই ? আর যদিও বা তিনি থাকেন তিনি বোধ হয় পাপীর ক্রন্দন শুনিতে পান না; তিনি রাজাধিরাজ, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, তিনি বুঝি আমার খবর রাখেন না; আমি বুঝি পাপে তাপে ক্লিষ্ট হইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছি; এ নিয়তির শৃঙ্খল বুঝি কেহ ভঙ্গ করিতে পারে না। পাপী তাপীর অশ্রুজল বুঝি তিনি মুছান না; কাতর প্রার্থনা তিনি পূর্ণ করেন না, তবে আর এ পথে চলিয়া কি হইবে ? আর যে চরণ চলিতে পারে না। সাধক তখন এইরূপ সংশয়ের অনলে দগ্ধ হইতে থাকেন। হায় হায় ! কত লোক এই অবস্থাতে ধর্ম্মপথ বিসর্জ্জন করিয়া, আবার যাইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এ বড় ভয়ানক অবস্থা। এ অবস্থা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না; যাঁহারা ইহা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন যে এ অবস্থায় কত যন্ত্রণা।

এ অবস্থায় হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ একেবারে দমিয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা এই অবস্থায় পড়িয়াও ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিতে পারেন, সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণার মধ্যেও চুম্বক শলাকার ন্যায় তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারেন, তাঁহাদিগকে তিনি কৃপা করেন, তাঁহাদের মনের সংশয় তিনি ঘুচাইয়া দেন। তাঁহাদের প্রাণে পুনরায় শান্তি আসে, তেজ আসে। তখন তাঁহারা নব বল, নব বীর্য্যে সুরক্ষিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন ; পাপের বীজ ক্রমে অন্তর্হিত হয় ; তখনই তাঁহারা প্রকৃত ভাবে ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করেন।

জ্ঞান।

ধর্ম্মোন্মুখ জীবনের প্রথম অবস্থা অতীব সঙ্কটাপন্ন, পরীক্ষা-পূর্ণ। এই অবস্থায় অনেকে ধর্ম্মের পথ পরিত্যাগ করিয়া, আবার যাইয়া সংসারে ডুবিয়াছেন ; ধর্ম্মকে কল্পনা বলিয়া নিরাশ হৃদয়ে শান্তির অন্বেষণে ধন, মান, যশ লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। এমন কি অনেকে পাপের গভীর পঙ্কে আপনাদিগকে ডুবাইয়াছেন। কিন্তু কেহ কেহ এদিকে যান নাই ; তাঁহারা অন্যরূপ বিপদে পতিত হইয়াছেন। কাহারও কাহারও ধর্ম্মক্ষুধা এত প্রবল যে, তাঁহারা এই সংশয়ের অবস্থায় অধিক দিন স্থির থাকিতে পারেন না ; তাঁহারা প্রাণের জ্বালায় ছট্ ফট্ করিতে থাকেন। তখন এই পিপাসিত প্রাণকে যিনি জলের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন তিনিই আত্মবশে লইয়া যাইতে সমর্থ হন। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ভয়ানক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ব্যক্তিগণ যখন ক্ষুধায় কণ্ঠাগত-প্রাণ হইয়া ছট্ ফট্ করিতে থাকে, তখন তাহাদিগকে যে কোনরূপ আহারের বস্তু দেওয়া যায়, দ্রব্যের গুণাগুণ

বিবেচনা না করিয়া তাহাই তাহারা ভক্ষণ করে। আবার দেখা যায় পিপাসাতুর নরনারীগণ জলতৃষ্ণায় রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া যে কোন রূপ জল সম্মুখে পায়, তাহাই ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া পান করে; সেইরূপ অনেক সাধক যখন নিজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া হাহাকার করিতে থাকেন, কোথাও শান্তি-সুখ খুঁজিয়া পান না, তখন যিনি তাঁহাদিগকে আশার বাণী শুনাইতে পারেন, তাঁহারা তাঁহারই অনুসরণ করেন। এইরূপে অনেকে ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত হইতে স্খলিত হইয়া নানা প্রকার কুসংস্কারে জড়িত হইয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, অনেকে অসৎ গুরুর প্ররোচনায় গভীর পাপে নিমগ্ন হইয়াছেন। সাধারণতঃ ভাব-প্রধান জীবনে এইরূপ অধোগতি দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন দাঁড়িগণ শত চেষ্টা করিয়াও কর্ণধার-বিহীন নৌকাকে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইতে পারে না; কিন্তু উপযুক্ত কর্ণধারের সাহায্যে সেই দাঁড়িগণের চেষ্টাতেই নৌকা সহজে গম্য স্থানে পৌঁছিতে পারে; সেইরূপ এই জীবন-তরণী বিশুদ্ধ-জ্ঞান কর্ণধারের অভাবে কেবল ভাব দ্বারা চালিত হইলে নানা রূপ বিপদে পতিত হয়, কোনমতেই গন্তব্য স্থানে যাইতে সমর্থ হয় না। এ অবস্থায় জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন। ভাব না থাকিলে জ্ঞান যেমন মানুষকে অপদার্থ করিয়া তোলে; তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত কোমল বৃত্তি নষ্ট হইয়া যায়; হৃদয় শুষ্ক, নীরস ও মাধুর্য্যহীন হইয়া পড়ে, এবং ঘোর নাস্তিকতায় মানুষ ডুবিয়া যায়; সেইরূপ আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানের অভাবে ভাবও মানুষকে ভুলাইয়া নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া বিপথে লইয়া যায়। এজন্য দেখা যায় আধুনিক বৈষ্ণব-সম্প্রদায় নানা প্রকার দুর্নীতির মধ্যে পতিত হইয়াছেন; তাই দেখা যায়, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে ভাব ও নিষ্ঠার একান্ত অভাব না হইলেও নরনারীগণ নানা প্রকার কুসংস্কারের মধ্যে পতিত রহিয়াছেন।

জীবনের প্রকৃত উন্নতি সাধন করিতে হইলে, প্রকৃত ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে হইলে জীবন-তরণীর কর্ণধার জ্ঞানকে সর্ব্বাগ্রে আলিঙ্গন করিতে হইবে। জ্ঞানশূন্য ভক্তি, ভক্তিই নহে। যাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছেন, তাঁহারা ভয়ানক পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়াও হতাশ হন না; যে যাহা বলে তাহাই আলিঙ্গন করেন না। সংসারে এমন লোক অনেক আছেন যাঁহারা প্রিয়জনের সামান্যরূপ পীড়াতেও একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন; তখন যে কেহ যে কোন ঔষধের ব্যবস্থা করে, ইঁহারা তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইহাতে অনেক সময়ে রোগীর উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা ধীর ও জ্ঞানী তাঁহারা এরূপভাবে বিচলিত হন না; তাঁহারা মহাসঙ্কটে পড়িয়াও আপনাদের স্থিরবুদ্ধি এবং অন্যান্য বুদ্ধিমান্ লোকের সুপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত হইয়া সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করেন। সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও যাঁহারা কেবল ভাবের তরঙ্গে ভাসিতে থাকেন, শুষ্ক জ্ঞান যাঁহাদের ভাল লাগে না, তাঁহারা জীবনের এই পরীক্ষার সময়ে যে যাহা বলে তাহাই করিয়া থাকেন। তাই দেখা যায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইঁহাদের মত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। অবশ্য মত পরিবর্ত্তন হওয়াই দূষণীয় নহে; শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন, জীবনে যাহার মতের পরিবর্ত্তন হয় না, সে হয় দেবতা না হয় পশু; বাস্তবিক মত পরিবর্ত্তন হওয়া অনেক সময়ে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু তাই বলিয়া দিন দিন মত পরিবর্ত্তন চঞ্চলতারই পরিচায়ক; গভীর জ্ঞান দ্বারা বিশোধিত মত সহজে পরিবর্ত্তিত হয় না। ভাবপ্রবণ-হৃদয়ের ভিত্তিশূন্য মতই নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। যাঁহারা জ্ঞানের উপাসক, ভাবকেই যাঁহারা সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া তোলেন নাই, তাঁহারা জীবনের এই ভয়ানক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও স্থির থাকিতে পারেন; তখনও তাঁহারা আপনাদের

চিন্তাশক্তির পরিচালনা করেন, সৎ উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণ করেন এবং সৎগ্রন্থ পাঠ করেন।

এই ঘোর দুরবস্থায় পতিত হইলে সাধুসঙ্গের অত্যন্ত আবশ্যক। সকল সময়েই সাধুসঙ্গের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু জীবনের এই পরীক্ষার সময়ে উহার বিশেষ দরকার। তাঁহারা এই সকল অবস্থায় কিরূপে আপনাদিগকে চালাইয়াছেন, কিরূপে এই সকল অশান্তির হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, কিরূপে রিপু সকল দমন করিয়াছেন, এই সকল কথা তাঁহাদের মুখে শুনিতে পাইলে, প্রাণে বড় আশা ও বলের সঞ্চার হয়: তখন মনে হয় এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে আমিও এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। কিন্তু সাধুসঙ্গ সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না। সচরাচর অনেক সাধু দেখা যায় বটে; আমাদের দেশে গৈরিক বস্ত্র পরিধান কিংবা সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলেই সাধু বলিয়া পরিচিত হওয়া যায়; এরূপ সাধুর অভাব এদেশে নাই। কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্ম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা দূরে থাক্, যাঁহাদের ব্রহ্মগত প্রাণ হইয়াছে, যাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবন আরম্ভ হইয়াছে, যাঁহারা ব্রহ্মের জন্যই সমস্ত কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, এমন সাধুর সংখ্যাও অতি কম। সুতরাং আত্ম-চিন্তা ও সাধু-চরিত পাঠ ব্যতীত আর উপায় নাই। সাধুদের নিজেদের মুখে তাঁহাদের জীবনের কাহিনী শুনিতে পাইলে যত উপকার পাওয়া যাইত, জীবন-চরিত পাঠে ততদূর হওয়ার সম্ভাবনা নাই; তথাপি এই সকল জীবন-চরিত পাঠে যথেষ্ট উপকার লাভ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য সদুপদেশ-পূর্ণ গ্রন্থ পাঠ, নানাপ্রকার শাস্ত্র আলোচনা ও দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে মন উন্নতি লাভ করে; হৃদয়ে শান্তি পাওয়া যায়। ভগবান্ এই সকলের ভিতর দিয়া সত্য পথ দেখাইয়া দেন।

প্রকৃতির চিন্তা জীবনকে উন্নত করিবার একটি প্রধান সহায়। আমাদের সম্মুখে যে অনন্ত জগৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহাই বিশ্ববিধাতার এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। সাধুগণ এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াই কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। কত নরনারী ইহা পাঠ করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন! তৎপরে মনোরাজ্য আর এক বিশাল ক্ষেত্র। সেখানে কত অদ্ভূত রহস্য রহিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই জগৎ এক প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে; প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, সমাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। জড়-জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, আধ্যাত্মিক জগতেও প্রেম না থাকিলে সমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত। মাতৃস্নেহ, দাম্পত্য-প্রেম, বন্ধুর প্রণয়, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি কত প্রকার ভাব জগতে কার্য্য করিতেছে; আত্ম-সংযম, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, স্বার্থনাশ, বৈরাগ্যসাধন প্রভৃতি কত সাধন রহিয়াছে; এই সকল ভাবিলে মন সহজেই পবিত্র হয়। জগতের পাপ তাপ চিন্তা করিলে যেমন মন কলুষিত হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতের চির শোভাময় উজ্জ্বল দিক্ অনুধ্যান করিলে মন বিশুদ্ধ হয়।

সত্যনিষ্ঠা।

যে সকল কার্য্য ও চিন্তা অবলম্বন করিয়া জ্ঞানালোচনা করিতে হইবে তাহার মূলে একটি ভাব থাকা আবশ্যক; তাহা ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা, সত্যনিষ্ঠা। ব্রহ্মলাভ করিব, সত্যলাভ করিব, এই আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ সাধুসঙ্গই করুক, গ্রন্থ পাঠই করুক, আর প্রকৃতি চর্চ্চাই করুক সে নিশ্চয়ই সত্যলাভ করিবে; ভগবান্ হৃদয়ে সত্যের আলোক জ্বালিয়া দিবেন। কিন্তু সমস্ত সত্য একেবারে মানব

হৃদয়ে প্রকাশিত হয় না; একটি একটি করিয়া সত্যের বিকাশ হয়। এই সত্যলাভের দায়িত্ব আছে। যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানে না, তাহার নিকট নূতন সত্য প্রকাশিত হয় না। যখন যে সত্যটি আসিবে, তখনই সে সত্য আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে হইবে। তখন কাপুরুষের মত পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারা যাইবে তৎক্ষণাৎ তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। লোকের নিন্দা বা প্রশংসা, সামাজিক অত্যাচার, আরাম-স্পৃহা প্রভৃতির দিকে তাকাইলে চলিবে না। যে ব্যক্তি সত্যলাভ করিয়া তদনুসারে কার্য্য না করে, তাহার নিকট নূতন সত্য আর প্রকাশিত হয় না; এবং সে ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার তেজ বীর্য্য সকলই লোপ পায়। কিন্তু একটি সত্য পালন করিতে পারিলে যেমন নূতন সত্য আবার লাভ করা যায়, তেমন অপর দিকে সত্য পালনের স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, এবং মনের তেজও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। প্রথমতঃ সাধকের নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য প্রকাশিত হইয়া থাকে। অবশ্য সকল সত্যই সমান, তাহাতে ছোট বড় নাই; সকল সত্যই এক সত্য-স্বরূপের বিকাশ মাত্র। তবে যে সকল সত্য পালন সহজ-সাধ্য, যে সকল সত্য পালন করিতে বেশী স্বার্থ ত্যাগের আবশ্যক হয় না, সেই সকল সত্যকে ক্ষুদ্র সত্য বলা হইয়া থাকে। এই সকল অনায়াস-সাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্য পালন করিতে পারিলে ক্রমে বৃহত্তর সত্য সাধকের মনে প্রকাশিত হয় এবং তদুপযোগী বল ও শক্তি লাভ হয়। আর যে ব্যক্তি এই ক্ষুদ্র সত্যও পালন করিতে পারে না, তাহার নিকট নূতন সত্য প্রকাশিত হয় না; এবং তাহার তেজ বীর্য্য ক্রমেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে।

এই সত্যপালন সম্বন্ধে অনেকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে। কেহ কেহ বলেন, প্রথমে ভিতরের রিপুগণকে দমন কর, পরে বাহিরের শত্রুগণকে বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। দৃষ্টান্তস্থলে একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে সচরাচর বলা হয় যে, তোমাদের মনে বৈষম্য ভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভিতরে তোমাদের জাতিভেদ রহিয়াছে; সেই বৈষম্য ভাব, সেই জাতিভেদের ভাব পূর্ব্বে দূর না করিয়া, বাহিরের জাতিভেদ দূর করিতে অগ্রসর হও কেন? তোমাদের প্রাণে প্রেম ভক্তির এখনও উদয় হয় নাই, আগেই তোমরা সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম কর কেন? এই কথাগুলি শুনিতে আপাততঃ বড়ই যুক্তিযুক্ত বোধ হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বাহিরের অন্তরায় দূর করাই সহজ। সুতরাং সেই দিকেই সর্ব্বাগ্রে মনোনিবেশ করিতে হইবে। মনে করুন, একব্যক্তি দুষ্ক্রিয়াতে লিপ্ত আছে; সে সাধু লোকের সৎপরামর্শ শুনিয়া ঐ দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিতে কৃতসংকল্প হইল; সে দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না। মধ্যে মধ্যে তাহার মন দুষ্কর্ম্মের প্রতি ধাবিত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া কি সে দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগ করিবে না? ভিতরের দুশ্চিন্তা দূর না হইলে বাহিরের দুষ্ক্রিয়া পরিত্যাগে লাভ নাই বলিয়া যদি সে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকে, তবে কি কখনও তাহার দুষ্কার্য্য পরিত্যাগ করা হইবে? বরং বাহিরের দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত থাকিয়া, ক্রমে ভিতরের দুশ্চিন্তা বর্জ্জন করিতে অভ্যাস করা তাহার কর্ত্তব্য। বাস্তবিক বাহিরের দুর্ব্বলতা দূর করা যত সহজ, ভিতরের দুর্ব্বলতা দূর করা তত সহজ নয়। সুতরাং এই সহজ দুর্ব্বলতা দূর করিয়া একদিকে যেমন পথ

পরিষ্কার করিতে হইবে, অপর দিকে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে; তবেই ভিতরের দুর্ব্বলতা দূর করা সহজ-সাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যখন যে সত্যটি আসিবে, তাহা ষোল আনা ভাবে পালন করিয়া অন্য সত্যের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, কোন্‌টি সত্য বলিয়া মনে করিব? আমাদের বিদ্যা বুদ্ধিতে যাহা সত্য বলিয়া বুঝি তাহা সত্য না হইতেও পারে; তবে কি অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু স্বীকার করিব? এবং তাঁহারা যাহা বলিবেন তদনুসারেই কার্য্য করিব? অনেকে এই বিষম সমস্যায় পড়িয়া অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। মানব মাত্রই অপূর্ণ; সে যতই ধার্ম্মিক হউক চিরকাল মাত্র অনন্ত-পুরুষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে, কিন্তু কখনই অনন্তত্ব লাভ করিতে পারিবে না; কাজেই ভ্রান্তি চিরকালই আসিবার সম্ভাবনা; সুতরাং ভ্রান্ত মানব দ্বারা লিখিত কিংবা উক্ত শাস্ত্রও অভ্রান্ত হইতে পারে না। অবশ্য যোগস্থ হইয়া ব্রহ্মর্ষিগণ ঈশ্বরের নিকট সাক্ষাৎ ভাবে যাহা লাভ করেন, তাহা অভ্রান্ত হইতে পারে, কিন্তু তাহা যথাযথ বাহিরে প্রকাশ করা যায় কি না সন্দেহ। যাহা হউক, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরু সম্ভব কি না তাহা বিশেষ ভাবে এ স্থলে বলিবার আবশ্যকতা নাই; এখানে এইটুকু দেখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে অসুবিধা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাই, উহা দ্বারা সেই অসুবিধা দূর হয় কি না? এক মাত্র বাইবেল শাস্ত্রকে অভ্রান্ত জানিয়াও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় শত শত ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একমাত্র বেদকে অভ্রান্ত মানিয়াও হিন্দুগণ সহস্র শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপ সকল সম্প্রদায়েই শাখা প্রশাখা দেখা যায়। সুতরাং নিজের বুদ্ধির

হাত এড়াইতে পারি কোথায়? মহাভারতের একটি প্রচলিত উক্তি এই—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

"বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি সকল ভিন্ন ভিন্ন, সে ব্যক্তি মুনিই নয় যাঁহার পৃথক মত নাই। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহাতে লুক্কায়িত আছে। অতএব মহাজনগণ যে পথে যান সেই প্রকৃত পথ।"

সুতরাং কোন পথ গ্রহণ করিব না করিব, তাহার নির্দ্ধারণ আমার বিবেচনা শক্তির উপরই নির্ভর করে; আর ঈশ্বরই অন্তরে থাকিয়া সত্য প্রমাণিত করেন! গায়ত্রী মন্ত্রে আছে—**ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ**—তিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করেন। **"Not that God spake, but He still speaketh"**—ঈশ্বর যে প্রাচীন কালে ঋষিদের নিষ্ঠা মতে কথা বলিতেন, তাহা নহে; তিনি এখনও মানব অন্তরে কথা বলেন। প্রার্থনা সহকারে সেই অন্তরের বাণী শুনিবার জন্য ব্যগ্রতার সহিত প্রতীক্ষা করিতে হয়। নতুবা সে বাণী শুনা যায় না। মহাজনগণও সকলে এক মত হইতে পারেন নাই। সত্য বটে সাধুগণ মূল বিষয়ে অনেক পরিমাণে এক মত ছিলেন, কিন্তু প্রণালী, অনুষ্ঠানে তাঁহাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কি রূপেই বা অভ্রান্ত গুরু নির্ব্বাচন করা যায়? কে অভ্রান্ত গুরু তাহাও আমার বুদ্ধি দ্বারাই স্থির করিতে হইবে এবং গুরু ও শাস্ত্র যাহা বলিবেন তাহার ভাবও আমিই গ্রহণ করিব। সুতরাং আমার বিকৃত বুদ্ধি তাহার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে পারে। বেদের

ব্যাখ্যা অনেকেই করিয়াছেন; সায়ণাচার্য্য কিংবা শঙ্করাচার্য্য কি দয়ানন্দ সরস্বতী কে প্রকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কাহার ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য তাহা আমিই নির্ণয় করিব। এইরূপে দেখা যায় যে কোন প্রকারেই আপনার বুদ্ধির হাত এড়াইতে পারা যায় না। তবে কি করিতে হইবে? মানুষ ব্রহ্ম-লাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া নানা শাস্ত্র আলোচনা করিবে, সাধুসঙ্গ করিবে, গভীরভাবে চিন্তা করিবে এবং ব্যাকুলভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিবে। এই সকল উপায় দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি হইবে তাহাই কার্য্যে পরিণত করিবে। হইতে পারে, মানুষ আজ যাহা সত্য বলিয়া ধরিল, তাহা বাস্তবিক সত্য নহে, এবং দুই দিন পরে তাহাই অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। কিন্তু তাহার যে অন্য গতি নাই। সে আজ যাহাকে সত্য বলিয়া জানে তাহাই সে অনুসরণ করিবে, এবং পরে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারিলে তাহা পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে মহত্ত্ব আছে, ইহাতে দেবত্ব আছে। পুরুষসিংহ শাক্যসিংহ ছয় বৎসর অনাহারে তপস্যায় রত রহিলেন; তৎপর যখন বুঝিতে পারিলেন যে, কৃচ্ছ্রসাধন ধর্ম্মের প্রশস্ত পথ নহে, তখনই তাহা পরিত্যাগ করিলেন; ছয় বৎসর ব্যাপিয়া যে কার্য্য করিয়াছেন তাহা এক মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিলেন, কারণ তাঁহার লক্ষ্য সত্যলাভ। এখানেই বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব। তাঁহার কোন জীবনচরিত-লেখক বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেব রাজ্য ধন, স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া যতদূর স্বার্থত্যাগ দেখাইয়াছিলেন, এই ছয় বৎসরব্যাপী আপনার অনুষ্ঠিত পন্থা সত্যের অনুরোধে পরিত্যাগ করিয়া, তাহা হইতে উজ্জ্বলতর আত্মোৎসর্গের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি তপস্যা পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে সত্যনিষ্ঠা ও স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত

দেখাইলেন, তাহাতে ঈশ্বর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহাকে সফলকাম করিলেন। বাস্তবিক অন্তর্য্যামী ভগবান্ মানবের মনের ভাব দেখেন। তিনি যখন দেখেন যে একব্যক্তি তাঁহারই জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, সে সত্য লাভের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে এবং লব্ধ সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে প্রস্তুত আছে, তখন তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। এক ব্যক্তি যদি দেখিতে পায় যে অপর একজন তাহার উপকারের জন্য, তাহার প্রীতির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে; তখন যদি সে উক্ত ব্যক্তির প্রীতি সম্পাদন করিতে যাইয়া মূর্খতা-নিবন্ধন একটু অনিষ্ট করিয়া বসে, আর তাহা যদি সেই ব্যক্তি জানিতে পারে, তবে কি সে তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকে? মানুষ সংসারে অপূর্ণ; সেই অপূর্ণতার জন্য ভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী, তবে যদি মানুষ সত্যলাভের জন্য চেষ্টা করে এবং যাহা সত্য বলিয়া জানে তাহা প্রাণপণে করিতে থাকে তবেই অন্তর্দ্দর্শী ভগবান্ প্রাণে সত্যের বিমল আলোক জ্বালাইয়া দেন। মানুষ ভুল করিতে পারে এবং করে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে যে তাহার সত্যনিষ্ঠা আছে কি না, সত্যলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা আছে কি না, এবং ঈশ্বরে মন রাখিয়া যাহা সত্য বলিয়া জানে তদনুসারে কার্য্য করিতে সে প্রস্তুত আছে কি না। এই সত্যলাভের চেষ্টার অভাবে আমাদের দেশের অনেক নিষ্ঠাবান্ লোকও মরণ পর্য্যন্ত নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িয়া থাকেন, এবং সম্যক্‌রূপে সত্যের অনুসরণে সাহস ও প্রবৃত্তি না থাকাতে অধোগতি প্রাপ্ত হন। সাধক যতই সত্য পালন করিতে থাকিবেন ততই নূতন সত্য তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইবে; এবং তৎসঙ্গে দিন দিন তাঁহার নৈতিক বল বৃদ্ধি পাইবে এবং যে সকল পাপ দমন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন বলিয়া বোধ হইত, তাহা সহজ-সাধ্য হইয়া আসিবে।

আত্মচিন্তা ও দীনতা।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে জ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সাধক সত্য-পিপাসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া সত্যলাভের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিবেন এবং যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, প্রাণপণে তাহাই সাধন করিবেন; ইহা ধর্ম্মজীবন লাভের একটি প্রধান উপায়। ধর্ম্মজীবন লাভের আর একটি উপায় আত্ম-চিন্তা। বাস্তবিক যিনি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, যিনি পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, যিনি পবিত্র-স্বরূপের সংস্পর্শে আসিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে আপনার জীবন পরীক্ষা করিতে হইবে। মানুষ সাধারণতঃ অন্যের সমালোচনা করিতে অত্যন্ত ব্যস্ত। অন্যের দোষ কীর্ত্তনে বড়ই আনন্দ পাওয়া যায়; পরচর্চ্চা আরম্ভ হইলে আর কিছুই মনে থাকে না। ঐ সকল নিন্দা চর্চ্চায় অনেকে এমনই ডুবিয়া যান যে, তখন অন্য কথা কর্ণেও প্রবেশ করে না। ইহা জীবনের অতীব শোচনীয় অবস্থা। এক প্রকার প্রেম আছে, যাহাতে প্রণয়ীর দোষ দেখিতে দেয় না, তাহাকে প্রকৃত প্রেম বলা যায় না, উহা প্রেমান্ধতা। সেইরূপ মানুষ যখন আপনার প্রেমে আপনি অন্ধ হইয়া যায়, তখন আর নিজের দোষ দেখিতে পায় না। কিন্তু প্রকৃত প্রেমিক কে? যে প্রণয়ীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং সেই জন্যই তাহার দোষ দেখাইয়া দিয়া তৎ-সংশোধনে প্রাণপণে যত্ন করে। সেইরূপ সেই ব্যক্তিই নিজকে বেশী ভালবাসে যে আপনার দোষ অনুসন্ধান করিয়া তৎসংশোধনে যত্নবান্ হয়। মানুষ কি ভ্রান্ত! সে আপনার দোষ দেখিতে পাইয়াও নানাপ্রকার যুক্তি তর্ক দ্বারা তাহা লঘু করিতে চেষ্টা করে, আর অন্যের সামান্য দোষ দেখিলেই তাহা প্রচার করিতে থাকে। যতদিন মানুষ এই অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইতে না পারিবে, ততদিন তাহার উন্নতি হওয়া অসম্ভব।

পার্থিব বিষয়ে দেখা যায় যে, যে ব্যক্তি আপনার অর্থাভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টিপাত করে না, সে গরীব হইলেও অর্থাগমের চেষ্টায় বিরত থাকে এবং ভবিষ্যতে নানা ক্লেশ ভোগ করে; সেইরূপ যে ব্যক্তি আত্মচিন্তা দ্বারা আপনার আধ্যাত্মিক অভাব সমূহ জ্ঞাত না হয়, সে তৎসংশোধনে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অন্যের দোষ দেখিলে কি হইবে? আপনার দোষ দেখা চাই। অবশ্য কোন কোনও সময়ে পরের দোষ প্রদর্শন করাও আবশ্যক হয়; কিন্তু তাহা নিন্দার ভাবে নয়, অন্যকে সংশোধন করিবার জন্য সৎভাবে দোষ দেখাইয়া দেওয়া এবং সেই দোষ দূর করিবার উপায় বলিয়া দেওয়া অতি মহৎ কাজ। দুর্ব্বল মানব সংসারপথে চলিতে চলিতে যখন পথভ্রান্ত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরকে এরূপ সাহায্য না করিলে চলিবে কেন? কিন্তু মানুষ কি সেইভাবে অন্যের দোষ দেখিয়া থাকে? অন্যের দোষ দেখিয়া কি তাহার চক্ষুতে জল আসে? বরং অনেক সময়ে আনন্দেরই উদয় হয়। ইহার একটি কারণ মানুষের আত্মদৃষ্টির অভাব, আর একটি কারণ এই যে অন্যের দোষ কীর্ত্তন করিয়া নিজের দোষ লঘু করিবার ইচ্ছা মানুষের মনে বড়ই প্রবল। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে পরনিন্দা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রাচীন মহিলারা যেরূপ সঙ্কল্প পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করেন, সাধককে সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত পরনিন্দা পরিত্যাগ রূপ মহাব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানে অন্যের উপকারের জন্য কিংবা সত্যের অনুরোধে দোষীর দোষ প্রকাশ করা আবশ্যক হইবে, সেখানেও অতি দুঃখের সহিত স্বীয় মত প্রকাশ করিতে হইবে। সাধক যদি আত্মচিন্তা আরম্ভ করেন, নিজের দোষ পরীক্ষা করিতে থাকেন, তবে আর পরনিন্দা করিবার সুবিধা থাকিবে না।

এইরূপে নিজের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অনুতাপের তীব্র

যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং আত্মদোষ দূর করিবার জন্য মনে ব্যাকুলতার উদয় হইবে। সুপ্রসিদ্ধ "যাত্রিকের গতি" (**Pilgrim's Progress**) প্রণেতা বানিয়ান্ সাহেব অতি পবিত্র চরিত্রবান্ লোক ছিলেন। তথাপি তিনি তীক্ষ্ণ আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা প্রাণে যদি একটু পাপের বীজ দেখিতে পাইতেন, তাহাতে এত অনুতপ্ত হইতেন যে, তাঁহার মনে হইত যেন জগতে তাঁহার অপেক্ষা আর ঘোরতর পাপী কেহই নাই ; যেন সমস্ত লোক তাঁহার পাপের কথা জানিতেছে, যেন সমস্ত পদার্থ তাঁহাকে শাস্তি দিতে আসিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার উপায় সহজেই অবলম্বন করা যাইতে পারে, অথচ পরনিন্দা করিবার অবসরই থাকে না। পরলোকগত মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'জীবন-বেদ' গ্রন্থে বলিয়াছেন, "আমার জীবন পুস্তকের প্রথম অধ্যায় প্রার্থনা, দ্বিতীয় অধ্যায় পাপ বোধ।" তাঁহার প্রথম জীবনে পাপবোধ এত প্রবল ছিল যে, তিনি লোকের সঙ্গে বেশী মিশিতে পারিতেন না ; তাঁহার মুখে তখন হাসি ছিল না। যাঁহার প্রাণে ক্ষুধা আছে, সে কি অন্ন না পাইলে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে ? সেইরূপ যাঁহার আত্মদৃষ্টি খুলিয়াছে, যাঁহার পাপ বোধ জন্মিয়াছে তাঁহার মুখে কি চিন্তা-বিহীনতার হাসি দেখা যাইতে পারে ? আমাদের সময়ে সময়ে পাপ বোধ হয় বটে কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। যখন পাপ বোধের জন্য কষ্ট পাইতে থাকি, তখন হয়ত পাপ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া কোনও রকমে উহা চাপা দিয়া রাখিয়া, বাহিরের বিষয় দ্বারা মনের কষ্ট দূর করিতে চেষ্টা করি ;

এইরূপ আত্ম-দৃষ্টি দ্বারা পাপ বোধ হইলেই দীনতা আসিবে। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ চৈতন্যদেব বলিয়াছেন :—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

"যে ব্যক্তি আপনাকে তৃণ হইতেও নীচ মনে করে, তরু হইতেও সহিষ্ণু হয় এবং নিজে সম্মানের ইচ্ছা বর্জ্জিত হইয়া অন্যকে সম্মান প্রদান করে, সেই হরির গুণকীর্ত্তনের উপযুক্ত।"

বাস্তবিক বিনীত না হইলে ধর্ম্মলাভ করা যায় না। যাহাদের জ্ঞানের অভিমান আছে, বিদ্যার অভিমান আছে, ধন কিম্বা জাতির অভিমান আছে, ধর্ম্মের দ্বার তাহাদিগের নিকট রুদ্ধ। গর্ব্বিত মস্তক লইয়া ধর্ম্মের দ্বারে প্রবেশ করা যায় না।

"হ'য়ে দীনের দীন তৃণেবো হীন,
হওরে তাঁর কৃপার অধীন।"

ইহাই সার কথা। বিনয় না হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না। তাই দেখা যায় জ্ঞান-গর্ব্বে গর্ব্বিত গৌরচন্দ্র ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াই কাঙ্গাল সাজিলেন। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "দীনাত্মারা ধন্য, কারণ স্বর্গরাজ্য তাঁহাদেরই জন্য" (**Blessed are the poor in spirit: for theirs is the Kingdom of Heaven.**)। এই দীনতা, এই বিনয়ের ভাব, আত্ম-পরীক্ষা দ্বারা অনেক পরিমাণে লাভ করা যায়। কারণ মানুষ যখন দেখিতে পায় যে, তাহার অসংখ্য দোষ রহিয়াছে, সে পাপের সাগরে ডুবিয়া রহিয়াছে, তখন কি আর সে অহঙ্কারে মস্তক উত্তোলন করিতে পারে? কি লইয়া তখন সে অহঙ্কার করিবে? তাহার বিদ্যা বুদ্ধি কতটুকু? তাহার যে কিছুই নাই। পাপ চারিদিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, সুতরাং অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়।

এই অবস্থাতে পাপ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেক উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। সাধুসঙ্গ, শাস্ত্র পাঠ প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলা

হইয়াছে। প্রার্থনা, পাপ হইতে মুক্তির একটি প্রধান অবলম্বন ; সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে বলা হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপায় আছে, যাহা এক অর্থে প্রার্থনারই অন্তর্গত তবুও সুবিধার জন্য এস্থলেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। মানুষ আত্ম-চিন্তা দ্বারা যখন নিজকে ঘোর পাপী বলিয়া অনুভব করে, তখন যদি সে সৎ বিষয় দ্বারা মন পূর্ণ করিতে পারে, তবেই পাপ সহজে দূর হয়। মন একেবারে শূন্য থাকে না, কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিবেই। যদি ভাল বিষয় দ্বারা মনকে পূর্ণ করিয়া না রাখা যায়, তবে কুচিন্তা আসিয়া মনকে অধিকার করিবেই করিবে। মানুষের মন সাধারণতঃ এত দুর্ব্বল যে, সহজেই কুবিষয়ে যাইতে চায়, অনেক সময়ে চেষ্টা করিয়াও ফিরান যায় না! তাহা যদি আবার শূন্য থাকে, তবে সহজেই পাপ-চিন্তা প্রবেশ করিবে। সেই জন্যই সাধুগণ বলিয়া থাকেন, যাহারা দুর্ব্বল চিত্ত, তাহাদের অনেক সময়ে কার্য্যে লিপ্ত থাকিলে অসাধুভাব মনে প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় না। বাস্তবিক মন শূন্য থাকিলে নানাপ্রকার অসাধুভাব আসিয়া উহাকে অধিকার করে। তাই দেখা যায়, আমাদের দেশের অনেক লোক যখন বিদেশে কার্য্য করেন, তখন বেশ ভাল থাকেন, দেশের সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকেন, কাহারও সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিলে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহারাই যখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বাড়ীতে আসিয়া বসেন, তখন নানাপ্রকার দলাদলি, ঝগড়া কলহের কারণ হইয়া পড়েন। তখন তাহাদের মন কোনও বিশেষ কার্য্যে নিবিষ্ট না থাকাতে নানাপ্রকার বিকারে লিপ্ত হয়। সুতরাং মন যাহাতে সর্ব্বদা ভাল বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে, তদ্বিষয়ে যত্ন করা আবশ্যক। যে সময়ে বিশেষ কোনও কার্য্য না থাকে, তখন কোনও ভাল বিষয় চিন্তা করিলে কিংবা ভাল লোকের জীবনের বিষয় ভাবিলে

অনেক উপকার হইতে পারে। অনেকে ঐ সময়ে মনে মনে ভগবানের কোন নাম জপ করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ অবস্থানুরূপ সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা রচনা করিয়া মনে মনে উচ্চারণ করেন। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে অসাধু চিন্তা সহজে মন হইতে দূর হইতে পারে; এবং ধর্ম্মজীবন লাভের পথ কতক পরিমাণে পরিষ্কার হইতে পারে।

প্রেম সাধন।

ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায় প্রেম সাধন। যীশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, যদি তুমি নৈবেদ্য লইয়া বেদীর নিকট আসিয়া থাক, আর তখন যদি মনে পড়ে যে কাহারও সঙ্গে তোমার অপ্রেম ভাব আছে, তবে নৈবেদ্য রাখিয়া আগে তার সঙ্গে মিলন করিয়া এস; নতুবা নৈবেদ্য গৃহীত হইবে না। যিনি ধর্ম্মসাধন করিতে চান, তাঁর কাহারও প্রতি বিরূপ ভাব থাকিলে চলিবে না। যাহারা আমাকে ভালবাসে তাহাদের যদি ভালবাসি, সে ত বেশী কিছু নয়। যে আমাকে ভালবাসে না, যে উপেক্ষা করে, যে আমার ভালবাসাতে সায় দেয় না, তাহাকেও ভালবাসিতে হইবে। যে আমার অনিষ্ট চিন্তা, অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার কল্যাণ চিন্তা, কল্যাণ চেষ্টা করিতে হইবে। যে বিপথে যায়, তার প্রতিও প্রেম রাখিতে হইবে। প্রেম, পবিত্র প্রেম ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায়। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ, তিনি সকলকে ভাল-বাসেন। তাঁহার সন্তান আমরা, তাঁহাকে চাই আমরা, আমাদেরও সকলকে প্রেম বিলাইতে হইবে। অনিষ্ট পেয়েও বিলাইতে হইবে।

ব্যথা যেই দেয়, তাকে প্রেমে রাখি
বিপথে যে যায় তাকে প্রেমে ডাকি ।

কাহাকেও দূরে রাখিবে না,—সকলকে প্রেম দ্বারা আপনার করিয়া লইতে হইবে । প্রেমই সাধনের প্রধান মন্ত্র ।

উপাসনা তত্ত্ব

উদ্বোধন।

ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভেই ঈশ্বরোপাসনা। অনেক লোক আছেন, যাঁহারা উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, উহা দুর্ব্বলতার চিহ্ন বলিয়া উড়াইয়া দেন এবং কেবল নিজের শক্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াই চরিত্র গঠন করিতে প্রয়াস পান। এখানে তাঁহাদের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে, তাহার বিশেষ আবশ্যকতাও নাই। তবে মাত্র এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, উপাসনা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়। মানুষ ইচ্ছা করুক আর না করুক, বিপদে পড়িলেই প্রার্থনার ভাব মনে আসে; জগতের রহস্যপূর্ণ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই মনে সহজে ভক্তির ভাব উদিত হয়। ইহাকে যাহারা দুর্ব্বলতা বলিতে চান, বলিতে পারেন; মানুষ দুর্ব্বল—চিরকালই দুর্ব্বল থাকিবে। যখন প্রতি পদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষের ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য হইতেছে না, সে বার বার বাধা প্রাপ্ত হইতেছে; বার বার উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, বার বারই পড়িয়া যাইতেছে; তখন কেমন করিয়া বলিব মানুষ দুর্ব্বল নয়? তখন কেমন করিয়া সে প্রার্থনা না করিয়া থাকিবে? এই উপাসনা-তত্ত্ব অতি গূঢ়; ইহা যুক্তি তর্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বুঝান যায় না। উপাসনা অস্বাভাবিক নয়, উপাসনা প্রার্থনাও ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট একটি নিয়ম; উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিলে, অন্য কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম অবহেলা করা হয় না; বরং জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার সুবিধা হয়, যুক্তি তর্ক দ্বারা

এতদূর পর্য্যন্ত প্রমাণ করা যায়। কিন্তু উপাসনা যে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের নিয়ম,—উহা দ্বারা যে নিশ্চয়ই মানবাত্মার উপকার হয় ইহা যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কি না বলা যায় না। তবে আর একটি উপায় আছে। উপাসকদিগের অভিজ্ঞতা উপাসনার উপকারিতার একটি প্রধান প্রমাণ। যাঁহারা উপাসনা করিতেছেন তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে "উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা ফল পাওয়া যায়।" হে মানব, তুমি জন্মের মধ্যে যদি একটি দিনও স্থিরভাবে বসিয়া উপাসনা না কর, তবে উহাতে ফল আছে কি না কেমন করিয়া বুঝিবে ? তুমি চিনি না খাইয়াই যদি বল যে উহাতে মিষ্টতা নাই, তাহা হইলে তর্ক দ্বারা তোমাকে বুঝাইতে পারিব না যে, চিনি মিষ্ট ; কিন্তু আমি বলিব, আমি চিনি খাইয়া দেখিয়াছি উহা মিষ্ট ; যাঁহারা চিনি খাইয়াছেন তাঁহারাও বলিয়াছেন যে উহা মিষ্ট ; তুমি খাও, তবে তুমিও বলিবে যে বাস্তবিকই চিনি মিষ্ট। যাঁহারা উপাসনা প্রকৃতভাবে করিয়াছেন, তাঁহারা একবাক্যে উপাসনার মহিমা ঘোষণা করিতেছেন ; আর তুমি, আমি উপাসনা না করিয়াই যদি বলি উপাসনা কিছু নহে, তবে উহা আমাদের ধৃষ্টতা হইবে। বাস্তবিক উপাসনার আবশ্যকতা আছে, তাহাতে উপকার আছে। উপাসনায় প্রাণ মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় ; প্রাণে নূতন ভাবের সঞ্চার হয়, নূতন তেজ আসে, মানবাত্মা পরমাত্মার সহিত যুক্ত হয়।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' পুস্তকে লিখিয়াছেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" "তাঁহাতে (ঈশ্বরে) প্রীতি ও তাঁহার প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রিয়কার্য্য সাধনই উপাসনা।" চৈতন্যের ও খৃষ্টেরও বাক্য দুটি হইতে মহর্ষি রচিত বাক্যটি কত শ্রেষ্ঠ। প্রীতি ও মানব সেবা দুটি স্বতন্ত্র

পদার্থ নহে। মহর্ষি বলিয়াছেন, উপাসনার দুই অঙ্গ—ঈশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য অনুভব করিয়া মানব সেবা। প্রীতি সাধন যেমন উপাসনার এক অঙ্গ, প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য বোধে মানব সেবাও উপাসনার অন্য অপরিহার্য্য অঙ্গ। মানবের সেবা করিলেই উহা ঈশ্বরের উপাসনার অঙ্গ হয় না। একজন নাস্তিক অজ্ঞেয়বাদীও মানব সেবা করিতে পারেন। মানবের সেবা করিতে হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সেবা যখন ঈশ্বর প্রীতি-নিঃসৃত ও তাঁর প্রিয়কার্য্য বোধে সম্পন্ন হয়, তখনই তাহা উপাসনার অঙ্গ হইয়া উঠে। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—'নামে রুচি ও জীবে দয়া' ইহাই ধর্ম্মের সার। মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন,—"Love God thy Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and love thy neighbour as thyself." 'প্রভু পরমেশ্বরকে তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত মন ও সমস্ত আত্মা দ্বারা ভক্তি কর এবং প্রতিবাসী (মানবকে) নিজের ন্যায় ভালবাস।' একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ও নর-সেবা ইহাই ধর্ম্ম, ইহাই উপাসনা। যাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিতে স্বতঃই প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য কি? তাঁহার ত কোনও অভাব নাই। তাঁহার সন্তানের সেবা, নর-সেবা, জীবজন্তুগণের সেবাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য। তাঁহার প্রিয় কার্য্যের বিষয় পরে বলিতে চেষ্টা করিব, সম্প্রতি প্রীতির বিষয় কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

সাধারণ লৌকিক ভাষায় ঈশ্বর-প্রীতিকেই সাধকেরা উপাসনা বলিয়া থাকেন। এই উপাসনার কয়েকটি অঙ্গ আছে,—উদ্বোধন,

প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান, সমাধি ইত্যাদি। এই সকল অঙ্গ সাধন অতি স্বাভাবিক। প্রাত্যহিক উপাসনায়ও এই সকল অঙ্গ সাধনের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, যে জীবনে এই সকল অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়। ধর্ম্মোন্মুখ জীবনের প্রথম অবস্থাই উদ্বোধন। বাস্তবিক উদ্বোধন না হইলে প্রার্থনা, আরাধনা কিছুই হয় না। মানুষ যখন ঘোর মোহ-নিদ্রায় অচেতন থাকে, তখন তাহার মনে প্রার্থনাদির ভাব কিছুই আসে না। মানুষ নানাপ্রকার সাংসারিক স্বপ্নে ডুবিয়া থাকে, আপনার অবস্থা আপনি বুঝে না। যেমন মদ্যপায়ী ব্যক্তি নেশাতে বিভোর হইয়া একপ্রকার কৃত্রিম সুখে নৃত্য করিতে থাকে, ঘরে অন্ন আছে কি না তাহা ভাবে না, সেদিকে একেবারে দৃষ্টিই রাখে না; তেমনই সংসারে অসংখ্য লোক মোহ-মদিরা পানে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, তাহারা আপনাদের আধ্যাত্মিক অভাব কিছুই বুঝিতে পারে না। তাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, কর্ণ থাকিতেও বধির। কিন্তু সেই মদ্যপায়িগণের মদের নেশা যখন ছুটিয়া যায়, তখন গৃহে অন্ন নাই দেখিয়া যেমন হায় হায় করিতে থাকে, সেইরূপ সংসারাসক্ত জীব যখন উদ্বুদ্ধ হয়, তাহার মোহের পাশ যখন কাটিয়া যায়, তখন আপনার নানাপ্রকার অভাব দেখিয়া একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। ভগবান্ যে কত উপায়ে এই মোহের ঘোর মধ্যে মধ্যে কাটিয়া দেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নানা ঘটনা, নানা অবস্থার ভিতর দিয়া মানুষকে আহ্বান করেন, বরণ করেন। এমন লোক অতি অল্পই আছে, যাহার জন্মের মধ্যে অন্ততঃ একবারও সংসারে বিরক্তি জন্মে নাই; আত্ম-দৃষ্টি জাগ্রত হয় নাই। যখন স্নেহশীলা জননীর চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার অঞ্চলের নিধি একমাত্র

পুত্র তাঁহাকে চিরকালের জন্য কাঁদাইয়া চলিয়া যায়, তখন কি তাঁহার সংসারের সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না? যখন প্রেমিক পুরুষের বক্ষস্থল হইতে দুরন্ত মৃত্যু তাঁহার প্রাণসমা চিরসহচরী সহধর্ম্মিণীকে লইয়া যায়, তখন কি তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় না? আবার যখন দুরাচার পাষণ্ডগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া, নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, তখন কি তাহাদের মনে ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হয় না? যখন দস্যু তস্করগণ রাজপুরুষ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, জনসাধারণের ঘৃণাব্যঞ্জক বিদ্রূপ দৃষ্টিও ধ্বনির মধ্য দিয়া নীত হয়, তখন কি তাহাদের আপন পাপজীবনকে ধিক্কার প্রদান করিতে প্রবৃত্তি হয় না? এইরূপে পরমেশ্বর নানা উপায়ে মানব-হৃদয়ে বৈরাগ্যের ভাব জাগাইয়া দেন, তাহাদের আত্মদৃষ্টি খুলিয়া দেন। এমন হতভাগ্য এ জগতে আজও জন্মগ্রহণ করে নাই যাহার হৃদয়ে অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই শুভ ভাবের উদয় হয় নাই। পরমেশ্বর করুণা করিয়া সকলের হৃদয়েই এই শুভ ভাব আনয়ন করেন; কিন্তু মানুষ সে ভাব ধরিয়া রাখিতে পারে না; সংসারের প্রলোভনে সে ভাবটিকে হারাইয়া ফেলে। সময়ে সময়ে অনুতাপের হাত এড়াইবার জন্য মানুষ নানাপ্রকার বাহ্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। এই সময়ে যদি সাধুলোকের উপদেশ পাওয়া যায়, অথবা সৎগ্রন্থ হাতে পড়ে, তবে ঐ ভাবটি স্থায়ী হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। কিন্তু এই ভাব ত অবস্থা বিশেষে আপনা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়; আমাদের কি এই ভাব জাগাইবার কোন কিছু উপায় নাই? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি মদ্যপানে বিভোর হইয়া রহিয়াছে, তাহার গৃহে অন্ন না থাকিলেও, সে তাহার জন্য কোন চেষ্টা যত্ন করে না; সেইরূপ যাহার

নিজের আধ্যাত্মিক অভাব বোধ হয় নাই, তাহার ধর্ম্মলাভের আকাঙ্ক্ষাও জন্মে না। সে লোক দেখান ধর্ম্ম করিতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা তাহার নাই। এই উদ্বদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তির জন্য মানুষ কি করিতে পারে? তাহার দুইটি উপায় আছে—একটি আত্ম-চিন্তা, অপরটি সাধুসঙ্গ। নিজকে যদি বিশেষভাবে পরীক্ষা করা যায়, নিজের কত পাপ রহিয়াছে তাহা যদি সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি মহৎ লোকের জীবন আলোচনা করা যায়, তবে যথেষ্ট উপকার দর্শিতে পারে। তখন মানুষ বুঝিতে পারে যে, সে কত নীচ, কত ঘৃণিত। পাপীদের কিরূপ অনুতাপ হয়, পাপ করিলে কিরূপ যন্ত্রণা অনুভূত হয়, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয়, তাহা ভাবিলেও পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। সাধুতা দ্বারা কিরূপ আনন্দ ও প্রসন্নতা লাভ করা যায়, তাহা চিন্তা করিলেও সাধুতার প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। সাধু-সঙ্গে ঘোর পাপীর হৃদয়েও ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। তাঁহাদের বিবেক, বৈরাগ্য, ধর্ম্মনিষ্ঠা, প্রসন্নতা ও উৎসাহ দেখিলে, ঘোর বিষয়ীর প্রাণেও দেবভাব জাগিয়া উঠে। এই সকল উপায় অবলম্বন করিলে, নিজের অবস্থা কি মানুষ তাহা বুঝিতে পারে; তখন নিজের জীবনে ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়, নবজীবন লাভের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মে। এই সময়ে লোক নানা উপায় অবলম্বন করে। সাধুসঙ্গ, শাস্ত্রপাঠ, সৎচিন্তার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতীত সহজেই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনার ভাব মনে উদিত হয়। যখন নিজের প্রতি দৃষ্টিপাত হয়, যখন নিজের পাপ *বিশেষ ভাবে স্মৃতিপথে পতিত হয়, তখন মনের কিরূপ ভাব হয়, তাহা* ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কেহ বুঝিতে পারে না। এই অবস্থাকেই "অনুতাপ" বলে। মানুষ এই অবস্থায় পড়িয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে

পারে না। কোথায় যাইয়া শান্তি পাইবে, প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে, তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায়। তখন এই ধনধান্য পরিপূর্ণা বসুন্ধরা অপ্রীতিকর বোধ হয়। স্ত্রী পুত্র, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের অকপট প্রেম ও স্নেহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। সকলেই যেন দলবদ্ধ হইয়া যন্ত্রণা দিতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। এই অবস্থা যে কি ঘোর যন্ত্রণাদায়ক, তাহা অনুতপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত অপরে বুঝিতে অসমর্থ। এই অবস্থায় পড়িয়া মানুষ আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত হইতে পারে। এই সময়ে অনেকে শান্তির আশায় কুসংস্কার-নীতি অবলম্বন করে। এই অনুতাপের সময়ে অন্যান্য উপায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনার ভাব সহজে সাধকের প্রাণে উদিত হয়। বাস্তবিক অনুতপ্ত হৃদয়েই প্রকৃত প্রার্থনার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য হৃদয়ে খাঁটি প্রার্থনার উদয় হয় না। আমরা "অনুতাপ" এই কথাটি সচরাচর শুনি ; অনুতাপ কি ? অনুতাপ সম্বন্ধে কতগুলি ভ্রান্ত মত আছে। একজনে পাপ করিতেছে মনে দুঃখ নাই, হঠাৎ তাহা অন্যে জানিল, অমনি দুঃখ আসিল ; ইহা প্রকৃত অনুতাপ নহে ; ইহা লোক লজ্জা। আবার কাহারও মনে হইল, আমার মত লোক এইরূপ কাজ করিবে ইহাও অনুতাপ নহে—আত্মাভিমান। মানুষ অন্যায় করিল, অন্যে জানুক আর না জানুক, তবুও যে তাহার প্রাণে ভয়ানক যন্ত্রণা উপস্থিত হইল, আপনার কাজের সমর্থনের ইচ্ছা হইল না—উহাই অনুতাপ—উহা তীব্র জ্বালা।

ভক্তিভাজন অশ্বিনীকুমার দত্ত যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তিনি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপাসনায় যোগ দিতেন। এতদ্ব্যতীত স্বর্গীয় ত্রিগুণাচরণ সেন প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বতন্ত্র একটি প্রার্থনা সমাজও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহারা পালাক্রমে সকলেই উপাসনা করিতেন। একদিন অশ্বিনী

বাবুর আত্মচিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি চিন্তা করিয়া দেখিলেন, যে তিনি ৩০ কি ৩৫ রকমের পাপে দোষী। তখন তাঁহার মনে হইল—আর ব্রহ্ম মন্দিরে যাইব না, প্রার্থনা সভাতেও উপাসনা করিব না। এত যাহার পাপ সে আবার উপাসনা করিবে কি প্রকারে। সেইদিন রবিবার ছিল। ত্রিগুণা বাবু জোর করিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মমন্দিরে লইয়া গেলেন। সেখানে গান শুনিলেন—

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর
নিরাশ হ'য়ে ফিরে যেয়োনা যেয়োনা"

অশ্বিনী বাবুর মনে হইল ঐ গানটি তাঁহার প্রাণে বল বিধান করিবার জন্যই হইতেছে। আশা ও আনন্দ লইয়া তিনি মন্দির হইতে ফিরিলেন। ভগবানের লীলা এইরূপই।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যখন সাধনা আরম্ভ হইল, কত গ্রন্থপাঠ, কত ধ্যানের পর তিনি বুঝিলেন, ঈশ্বর সর্ব্বত্র রহিয়াছেন, বিশ্ব-চরাচর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, এই আমি স্থির করিলাম, এতে সায় দেয় কে? তখন একদিন তাঁর সম্মুখ দিয়া একটি ছিন্নপত্র উড়িয়া গেল; তিনি তাহা তুলিয়া লইলেন। পরে দেখা গেল—উহা ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।

এই জগতে যাহা কিছু তাহা ঈশ্বর দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তাহা ত্যাগ দ্বারা ভোগ কর অন্যের ধনে আকাঙ্ক্ষা করিও না।

প্রার্থনা।

প্রার্থনা কি? প্রার্থনা কতকগুলি সুন্দর বাক্যবিন্যাস নহে, উহা ক্রন্দনও নহে, কতকগুলি কল্পনার সমষ্টিও নহে। দুর্ব্বল মানুষ যখন পাপে তাপে ক্লান্ত হইয়া, একান্তচিত্তে ব্যাকুল ভাবে সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে তখন কথা বলুক আর না বলুক, চক্ষুর জল ফেলুক আর না ফেলুক, ভূমিতে গড়াগড়ি যা'ক্ আর না যাক্, সে প্রার্থনা করিতেছে। যে পর্য্যন্ত আপনার অপদার্থতা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম না হয়, যে পর্য্যন্ত আপনার অভাব ভালরূপে বোধ না হয়, এবং নিজকে একেবারে নিরুপায় বলিয়া মনে না হয় সে পর্য্যন্ত ঠিক সরল ভাবে প্রার্থনা হয় না। সরল প্রার্থনার ভিতরে জলন্ত বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। পরমেশ্বর মানুষের অভাব মোচন করিতে পারেন ও করেন, মনের এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় থাকা চাই, নতুবা সরল প্রার্থনা অসম্ভব। এরূপ অনেক ভিক্ষুক আছে, যাহাদের গৃহে অন্নের যথেষ্ট সংস্থান রহিয়াছে, তবুও তাহারা ভিক্ষা করিয়া থাকে; তাহাদিগকে ভিক্ষা দিতে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে অভিমান ভরে তাহারা চলিয়া যায়। কিন্তু যাহার ক্ষুধায় প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, সে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াও চলিয়া যায় না; সে ক্রন্দন করে, মার খায়, আবার একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত হয়। কারণ সে জানে যে অভিমান করিলে তাহার চলিবে না। সেইরূপ একদল লোক আছে, যাহারা অন্যের দেখাদেখি প্রার্থনা করিয়া থাকে; তাহারা যে নিজের জীবনে কোন্ অভাব বোধ করিতেছে তাহা নহে; প্রার্থনা একটা করিতে হয় তাই করে; উহার উপর তত্টা আস্থা

নাই; আত্ম-নির্ভর, আত্মাভিমানই পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। প্রার্থনা করিতে যাইয়া যদি সন্থ ফল না পাইল, যদি আরও অধিকতর পরীক্ষার মধ্যে পড়িতে হইল, তবে অমনি তাহারা প্রার্থনা পরিত্যাগ করে। কারণ তাহাদের অভাব বোধ হয় নাই; তাহারা আপনাদিগকে অনন্যগতি মনে করিতে পারে নাই এবং যাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তাঁহাতেও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি পাপের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণের জ্বালাতে অস্থির হইতেছে, শান্তির জন্য ছুটিতেছে কোথাও শান্তি পাইতেছে না, পাপ দূর করিবার জন্য কত উপায় অবলম্বন করিতেছে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেছে না, সে অনন্যগতি হইয়া তাঁহারই স্মরণ লইবে, যিনি তাঁহাকে এই পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। সে জানে, ঈশ্বর ব্যতীত তাহার আর গতি নাই, সংসারে আর কেহ তাহাকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে না। তাই সে অনন্যোপায় হইয়া তাঁহারই দয়ার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে; যতক্ষণ তাঁহার করুণা না হয়, ততক্ষণ প্রতিগমন করে না; সে একেবারে তাঁহার চরণে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে। যদ্যপি সে জন্য তাহাকে অধিকতর বিপদে পতিত হইতে হয়, তথাপি সে ছাড়ে না; কারণ তিনি ব্যতীত আর যে তাহার গতি নাই। সে তাঁহার কৃপালাভের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহার দিকে তাকাইয়া বলিতে থাকে :—

"যখন যে ভাবে প্রভু রাখিবে আমারে,
আমার সেই সুমঙ্গল যেন না ভুলি তোমারে।"

আমার নিজের চেষ্টায় কিছু হইবে না, তিনি ভিন্ন আর গতি নাই, এই ভাবই তখন তাহার মনে জাগ্রত হয়। এই ভাবটি সহজে হয় না; অথচ এ ভাব না হইলে ঠিক প্রার্থনাও হয় না।

এস্থলে একটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিতে পারে; তাহাতে অনেক সময়ে সাধকের চিত্ত চঞ্চল হয়। পুরুষকার ও ব্রহ্মকৃপা এই দুইটি বিষয় লইয়া সাধককে বড়ই গোলযোগে পড়িতে হয়। যদি ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত কিছুই হইবার নহে, এবং ব্রহ্মের বিশেষ করুণা আকর্ষণ করিতে আমার কিছুমাত্রই সাধ্য নাই এই ভাব লাভ করিতে হয়, যদি আপনার সমস্ত চেষ্টার প্রতি একেবারে অবিশ্বাস জন্মান আবশ্যক হয়; "তিনি ভিন্ন আর গতি নাই" ইহাই যদি সাধনের মূলমন্ত্র হয়, তবে পুরুষকারের স্থান কোথায়? তবে কি সকল লোক আত্মচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া অলস হইয়া থাকিবে? তবে প্রচারকগণ লোককে যত্ন, চেষ্টা, অধ্যবসায়ের জন্য প্রোৎসাহিত করেন কেন? পুরুষকার ও ব্রহ্মকৃপার সামঞ্জস্য কোথায়? বাস্তবিক ব্রহ্মলাভ, ধর্ম্মজীবন লাভ ঠিক আপনার চেষ্টায় হয় না; ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত এ সকল অবস্থা লাভ অসম্ভব। নিজের চেষ্টা দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে টানিয়া আনিবে তাহা কি কখনও হয়? মানুষের প্রেম ও ভক্তি, জ্ঞান ও চেষ্টার এত শক্তি হইতে পারে না যে তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে পারে, অথচ আবার নিজের চেষ্টা ব্যতীতও কিছুই হইবার নহে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই প্রশ্নটা একটু পরিষ্কার হইবে। এই যে কৃষকগণ কৃষিকার্য্য করিতেছে, তাহাদের কৃষিকার্য্যের সুফল হওয়া পুরুষকার ও দৈবশক্তি এই উভয়ের উপর নির্ভর করে। কৃষক শত পরিশ্রম করিয়া বীজ বপন করুক, কিন্তু বৃষ্টি না হইলে কখনই সে বীজ অঙ্কুরিত হইবে না, এখানে দৈবশক্তির অভাবে তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। পরন্তু সে যদি পরিশ্রম করিয়া বীজ বপন না করে, তবে বৃষ্টিতে দেশ প্লাবিত হইলেও শস্য উৎপন্ন হইবে না। এখানে পুরুষকারের মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইল। কৃষক আপনার যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা বীজ বপন করিয়া অপেক্ষা করিবে, পরে দৈব শক্তিতে

যখন বৃষ্টি হইবে তখনই তাহার বীজ সুফল প্রদান করিবে। তাহাকে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বাইবেল গ্রন্থে একটি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। কয়েকজন কুমারী জনৈক বরের সঙ্গে বিবাহ বাড়ী যাইবে বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিল; বর রাত্রিতে আসিবেন, কিন্তু কখন আসিবেন তাহার নিশ্চয়তা ছিল না। সকলেই আলো জ্বালিয়া বরের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মধ্যে কয়েকটি বালিকা বুদ্ধিমতী ছিল; তাহারা সমস্ত রাত্রিই প্রদীপ জ্বলিতে পারে এরূপ তৈল সঙ্গে আনিয়াছিল; কিন্তু অন্যেরা সেরূপ করে নাই। যখন বর আসিলেন. তখন যাহারা অল্প তৈল আনিয়াছিল তাহাদের সমস্তই নিঃশেষিত হওয়ায় তাহারা পুনরায় তৈল সংগ্রহের জন্য চারিদিকে ছুটিল; ইতিমধ্যে বর চলিয়া গেলেন। যাহারা বেশী তৈল আনিয়াছিল তাহারা কেবল তাহার সঙ্গে যাইতে পারিল. অন্যেরা যাইতে পারিল না। বাস্তবিক ধর্ম্মজীবনে এরূপ ঘটনা অনেক ঘটিয়া থাকে। কখন ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হইবে, কখন শুভ মুহূর্ত্ত আসিবে কেহই জানে না। অতি সূক্ষ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মশক্তি অবতীর্ণ হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়া না থাকেন, তাঁহারা উহা ধরিতে পারেন না। শুভ ভাব সময়ে সময়ে সকলের হৃদয়েই আবির্ভূত হয়; কিন্তু যাঁহারা প্রথম হইতেই নিজ শক্তির দ্বারা আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখেন, এবং পরমেশ্বরের কৃপা লাভ করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে অপেক্ষা করিতে থাকেন, তাঁহারাই সফলকাম হইতে পারেন। ব্রহ্মকৃপা ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও আমরা জীবনধারণ করিতে পারি না; নিয়তই তাঁহার করুণা আমাদের উপর সাধারণভাবে কার্য্য করিয়া থাকে; কিন্তু তাঁহার বিশেষ করুণা ব্যতীত ধর্ম্মজীবন লাভের উপায় নাই। সুতরাং

আপনাদের যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহার বিশেষ কৃপা লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত আপনার শক্তি সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করা না যায়, সে পর্য্যন্ত নিজের অসমর্থতা মানুষ অনুভব করিতে পারে না; সে পর্য্যন্ত মনে অহঙ্কার থাকে। নিজের সমস্ত শক্তি এবং সমস্ত উপায় শেষ করিয়াও যখন দেখা যায় যে, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হয় না, পাপের বীজ দূর হয় না, তখনই মনে হয় যে আমার কিছুই শক্তি নাই, আমি সংসারে অতি ক্ষুদ্র প্রাণী। এই জন্যই বোধ হয় গীতাকার কর্ম্মযোগের পর জ্ঞান যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মদ্বারা অহঙ্কার ক্ষয় না হইলে প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। যে পর্য্যন্ত আপনার শক্তির অসারতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি না হয়, সে পর্য্যন্ত প্রকৃত প্রার্থনার ভাব উদিত হয় না। যখন দেখা যায়, নিজে শত চেষ্টা করিয়াও পাপ দূর করিতে পারিতেছি না, পাপের বীজ তবুও থাকিয়া যাইতেছে, তখনই প্রকৃত প্রার্থনা আরম্ভ হয়। তবে পুরুষকার দ্বারা যে কিছুই হয় না তাহা নহে। পুরুষকার দ্বারা অনেকে অনেক মহত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়াছেন, নিজ চরিত্রও অনেক উন্নত করিয়াছেন; কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, যিনি প্রকৃত ভক্ত হইতে চান, তাঁহাকে কেবল পুরুষকারের পথে চলিলে হইবে না; যাহাতে নিজের অসারতা বুঝিয়া ব্যাকুল ভাবে ব্রহ্মকৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারেন, যাহাতে প্রকৃত প্রার্থনার ভাব মনে আসে, তজ্জন্য যত্ন করিতে হইবে। এই সম্বন্ধে কতকগুলি উপায়ের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন শাস্ত্র পাঠ, দর্শন বিজ্ঞান পাঠ, সাধুসঙ্গ, সদালোচনা, সৎচিন্তা, আত্মচিন্তা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক,

সেইরূপ প্রার্থনা করাও কর্ত্তব্য। একেবারে কেহই সপ্তম স্বর্গে উঠিতে পারে না; একেবারে কেহই প্রার্থনার গভীরতম স্তরে পৌঁছাইতে পারে না। সুতরাং অল্পে অল্পে প্রার্থনা আরম্ভ করিতে হইবে। তবে যতদূর পারা যায় একাগ্রতা ও ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রার্থনা করা আবশ্যক। একাগ্রতা ব্যতীত কিছুই সাধিত হয় না। অনেককে দেখা যায় যে তাঁহারা পূজা অর্চ্চনা করিতেছেন, অথচ তাঁহাদের মন রহিয়াছে অন্য দিকে; এরূপ পূজা পূজাই নহে। প্রার্থনার প্রথম বিধি পাপ বোধ, দ্বিতীয় বিধি একাগ্রতা ও ব্যাকুলতা। সাধকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই যেন তাঁহার প্রার্থনা প্রাণগত হয়। যেন প্রার্থনার সময়ে মন পরমেশ্বরে নিবিষ্ট থাকে। এইরূপ করিতে করিতে সাধক অনেক তত্ত্ব লাভ করেন। ব্যাকুল প্রার্থনা হইলেই ধর্ম্মজীবন প্রকৃতরূপে আরম্ভ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে প্রেম জাগিতে থাকে। যতই প্রেম জাগে ততই আরাধনা, ধ্যান প্রভৃতি স্বাভাবিক ভাবে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়।

প্রার্থনার বিষয় ও দায়িত্ব।

প্রার্থনার বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া স্বতঃই এই প্রশ্ন সাধকের মনে উদিত হয় যে কিসের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা যাইতে পারে। মানুষ ত কত রকমেরই প্রার্থনা করিয়া থাকে, সকল প্রার্থনাই কি পূর্ণ হয়? "আয়ুর্দেহি, ধনংদেহি, যশোদেহি, ভাগ্যংদেহি" প্রভৃতি কত বিষয়ের জন্যই ত প্রার্থনা করা হয়। অনেকে আবার এই সকল স্বাভাবিক প্রার্থনা করিয়াই বিরত হয়

না; আপনাদের দুষ্কার্য্যের সহায় হইবার জন্যও অনেক সময়ে মানুষ পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। এদেশে ঠগ নামে একদল দস্যু ছিল; তাহারা দস্যুবৃত্তিতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার জন্য কালী পূজা করিত। বর্ত্তমান সময়েও কত লোক মিথ্যা মোকর্দ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করে। তদ্ব্যতীত আত্মীয় স্বজনের ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি, নিজের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অনেকে প্রার্থনা করিয়া থাকে। অনেকে আবার সত্যনিষ্ঠা, প্রেম, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গুণ সমূহ লাভের জন্যও পরমেশ্বরের নিকট প্রাণের গভীর প্রার্থনা জানাইয়া থাকে। এই সমস্ত প্রার্থনাই কি পূর্ণ হইবে? যত প্রকার স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক প্রার্থনা মানুষ ঈশ্বরের নিকট জানায়, সকলই কি তিনি পূর্ণ করিবেন? ইহা কখনই সম্ভব নহে। পরমেশ্বর দয়া, ন্যায় ও মঙ্গলের আধার; সুতরাং তিনি দয়া, ন্যায় ও মঙ্গল ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রার্থনা পূরণ করিয়া থাকেন। যে সকল প্রার্থনা অন্যায়, নীতি বিগর্হিত, সে সকল প্রার্থনা তিনি কখনই পূর্ণ করেন না। অবশ্য সময়ে সময়ে অন্যায় কার্য্যকেও জয়যুক্ত হইতে দেখা যায়; সে কেবল মানুষের কথঞ্চিৎ পরিমাণে স্বাধীনতা আছে বলিয়া। মানবের স্বাধীনতা আছে বলিয়াই তাহার মহত্ত্ব, তাহার দেবত্ব সম্ভবপর; ইহাতেই তাহাতে ও পশুতে পার্থক্য। আর স্বাধীনতার অর্থই থাকে না, যদি অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে। তবে পরিণামে অন্যায় কখনই জয়যুক্ত হইতে পারে না। অন্যায় অস্বাভাবিক প্রার্থনা তিনি গ্রহণ করেন না। তিনি ন্যায়বান্ সুতরাং অন্যায় প্রার্থনা শুনিবেন কেন? আবার অনেক প্রকার প্রার্থনা আছে, যাহা গর্হিত নয়,

তাহার সকলই কি পরমেশ্বর পূর্ণ করিয়া থাকেন? নির্ব্বোধ মানুষ নিজের ভাল মন্দ কিছুই বোঝে না। যাহা সে মঙ্গলকর মনে করে তাহা বাস্তবিক মঙ্গলকর নাও হইতে পারে। মানুষের প্রত্যেক প্রার্থনাই যদি পূর্ণ হইত, তবে পৃথিবী নরক হইত, মানুষের দুঃখের সীমা থাকিত না। শোকতাপ প্রপীড়িত মানব-সন্তান শান্তি-হারা হইয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকিত এবং যাহা আপাতমনোরম তাহা পাইবার জন্যই ব্যস্ত হইত ও তজ্জন্য প্রার্থনা করিত। কিন্তু কাহার পক্ষে যে কি উপকারী তাহা ঈশ্বর ব্যতীত কেহ জানে না। বিকারগ্রস্ত রোগী নানাপ্রকার কুপথ্য আহার করিবার জন্য ব্যস্ত হয়; কিন্তু সুচিকিৎসক কি তাহার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন? সেইরূপ মোহাচ্ছন্ন অল্পবুদ্ধি মানব নানা বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, কিন্তু মঙ্গলময় ঈশ্বর সে সমস্ত প্রার্থনাই পূর্ণ করেন না। তিনি যাহা যাহা মঙ্গলকর দেখেন, তাহারই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। তিনি পরম দয়াময়, তাঁহার প্রেমবাহু সর্ব্বদা আমাদিগের উপর প্রসারিত রহিয়াছে, আমাদিগের যাহাতে মঙ্গল হয় তিনি তাহারই ব্যবস্থা করেন; সুতরাং আমাদের সকল প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। তিনি যে প্রার্থনা আমাদের মঙ্গলকর জানেন, তাহাই পূর্ণ করেন।

তাহাই যদি হইল, যদি প্রার্থনার পূর্ণতা অপূর্ণতা তাঁহার মঙ্গল ভাবের উপরই নির্ভর করিল, তবে মানুষ কি বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে? কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ তাহাত মানুষ কিছুই জানে না। তবে কি মানুষ চুপ করিয়া থাকিবে? প্রকৃতভাবে দেখিতে গেলে মানুষের একটি মাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা এই, "প্রভু, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক"—"Thy will be done. . ইহাই সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা। মানুষ

যখন সরল অন্তরে এই প্রার্থনা করে, তখন সে ধর্ম্মের অতি উচ্চ সোপানে স্থিত। একটি সঙ্গীতে আছে—

"জানি তুমি মঙ্গলময় হে
জানি তুমি মঙ্গলময়।
সুখে রাখ দুঃখে রাখ যে বিধান হয়।"

আর একটি গানের একটি পদ এই "তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।" এই সকল সঙ্গীত অতি উচ্চ অবস্থার পরিচায়ক। মানুষের মন যখন সংসারের স্বার্থ চিন্তা, বিষয় বাসনা ও সুখ দুঃখের অতীত হয়, তখনই সে প্রকৃতভাবে এই প্রার্থনা করিতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি সে কি করিবে? তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখে থাকা আবশ্যক কি দুঃখের আবর্ত্তে পড়া প্রয়োজন, ধনী হওয়া ভাল না গরীব হওয়া মঙ্গলকর, তাহা সে জানে না, তবে কিরূপে সে এই সকল বিষয়ের জন্য প্রার্থনা করিবে? কারণ যে মুহূর্ত্তে এই ধনজন-সম্পদের জন্য সে প্রার্থনা করিতে যায়, তখনই তাহার মনে হয় যে, ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত না হইতেও পারে। সুতরাং এই সকলের জন্য সরল প্রার্থনা বাহির হয় না।

কিন্তু কতকগুলি বিষয় আমাদের জানা আছে যাহা লাভ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত; তাহা প্রেম, ভক্তি, দয়া, পবিত্রতা, বিবেক-স্বার্থনাশ, বৈরাগ্য প্রভৃতি। পরমেশ্বর ইচ্ছা করেন যে তাঁহার সন্তানগণ এই সকল সদ্‌গুণে বিভূষিত হউক। যাহাতে মানব সন্তান এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করিয়া এবং তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে তজ্জন্যই তাহাদিগকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল গুণ মানুষ লাভ করুক ইহা তাঁহার অভিপ্রেত। এই সকল বিষয়ের জন্য মানুষ সরলভাবে প্রার্থনা করিতে পারে; কিন্তু সাংসারিক সুখ-সম্পদ, শারীরিক সুস্থতা, অসুস্থতা, আত্মীয় স্বজনের আরোগ্যলাভ,

সুখশান্তি প্রকৃত মঙ্গলকর কিনা তাহা যখন মানুষ জানে না, তখন তাহার জন্য সে সরলভাবে প্রার্থনাও করিতে পারে না। তবে একটি কথা আছে ; মানুষ ত একেবারে উন্নতি লাভ করিতে পারে না ; মানুষ যখন ধর্ম্মোন্মুখ হয় তখনও তাহার সুখ প্রাপ্তির ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইহা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং তজ্জন্য বাহিরে প্রার্থনা করুক আর না করুক, মনের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরের নিকট প্রেরিত হয়। যখন মানুষ রোগে, শোকে ও দরিদ্রতায় কষ্ট পাইতে থাকে, তখন এই সকল নিবারণের জন্যই স্বভাবতঃ সে পরমেশ্বরের নিকট ক্রন্দন করে। এই সকল শুভ কি অশুভ তাহা চিন্তা করিবার তখন সময় থাকে না। এইরূপ প্রার্থনায় কোন দোষ নাই ; কারণ সন্তান মায়ের নিকট সকল রকমের আব্দারই জানাইয়া থাকে। মা কিন্তু সকল আব্দার পূরণ করেন না। সেইরূপ বিশ্বজননী যিনি, তাঁহার নিকট সমস্ত দুঃখই জানাইতে পারা যায় ; কিন্তু তিনি যাহা শুভঙ্কর বিবেচনা করেন তাহারই বিধান করেন। তবে মানুষের সর্ব্বদাই এই যত্ন থাকা আবশ্যক যে, যাহাতে এই সকল সাংসারিক সুখ দুঃখে মনে প্রার্থনার ভাব না আসে, যাহাতে তাহার ইচ্ছা পরমেশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হয়, সুখ দুঃখের অতীত হইয়া "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক" এই কথা বলিতে পারে। সুখে রাখ আর দুঃখে রাখ ক্ষতি নাই, সম্পদে রাখ আর বিপদে ফেল দুঃখ নাই, ধন মান বিদ্যা বুদ্ধি দাও আর না দাও কোন আপত্তি নাই। কিন্তু মন যেন চিরকাল তোমার চরণে থাকে এবং চিরকাল যেন তোমার আদেশ পালন করিতে পারি, এইরূপ প্রার্থনার ভাব মনে যাহাতে উদিত হয়, তজ্জন্য সাধন করিতে হইবে।

যেমন একদিকে বলা হইয়াছে যে, অস্বাভাবিক প্রার্থনা কখনই পূর্ণ হয় না, এবং যে সকল প্রার্থনা স্বাভাবিক তাহার মধ্যে যাহা আমাদের

মঙ্গলকর নয় তাহাও পূর্ণ হয় না, যাহা আমাদের শুভকর তাহাই কেবল পূর্ণ হইয়া থাকে; সেইরূপ আবার দেখা যায় যে, প্রেম, ভক্তি, দয়া, পাপদমন প্রভৃতির জন্য যে মানুষ প্রার্থনা করে, তাহাও সকল সময়ে পূর্ণ হয় না। এই সকল মানুষ লাভ করুক, ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রায়; কিন্তু অনুপযুক্ত পাত্রকে তিনি ইহা দান করেন না। এই সকল সদ্‌গুণ লাভ করিবার জন্য মানুষের কতক পরিমাণে উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের জন্য প্রার্থনা জানাইবার পূর্ব্বে নিজকে প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রথমতঃ ঐ সকল লাভের জন্য ঐকান্তিকতা চাই। এই সকল ভাব লাভ করিতে না পারিলে আমার চলে না, আমি উহা ছাড়া বাঁচি না, পাপে পড়িয়া আর থাকিতে পারি না, এই ভাব মনে উদিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা ঐ সকল লাভের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা ও প্রার্থনা হইবে না। দিন রাত্রি শাস্ত্র পাঠ, সাধুসঙ্গ, প্রকৃতিচর্চ্চা, আত্মচিন্তা প্রভৃতির দ্বারা মনে যাহাতে ঐ সকল সদ্‌গুণের উদয় হয়, তজ্জন্য সাধন করা চাই। নতুবা প্রার্থনা পূর্ণ হইবে না। তুমি অলসের মত বসিয়া থাকিবে, কোন চেষ্টা করিবে না, আর পরমেশ্বরকে হুকুম করিবে, তিনি তোমাকে সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত করিয়া দিবেন, তাহা হইবে না। মানুষ যখন প্রেম, ভক্তি, পবিত্রতার যথার্থ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া তাহা লাভ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, নানা উপায় অবলম্বন করে এবং নিজের চেষ্টা দ্বারা উহা লাভ করিতে না পারিয়া যখন কাতরভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে, তখনই তিনি সেই প্রার্থনা পূর্ণ করেন। নতুবা ঈশ্বর আমাদের ভৃত্য নন যে, আমরা একটু যত্ন করিব না, তিনি আমাদের সকলই করিয়া দিবেন; আর একটি কথা এই যে ঈশ্বর যখন যে সত্যটি প্রকাশ করিবেন, তাহা ষোল আনা ভাবে পালন করিতে হইবে, সত্যের

মর্য্যাদা পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে হইবে; নতুবা নূতন সত্য তিনি প্রেরণ করিবেন না। ধর্ম্ম খেলার জিনিষ নহে, সত্যকে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান প্রদান করিতে হইবে। জগৎ একদিকে; সত্য একদিকে। জগৎ চূর্ণ হইয়া যাউক, তথাপি সত্যের অবমাননা করিব না, সত্যপালন করিব, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিব তাহা কার্য্যে পরিণত করিব, এই ভাব থাকা আবশ্যক।

প্রার্থনার অনেক দায়িত্ব আছে; যে নিজে অন্যকে দয়া করিতে পারে না, অন্যের অপরাধ ক্ষমা করিতে পারে না, তাহার দয়ার জন্য প্রার্থনা করিবার অধিকার নাই। যাহারা পরমেশ্বরের নিকট অপরাধ ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে, তাহারা কি তাহাদের নিকট যাহারা অপরাধ করে তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া থাকে? তাই যদি মানুষ না পারিল তবে তাহার ক্ষমা-ভিক্ষার অধিকার নাই। এ বিষয়ে বাইবেল গ্রন্থে একটি সুন্দর গল্প আছে। একজন ভৃত্য তাহার প্রভুর নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা ঋণ করিয়াছিল। প্রভু যখন টাকা চাহিলেন তখন সে কাঁদিয়া বলিল, "আমি গরীব কোথা হইতে টাকা দিব?" ইহা শুনিয়া প্রভুর দয়া হইল; তিনি তাহাকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্তি দিলেন। কিন্তু সেই ভৃত্য আর কয়েকটি লোকের নিকট কিছু টাকা পাইত। একদিন প্রভু দেখিলেন যে, ভৃত্য ঐ সকল লোককে তাহার প্রাপ্য টাকার জন্য উৎপীড়ন করিতেছে। তাহারা কাঁদিতেছে, তবুও উহার দয়া হইতেছে না। তখন প্রভুর ক্রোধ উপস্থিত হইল। তিনি ভৃত্যের নিকট যাইয়া বলিলেন, "রে পাষণ্ড! আমি তোকে পাঁচ শত টাকা হইতে অব্যাহতি দিয়াছি, আর তুই সামান্য টাকার জন্য এই নিরীহ লোকদিগকে নির্য্যাতন করিতেছিস্? বুঝিলাম তুই দয়ার অনুপযুক্ত। তোকে আমি ক্ষমা করিব না, তোর সমস্ত টাকা পরিশোধ

করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি তাহার বাড়ী ঘর বিক্রয় করিয়া পাঁচ শত টাকা আদায় করিলেন। এই গল্পটি দ্বারা বেশ উপদেশ পাওয়া যায়।

বাস্তবিক আমরা যদি অন্যকে ক্ষমা করিতে না পারি, তবে কেমন করিয়া আমরা পরমেশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব? প্রার্থনার গুরুতর দায়িত্ব আছে। মানুষ যদি ক্ষমা ভিক্ষা করে, তবে আগে তাহাকে ক্ষমাশীল হইতে হইবে। মানুষ যদি ঈশ্বরের বিশেষ প্রেমলাভ করিতে যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বে তাহাকে প্রেমিক হইতে হইবে। মানুষ যদি রাজাধিরাজ পরমেশ্বরের সহবাস লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তবে পূর্ব্বে তাহাকে সমস্ত অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধারণের সঙ্গে মিশিতে হইবে, নরনারীকে ভাই ভগিনীর মত দেখিতে হইবে। মানুষ যদি ঈশ্বরের কৃপার ভিখারী হয়, তবে তাহাকেও গরীবের প্রতি আন্তরিক দয়া প্রকাশ করিতে হইবে। প্রার্থনার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন। প্রার্থনা খেলার জিনিষ নহে।

আরাধনা।

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের হৃদয়ে আর একটি ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইটি আরাধনা। আরাধনা কতকগুলি সুন্দর সুন্দর বাক্যসমষ্টি নহে, বহু সমাস ও অলঙ্কারযুক্ত পদ বিন্যাসও নহে। প্রার্থনার ন্যায় আরাধনাও সাধকের মনের এক প্রকার অবস্থা। যখন সাধক পরমেশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে থাকেন, যখন তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, দয়া, পবিত্রতা প্রভৃতি উপলব্ধি করিতে থাকেন এবং কৃতজ্ঞতা-

ভরে তাঁহার চরণে প্রণত হন, তখন তিনি কথা বলুন আর না বলুন, বাহ্য কোন ক্রিয়া করুন আর না করুন, তিনি আরাধনা করিতেছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধির সহিত তাঁহার স্তুতি করাকে আরাধনা বলে। এই ভাবটি সাধক সহজে লাভ করিতে পারেন না। অবশ্য প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই আরাধনার ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে বিশ্বাস ও ধারণা না থাকিলে প্রার্থনা করা অসম্ভব। তিনি সত্যস্বরূপ অর্থাৎ তিনি নিত্য বর্ত্তমান; ইহা অন্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অনুভব করিতে না পারিলে কিরূপে ও কাহার নিকট প্রার্থনা করা যাইবে? আবার তিনি জ্ঞানময়, তিনি আমার মনের কথা জানিতে পারেন, এই ধারণা না থাকিলেই বা প্রার্থনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সেইরূপ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা ও শক্তি আছে, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ দয়াময় পুরুষ। এই সকল স্বরূপে অন্ততঃ কিছু কিছু বিশ্বাস ও অনুভূতি না থাকিলে প্রার্থনা করা যায় না। এইরূপ সামান্য বিশ্বাস ও অনুভবের সহিত প্রার্থনা করিতে করিতেই সাধক আরাধনার অবস্থা প্রাপ্ত হন। ধর্ম্ম জীবনের উষাকালে, ধর্ম্মোন্মুখতার প্রারম্ভে মানুষ যখন গভীর মোহ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয়, তখন প্রার্থনার স্রোতই প্রবলবেগে তাহার প্রাণে বহিতে থাকে। কিন্তু ধর্ম্মজীবনে সাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার মনে আরাধনার ফুল বিশেষভাবে প্রস্ফুটিত হয়।

প্রার্থনার যুগে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে অতি সামান্য বিশ্বাস থাকে. সে বিশ্বাস এত ক্ষীণ যে অতি সামান্য প্রলোভনে, সামান্য পরীক্ষাতে তাহা উড়িয়া যাইতে পারে। তখন ঐ সকল স্বরূপ সম্বন্ধে সাধকের মনে পরিষ্কার ধারণাও জন্মে না। কিন্তু সাধক যতই প্রার্থনা করিতে

থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ, প্রকৃতি-চর্চ্চা ও আত্মচিন্তায় মনোনিবেশ করেন, ততই পরমেশ্বরের স্বরূপ সমূহ পরিষ্কার রূপে জানিবার জন্য তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। অনেক সময়ে সাধকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাকুল প্রার্থনা পূর্ণ হইয়া থাকে, তখন তাঁহার মন কৃতজ্ঞতা রসে পরিপ্লুত হইয়া যায় এবং প্রেমভরে তাঁহাকে বারবার ডাকিতে ইচ্ছা হয় এবং তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। অনেক সময়ে আবার অপূর্ণ প্রার্থনা দ্বারা সাধক-হৃদয়ে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয় এবং তাহার জ্ঞানমূলক কোন ভিত্তি আছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে। এই উভয় অবস্থাতেই সত্যনিষ্ঠ সাধকগণ যেমন একদিকে প্রার্থনা করিতে থাকেন, অপরদিকে তেমনি দর্শন, বিজ্ঞান পাঠ, সাধুসঙ্গ, প্রকৃতি-চর্চ্চা ও আত্ম-চিন্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। এই স্থানে সাধকের আর একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিতে করিতে সাধক সংশয়ের গভীরতম প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হন। তখন হয়ত তিনি প্রার্থনাদিও ছাড়িয়া দেন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হইয়া সাংসারিকতায় যাইয়া ডূব দেন। দর্শন বিজ্ঞান পাঠ করিলেই যে ঈশ্বরে অবিশ্বাস জন্মিবে তাহা নহে। তবে যে প্রণালীতে ঈশ্বর-তত্ত্ব নিরূপণ কবিতে যাওয়া উচিত, যে রকম ভাব লইয়া এই সকল গভীর প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত তাহার ব্যতিক্রম করিলে অনেক সময়ে সংশয়ের গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে হয়। এই সময়েও সাধুসঙ্গ অত্যন্ত উপকারী। সাধুদিগের জীবন্ত ধর্ম্মভাব, জ্বলন্ত উৎসাহ, অটল বিশ্বাস, গভীর ধ্যান ধারণা, সর্ব্ব অবস্থাতেই তাঁহাদের স্থৈর্য্য ও প্রসন্নতা দর্শন করিয়া সাধকের হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয়, তাহার মোহ আঁধার ঘুচিয়া যায়, সংশয়ের বাত্যা প্রশমিত হয়।

এই সময়ে সাধক পূর্ব্ব উপার্জ্জিত বিশ্বাসকে দার্শনিক ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান করাইতে চেষ্টা করেন। তিনি দেখেন যে এই অসীম ব্রহ্মাণ্ড অবশ্য কোন জ্ঞানময় চৈতন্য স্বরূপকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে: জ্ঞান ছাড়িয়া জগৎ থাকিতে পারে না; এই দুয়ের মধ্যে আশ্রয়ও আশ্রিত সম্বন্ধ। জ্ঞান ছাড়িয়া মানব জড়ের কল্পনাও করিতে পারে না। অনন্তদেশ ও অনন্ত কালব্যাপী সমস্ত ঘটনার সংযোজক রূপে এক অনন্ত জ্ঞানময় পুরুষ বর্ত্তমান রহিয়াছেন; এই মহান্ পুরুষই সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম। তাঁহাতে কোন প্রকার শোক তাপ, দুঃখ যন্ত্রণা নাই, তাঁহাতে নিয়ত আনন্দ বিরাজ করিতেছে এবং তাঁহার আনন্দ ধারা জগতে প্রবাহিত হইয়া মানব মনে সুখ শান্তির সঞ্চার করিতেছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক সেই জরা-মরণ-রহিত অমৃত-পুরুষের প্রেমসুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছেন, তাই তিনি আনন্দরূপম্ অমৃতম্। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে তিনিই অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া জগতে মঙ্গল ও শান্তি বিধান করিতেছেন; তাঁহাতে কোনরূপ চঞ্চলতা, আবিলতা নাই; তিনিই সমস্ত মঙ্গলের আধার, তাঁহার সমান কেহই নাই তিনিই একমাত্র প্রভু; তাই তিনি শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্। তিনি পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাই তিনি শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্। তাঁহাতে প্রেম ও দয়া পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে, তাই তিনি প্রেমময়, দয়াময়।

সাধক একজন দার্শনিক পণ্ডিত না হইতে পারেন, কিন্তু সাধুসঙ্গ, সৎপ্রসঙ্গ, প্রকৃতি-চর্চ্চা, আত্মচিন্তা দ্বারা অথবা মানব-হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব দ্বারা পরমেশ্বরের এই সকল স্বরূপ বিষয়ে তিনি জ্ঞানলাভ করেন এবং উপাসনার সময়ে ঐ সকল স্বরূপ চিন্তা ও অনুভব করিয়া থাকেন; নিজের জীবনে এবং অপরের জীবনে তাঁহার দয়া ও

প্রেম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন ; এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁহার শক্তি ও জ্ঞান অনুভব করিতে প্রয়াস পান। কিন্তু যদি সাধক প্রকৃত ভাবে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, যদি তিনি ব্রহ্মরূপ দর্শন করিয়া ও স্পষ্টরূপে তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করেন, তবে কেবল নিয়মিত উপাসনার সময়ে তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিলে চলিবে না। দিনের মধ্যে দুই একবার যদি ভগবানের উপাসনা করা যায় আর সমস্ত দিন যদি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকা যায়, তাহা হইলে অস্থিরচিত্ত কখনও শান্ত হইবে না, কখনও ধর্ম্মজীবন লাভ হইবে না। অন্যান্য সময়ে, চলিতে ফিরিতে, পথে ঘাটে সকল অবস্থাতেই তাঁহার নাম স্মরণের সহিত তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতে হইবে, সমস্ত কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। এইরূপ সাধনকে অনেকে অসম্ভব মনে করিতে পারেন, কিন্তু ইহা অসম্ভব নহে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এরূপ সাধনের সম্ভবপরতা প্রদর্শিত হইতেছে। সন্তান-বৎসলা জননী কি সর্ব্বসময়েই সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া থাকেন ? তাহা কখনই হইতে পারে না। তিনি সংসারের সমস্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যই করিতেছেন, অথচ মন সন্তানের দিকে রহিয়াছে ; তিনি কার্য্য করিতেছেন, অথচ কোথাও একটু ক্রন্দন ধ্বনি শুনিলেই ভাবেন, এই বুঝি আমার প্রাণের ধনের কোন অসুখ হইল। তিনি সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই সন্তানকে মনে করিতেছেন। আবার যদি সেই জননীর একমাত্র পুত্রধন তাঁহাকে চিরকালের জন্য কাঁদাইয়া চলিয়া যায়, তবে তিনি কি করেন ? প্রথমে কয়েকদিন উন্মত্তের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকেন, পরে অনেক পরিমাণে শান্ত হন ; তখন তিনি আবার সমস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু তাঁহার মন যেন থাকিয়া থাকিয়া সন্তানের জন্য কাঁদিয়া

উঠে। যে জিনিষ দেখেন তাহাতেই সন্তানকে মনে পড়ে; তাহার খেলানা, তাহার জামা, তাহার কাপড় ইত্যাদি দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে; তাহার সঙ্গিগণ, তাহার খেলিবার স্থান দর্শনে প্রাণে তাহার স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এইরূপে তিনি সংসারের যাবতীয় কার্য্য করেন বটে, কিন্তু সন্তানের স্মৃতিরূপ এক বিষাদময় কালিমার রেখা অঙ্কিত থাকিয়া তাহার মনের উপর নিয়ত কার্য্য করিতে থাকে। সেইরূপ সাধককেও এই ভাবে চলিতে হইবে যেন সমস্ত কার্য্য, সমস্ত ঘটনার মধ্যে প্রাণ-সখাকে মনে পড়ে।

এই অবস্থাপ্রাপ্তির জন্য সাধককে কতকগুলি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ, সৎচিন্তা, সদালোচনা প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সকল সময়েই ঈশ্বরের কোন স্বরূপ মনে রাখিতে হইবে। নামজপ সাধনের অত্যন্ত সহায়। দুঃখের বিষয় এই যে, নাম জপের প্রকৃত অর্থ ভুলিয়া যাইয়া অনেকেই খোসা লইয়া আছেন। অনেকের এরূপ বিশ্বাস যে নামের শব্দগুলিরই যেন এমন শক্তি আছে যে উহা উচ্চারিত হইলেই মনের পাপ দূর হয়। বাস্তবিক এই বিশ্বাস ভ্রমাত্মক; শব্দের কোন পরিত্রাণপ্রদ শক্তি নাই। নাম দ্বারা নামীকে মনে পড়ে, তাই মন পবিত্র হয়। নাম সাধন করিতে বিশেষ একাগ্রতা চাই, তন্ময়তা চাই। বারবার স্পষ্টভাবে কিংবা অস্পষ্টভাবে নাম উচ্চারণ করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের স্বরূপ মনে উপলব্ধি করিতে হইবে। কোন্ নাম কে গ্রহণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই, যাঁহার যে নাম অধিক মিষ্ট লাগে, তিনি সেই নামই গ্রহণ করিতে পারেন। যে কোন শব্দ দ্বারা সত্যস্বরূপ, প্রেম, জ্ঞান ও পবিত্রতার আধার পরম পুরুষকে মনে পড়ে সেই শব্দ অবলম্বন করিয়াই জপ করিতে পারেন। পরমেশ্বর

বিশেষ কোন শব্দ দ্বারা আত্মনামকরণ করেন নাই ; সাধক আপনার সুবিধার জন্য তাঁহার এক একটী নাম দিয়াছেন। সাধক যে নাম ইচ্ছা সাধন করিতে পারেন ; কিন্তু সর্ব্বদাই সেই সত্যস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য থাকা চাই। শুধু নাম উচ্চারণ করিলেই চলিবে না, তৎসঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে হইবে এইত পরমেশ্বর নিকটে রহিয়াছেন, এইত দয়াময় সমস্তের ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছেন, সকল সৌন্দর্য্যের তিনিই মূল সৌন্দর্য্য, সকল প্রেমের তিনিই প্রস্রবণ। ইহাই এক রকম আরাধনা। এই প্রকার করিতে করিতে ভাবযোগ দ্বারা (Laws of association) ঐ নামের সঙ্গে ঐ সকল স্বরূপের এমনই সম্বন্ধ হইয়া যাইবে যে নাম মনে পড়িলেই ঐ সকল স্বরূপও মনে পড়িবে। সাধক যখন অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন, তখন রীতিমত আরাধনা কি প্রার্থনা করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখন তিনি নাম জপ করিতে পারেন। তাহা হইলেই মন পবিত্র থাকিবে, সর্ব্বদাই মন ঐশ্বরিক ভাবে পূর্ণ থাকিবে। কেহ কেহ আপনাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উপযোগী ছোট ছোট প্রার্থনা রচনা করিয়া সর্ব্বদা মনে মনে তাহাই উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা দ্বারাও যথেষ্ট উপকার হইয়া থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত নামসাধন করিতেন। তাঁহার সাধন ছিল প্রতি প্রশ্বাসে আমি, প্রতি নিশ্বাসে তুমি, এইরূপ আমি ও তুমি ভাবিতে ভাবিতে তিনি একবারে বিভোর হইয়া পড়িতেন। এই সকল উপায় অবলম্বনে একটি বিশেষ লাভ আছে। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা সর্ব্বদা অনুভব করা যায়। তিনি যে বিশ্বতশ্চক্ষু এই ভাবটি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় ; এবং তাঁহার ব্যক্তিত্ব (Personality) বিশেষ ভাবে মনের ভিতরে গ্রথিত হয়।

সাধক এইরূপ সাধন করিতে করিতে আর এক প্রকার অবস্থায়

উপনীত হন। তিনি দেখেন যে এই সকল স্বরূপ ত আমি চিন্তা করিয়া স্থির করিয়াছি ; এই সকল ত আমার কল্পনা-প্রসূত। আমি সামান্য বুদ্ধি দ্বারা জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া নিজের মনোমত এক দেবতা গড়াইয়া লইয়াছি। বাস্তবিক পরমেশ্বরের স্বরূপ এরূপ কি না কেমন করিয়া বুঝিব ? প্রকৃতির যবনিকা ত উত্তোলিত হইল না। এইরূপ পূজায় এক প্রকার আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তাহা যে প্রকৃত আনন্দ তাহার প্রমাণ কি ? তিনি ত প্রকাশিত হইলেন না ! তাঁহাকে ত দেখিলাম না ! তাঁহার স্বরূপ প্রত্যক্ষ হইল কোথায় ? এই সংশয়েতে দোলায়মান হইয়া অনেকে হয় ত ধর্ম্মসাধন পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় যে সাধকের মনে হয় যে আমার চেষ্টায় ত পরমেশ্বরকে প্রকাশিত করিতে পারিব না, তিনি যে স্বপ্রকাশ, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ, ঈশ্বর লাভ সম্ভবপর হয়। তিনি তখন বুঝিতে পারেন যে মানুষ সাধ্যমত চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার দর্শন পাওয়া তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করে। মানুষ তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকিবে, অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইবে। তৎপরে তিনি যখন উচিত মনে করিবেন, তখনই দেখা দিবেন। মানুষের সাধনার এমন শক্তি হইতে পারে না যে নিজ সামর্থ্যে সে তাঁহাকে প্রকাশিত করিবে ; মানুষ যাহা করে তাহা অতি সামান্য। সুতরাং তাঁহার দয়ার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। তাঁহার দর্শন পাইবার উপযুক্ত অবস্থা আসিলেই তিনি দর্শন দিবেন। এই অবস্থাতেই সাধক বলিবেন :—

"তুমি যখন দেখাও তোমাকে মানুষ তখনই দেখিতে পায় ;
তুচ্ছ জ্ঞান প্রেমের অভিমানে, তোমায় কি দেখিতে পায় ?
সূর্য্যকে দেখিতে হলে, কেউ কি কভু প্রদীপ জ্বালে ?
সেইরূপ তুমি প্রকাশিত হ'লে, আত্মজ্ঞান জ্যোতি হারায়।"

তিনি তখন প্রার্থনা করেন "প্রভু তুমি আছ এই জানি, কিন্তু তুমি কিরূপ তাহা জানি না। আমার শক্তিতে কুলাইল না। তোমার চরণে পড়িয়া রহিলাম। তোমার প্রকৃত স্বরূপ আমাকে দেখাইয়া কৃতার্থ কর।" এইরূপে যখন সাধক একান্ত মনে তাঁহার চরণে পড়িয়া থাকেন, তখন তিনি তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হন। মহম্মদ জগতের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে না পারিয়া এই ভাবেই যখন হর পর্ব্বতের উপর পড়িয়াছিলেন তখনই ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন; তখন তিনি নব জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত দেখিতে লাগিলেন; এক অভিনব আনন্দ প্রবাহে যেন জগৎ মাতিয়া উঠিল। মহম্মদ যেন কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করিলেন। বাস্তবিক অকিঞ্চন হইয়া একান্ত চিত্তে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি সাধকের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করেন।

আরাধনা দুই প্রকার (১) উচ্চ অঙ্গের ও (২) নিম্ন অঙ্গের। (১) যখন সাধক ঈশ্বরের স্বরূপ গুলি হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ্যে তাহা বর্ণনা করেন, তখন তাঁহার সেই আরাধনা উচ্চ অঙ্গের আরাধনা। (২) আবার অনেকে অত উচ্চ স্তরের সাধক হইতে পারেন নাই। তাঁহারা জ্ঞান দ্বারা যে সব স্বরূপ জানিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতে করিতে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রকার আরাধনা নিম্ন অঙ্গের হইলেও ইহাতেও আরাধনার আরম্ভ হয়। উভয় আরাধনাতেই মনঃ-সংযমের প্রয়োজন। সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ প্রভৃতি ঈশ্বরের যে সকল স্বরূপ তাহা উপলব্ধি ও বর্ণনা করিতে যাইয়া এক একজন এক এক স্বরূপ আগে পরে বর্ণনা করেন। কেহ আনন্দস্বরূপ, কেঁহ অদ্বৈতস্বরূপ, কেহ শুদ্ধস্বরূপ দিয়া আরাধনা শেষ করেন। কে কোন স্বরূপ আগে কিংবা শেষে বলিবে ইহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডা করা উচিত নয়। যে

যে-স্বরূপ আগে কিংবা পশ্চাতে বলুক তাহাতেই হয়। আসল কথা সাধক একাগ্রচিত্তে স্বরূপ উপলব্ধি করিলেন কি না। কোন্ স্বরূপ শেষে বলিবে তাহা লইয়া মতান্তর ও মনান্তর হওয়া সঙ্গত নহে।

ধ্যান ও সমাধি।

আরাধনাই ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি ভূমি। সাধক যখন বাস্তবিকই ঈশ্বরের স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যাকুল হন, প্রাণেশ্বরকে প্রাণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহার চরণে হৃদয়ের প্রেম ভক্তি অর্পণ করিতে প্রস্তুত হন, স্পষ্টরূপে তাঁহার বাণী শুনিয়া তাঁহারই আদেশে জগতের কার্য্য করিতে উৎসুক হন, তখন ভগবান্ তাঁহার সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ব্যাকুল ভাব, এই নির্ভরের অবস্থা অলসতা নহে। অবশ্য এই অবস্থায় সাধকের মনে এই ভাবের প্রাবল্য দেখা যায় যে তিনি ব্যতীত কেহই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি করুণা করিয়া যখন মানবের হৃদয়ে প্রকাশিত হন, তখন সে কৃতার্থ হয়। নতুবা মানুষের এমন শক্তি নাই যে তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সাধক সাধন ভজন পরিত্যাগ করেন না; বরং আরও ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন। ভগবান্ যতই আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন, ততই তাঁহার স্মরণ সাধকের মিষ্ট বোধ হইতে থাকে; ততই মনে হয় "যত জানি তত জানিনে," এবং আরও অধিক জানিবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে। সাধক এই অবস্থায় অধিক সময়ে ঈশ্বর চিন্তায় একেবারে মগ্ন হইয়া থাকেন। ইহাই ধ্যানের আরম্ভ। ধ্যান চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া থাকা নয়,

কিংবা কোন কাল্পনিক মূর্ত্তি চিন্তা করা নয়। সাধক যখন সংযত হইয়া, বাহ্য বস্তু হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করিয়া একাগ্রমনে ঈশ্বরের স্বরূপ চিন্তা করিতে থাকেন এবং তাঁহাকে প্রাণেশ্বর রূপে হৃদয়ে প্রকাশিত দেখিয়া মোহিত হইতে থাকেন তখনই ধ্যানের প্রকৃত অবস্থা বলিতে হইবে। বাস্তবিক ধ্যানের ভাব ব্রহ্ম দর্শনের পূর্ব্বে পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় না। ব্যাকুল সাধকের নিকট কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর সময়ে সময়ে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলেও তাহা স্থায়ী হয় না। ভগবান্ ক্ষণকালের জন্য প্রকাশিত হইয়া আবার অন্তর্হিত হন। যাহাতে সাধক তাঁহার সেই অনুপম রূপ সন্দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া যান, এবং তাঁহাকে পাইবার জন্য আরও ব্যাকুল হন, তজ্জন্য ভগবান্ তাঁহাকে সময়ে সময়ে দর্শন দিয়া প্রফুল্ল করেন। কথিত আছে গয়ায় চৈতন্য দেবের মনে প্রথমে ধর্ম্ম ভাবের সঞ্চার হয় এবং গৃহে প্রত্যাগমন কালে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরাবির্ভাব হয়। কিন্তু তাহা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইল না। পরমেশ্বর তাঁহাকে সৌদামিনীর ন্যায় দর্শন দিয়াই আবার লুকাইলেন। চৈতন্যের তখনকার অবস্থার যাদৃশী বর্ণনা আছে তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। আবার মহম্মদ যখন ঈশ্বর বিরহে একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি হরা পর্ব্বতে পড়িয়া রহিলেন, তখন পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইলেন, জগৎ তাহার নিকট নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল, চারিদিকে যেন আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই অবস্থা দীর্ঘ কাল স্থায়ী হইল না। ভগবান্ প্রেম ভিখারী মহম্মদকে পাগল করিয়া আবার লুক্কায়িত হইলেন। যাঁহার জন্য তিনি ব্যাকুল, ক্ষণকালের জন্য যাঁহার দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, তিনি দেখা দিয়া আবার লুক্কায়িত হইলেন; কিরূপে

তাঁহাকে পুনরায় দেখা যায়, কিরূপে সেই অপরূপ রূপ আবার প্রত্যক্ষ করা যায় তজ্জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন।

"ও রূপ যে দেখেছে সে মজেছে জন্মের তরে।" ঐ সত্য সুন্দর-রূপে এমনই সৌন্দর্য্য আছে, এমনই মাধুর্য্য আছে যে, সাধকের প্রাণ মন একেবারে বিমোহিত হইয়া যায়; তাঁহার আর অন্য চিন্তা থাকে না; দিন রাত্রি কেবল সেই ভাবনা, সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। আর থাকিয়া থাকিয়া মনে হয়, "আমারে ব্যাকুল ক'রে যে জন পালায়, কোথায় গেলে পাব তায়।" জগতের প্রত্যেক ঘটনা প্রত্যেক পদার্থ তখন প্রাণসখার ভাব জাগাইয়া দেয়। এই সময়েই প্রকৃত ধ্যান আরম্ভ হয়। তখন "ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দ রসপান" এই ভাব সাধকের উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে ধর্ম্মসাধন কঠোর থাকে; সংসারের সুখ তখনও মধুময় বোধ হয়: সংসারের সুখ, আশা, ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য, বিষয়ের প্রলোভন পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের পথে চলিতে যেন মনে তেমন আগ্রহ হয় না; কিন্তু ধর্ম্ম পথে যাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবনে আর সে ভাব দেখা যায় না। যাঁহারা অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভগবানের সহবাস সুখ পাইয়াছেন, তাঁহারাও আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন না। জগতে প্রত্যেক বৃক্ষ, লতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, আকাশের চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, অগ্নি, বায়ু তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করে; সকলেই যেন তাঁহার অপরূপ রূপ প্রকাশিত করে। সংসারে এমন প্রলোভন নাই, যাহা সেই পরম পুরুষের প্রলোভন হইতে অধিকতর মনোমুগ্ধকারী। সংসার তখন শত চেষ্টা করিয়াও সাধকের মন ফিরাইতে পারে না। তাঁহার আর কিছুই তখন ভাল লাগে না। চক্ষের উপর যেন কি এক রূপ ভাসিতে থাকে, কর্ণের নিকট যেন কি

এক মধুর সঙ্গীত গীত হইতে থাকে! সে রূপে জগৎ আলোকিত, সে সঙ্গীত ধ্বনিতে জগৎ বিমোহিত। এইভাবে ব্যাকুল সাধক সেই রূপ পুনর্দর্শনের জন্য একান্ত লালায়িত হন। চিরদিন তাঁহাকে অন্তরে বাহিরে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হন। তখন সাধক ব্যাকুল অন্তরে গাহিতে থাকেন, "বল দেখিরে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা।" এই অবস্থায় সাধক ভগবানের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে অনেক সময়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়েন। বাহিরের কোন জ্ঞান থাকে না, মনে কেবল সেই সত্যং শিবং সুন্দরম্। ইহাই ধ্যানের পূর্ণাবস্থা, অথবা ইহাকেই এক কথায় সমাধি বলা যাইতে পারে। ধ্যান যখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যখন পরমেশ্বরের স্বরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রেমামৃতে সাধকের প্রাণ একেবারে পরিপ্লুত হইয়া যায়, সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, তখনই সমাধির অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থাতেই ভগবান্ স্থায়ীরূপে সাধকের প্রাণে দেখা দেন। সাধক তখন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দ নীরে ভাসিতে থাকেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি যেন এক দিব্য জ্যোতি পরিপূর্ণ নূতন রাজ্যে উপস্থিত হন, সে রাজ্য, সে দেশ বর্ণনা করিতে যাইয়া বেদ, বেদান্ত পরাস্ত হইয়াছে, বাইবেল, কোরাণ অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছে। উপনিষৎ সেই দেশের বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ঃ—

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।"

"সেখানে সূর্য্য দীপ্তি পায় না, চন্দ্র তারকা প্রভা দিতে পারে না; বিদ্যুৎ সেখানে কিরণ দিতে পারে'না, অগ্নির ত কথাই নাই; সেই

জ্যোতির্ম্ময়কে সকলেই অনুকরণ করে এবং তাঁহার কিরণে সকলেই প্রভাশালী।"

মিসেস্ হিমেন্স্ সেই দেশের বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন ;—

"Eye hath not seen it my gentle boy !
Ear hath not heard its deep songs of joy.
Dreams cannot picture a world so fair,—
Sorrow and death may not enter there.
Time doth not breathe on its fadeless bloom,
Far beyond the clouds and beyond the tomb,
It is there, it is there my child."

সেই স্বর্গরাজ্য কোথায় ? "হে সৌম্য, চক্ষু সে স্থান কখন দর্শন করে নাই, কর্ণ সেখানকার গভীর আনন্দসঙ্গীত শ্রবণ করে নাই স্বপ্নও এমন মনোহর স্থান কল্পনায় চিত্রিত করিতে পারে না। দুঃ কিংবা মৃত্যু সে স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না। তথাকার পুষ্প কখন মলিন হয় না এবং তাহার উপর সময় আধিপত্য করিতে পারে না; আকাশের অতীত, মৃত্যুর পরপারে সেই যে স্থান তাহাই স্বর্গ।"

বাস্তবিক সেই ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা কেহই বর্ণনা করিতে পারে না। ব্রহ্মদর্শন কি, তাহা যাঁহারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই বলিতে পারেন, অন্যের বলিবার অধিকার নাই। যাঁহারা সেই অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও ভাষায় তাহা সম্যক্ প্রকাশ করিতে পারেন না। মানুষ সাধন করিতে করিতে যখন সেই অবস্থায় উপস্থিত হয় তখনই বুঝিতে পারে। ব্রহ্মবাণী সম্বন্ধেও ঐ রূপ বলিতে হইবে। ব্রহ্ম-দর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ সম্বন্ধে সাধারণতঃ অনেক প্রকার সংস্কার জন-

সমাজে প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন যে ব্রহ্মদর্শন চর্ম্মচক্ষুতে কোন মূর্ত্তি দর্শন এবং ব্রহ্মবাণী শ্রবণ কর্ণে কোন শব্দ শ্রবণ। অনেক সময়ে মানুষ কাল্পনিক মূর্ত্তি দর্শন করে ও কাল্পনিক বাণী শ্রবণ করে এবং তাহাদিগকেই ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ বলিয়া স্থির করে। মানুষের কল্পনা-শক্তি ও একাগ্রতার পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে মনের ভাবগুলি মূর্ত্তিমান্ হইয়া যেন চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। যাঁহারা থিওসফি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও এ কথা স্বীকার করেন। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে চাক্ষুষ ভ্রম (optical illusion) বলিয়া থাকেন ; অনেকে ঐ সকলকে প্রকৃত ব্রহ্মমূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম করেন এবং অনেক সময়ে ঐ ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মের বিশুদ্ধ মত হইতে চ্যুত হইয়া কুসংস্কারে পতিত হন। সেইরূপ অনেক সময়ে আবার মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা, কল্পনা-শক্তি ও একাগ্রতা-প্রসূত স্বীয় অন্তরোত্থিত ইচ্ছা যেন প্রত্যক্ষ বাণীর ন্যায় প্রতীয়মান্ হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ কথাটি বুঝিতে পারা যাইবে। কোন প্রিয়তম বন্ধু নির্দ্দিষ্ট সময়ে দূর দেশ হইতে আগমন করিবেন ; অনেক দিনের পর দেখা হইবে, প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছে। যতই সেই সময় নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই নিবিষ্ট-মনে বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। বন্ধুর বিষয় কতই কল্পনা করিতে লাগিলাম ; প্রত্যেক শব্দে তাঁহার পদশব্দ কল্পনা করিতে লাগিলাম ; প্রত্যেক কথায় যেন তাঁহারই কথা শুনিতে লাগিলাম। যখন নির্দ্দিষ্ট সময় আসিল তখন এত তন্ময় হইলাম যে বাস্তবিকই যেন তাহার কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। এইরূপ বাণী শ্রবণ কল্পনার ফল, অথচ এইরূপ বাণী অনেকেই শ্রবণ করিয়া থাকেন। সেইরূপ আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছাও মধ্যে মধ্যে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মবাণী বলিয়া ভ্রম হয়। সেই শব্দকে ব্রহ্মবাণী জ্ঞান করিয়া চলিলে অনেক বিপদে পতিত হইবার

সম্ভাবনা। সাধককে এই সকল বিপদ হইতে মুক্ত হইবার জন্য বিহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

অনেকে কাল্পনিক মূর্ত্তি দর্শন ও কাল্পনিক বাণী শ্রবণ করেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদেরও ব্রহ্মদর্শন ও বাণী শ্রবণ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তি রহিয়াছে। তাঁহারা মনে করেন ব্রহ্মদর্শন বেশী কিছু নয়; বিচার দ্বারা সর্ব্বভূতে তাঁহার অবস্থিতি নির্ণয় করিয়া প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। ইহার অতিরিক্ত ব্রহ্মদর্শন বলিয়া আর কিছু নাই। কেহ কেহ বা মনে করেন যে সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতির সময়ে মনে যে এক প্রকার আনন্দ হয় উহাই ব্রহ্মদর্শন। এই সকল মত সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে ব্রহ্মদর্শন যদি কেবল বিচারপ্রসূত ঈশ্বরের সর্ব্বভূতে স্থিতি জ্ঞানই হইত অথবা সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন প্রসূত সাময়িক আনন্দই হইত তবে মানুষ আবার পাপের প্রলোভনে পড়িত না। ইহাতে প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না কেন? দর্শন বিজ্ঞান পড়িয়া, যুক্তি তর্ক দ্বারা ত যথেষ্ট জ্ঞান হইল, কিন্তু কোথায়, প্রাণে ত শান্তি মিলিল না? পাপের প্রলোভন হইতে দর্শনের ঈশ্বর ত রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার দেখা যায় যে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে খুব আনন্দ হইল, যথেষ্ট মত্ততা জন্মিল; কিন্তু সে আনন্দ, সে মত্ততায় ত প্রাণের সংশয় ঘুচিল না; আবার যে পাপে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকিল। একবার প্রকৃত ব্রহ্মদর্শন লাভ হইলে কি পাপের প্রলোভন কাহাকেও ভুলাইতে পারে? অবশ্য জগতের সর্ব্বভূতে ব্রহ্মের স্থিতি চিন্তা, সর্ব্বকার্য্যেই তাঁহার বর্ত্তমানতা অনুভব, সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তনে মনে আনন্দানুভব, এই সমস্তই সাধনের অনুকূল ও ব্রহ্মদর্শনের সহায়। কিন্তু উহাই ব্রহ্মদর্শন; ইহা বলিয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন, তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মলাভ হওয়া কঠিন। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা হইলেও মন প্রাণ একেবারে পরিবর্ত্তিত

হইয়া যায়; মনে আর সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট তর্ক যুক্তি একেবারে হার মানিয়া যায়। ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধকগণ একবাক্যে এ কথার সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্মদর্শনের যে কি ভাব, কেহ তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে পারে না।

ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে যেমন মানুষের ভ্রান্তসংস্কার আছে, ব্রহ্মবাণী সম্বন্ধেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রকারে আমরা ব্রহ্মের আদেশ জানিতে পারি। যখন শারীরিক ও নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া, নানা প্রকার যন্ত্রণায় পতিত হই, তখন বুঝিতে পারি যে ঐ সকল নিয়ম অতিক্রম করা ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ। আমার বুদ্ধিবৃত্তি পরমেশ্বরই দিয়াছেন। তাহার পরিচালনা দ্বারাও পরমেশ্বরের আদেশে কতক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। আমাদের প্রাণের ভিতরে যে সকল স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহাও পরমেশ্বরের আদেশ কতক পরিমাণে আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া থাকে। আবার ভগবান্ নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে সময়ে সময়ে আমাদিগকে পাতিত করেন, তাহার মধ্য দিয়াও আমাদের জীবনে ভগবানের কি ইচ্ছা তাহা প্রকাশিত হয়। তদুপরি আমাদের বিবেক (Conscience) রহিয়াছে; কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ, কোন্‌টি ঈশ্বরের অভিপ্রেত, কোন্‌টি অনভিপ্রেত, মার্জ্জিত বিবেক তাহা অনেক পরিমাণে দেখাইয়া দেয়। এই অর্থে এই সকলই ব্রহ্মবাণী বলিতে হইবে। ভগবান্ অসংখ্য উপায়ে মানবের মনে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই সকল উপায় দ্বারা কি সকল সময়ে নিশ্চিতরূপে তাঁহার ইচ্ছা মানুষ জানিতে পারে? তাহা যদি পারিত, তবে জগতে এত মতদ্বৈধতা দৃষ্ট হইত না। ইহা সত্য যে এই সকল উপায় ব্যতীত ধর্ম্মোন্মুখ সাধকের ভগবানের ইচ্ছা জানিবার আর কোন উপায় নাই; তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না

যে ইহাই ব্রহ্মবাণীর পরাকাষ্ঠা। সাধক যখন ব্রহ্মযোগে সমাধিস্থ হন, তখন পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া সুমধুর বাণী শ্রবণ করাইয়া থাকেন। এই বাণী এত স্পষ্ট যে তাহাতে সাধকের সর্ব্ব সংশয় ঘুচিয়া যায়। ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিলে হৃদয় মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, 'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।'

বাস্তবিক যখন ব্রহ্মদর্শন হয় ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করা যায়, তখন তাহার প্রমাণের জন্য অন্যত্র যাইতে হয় না; প্রাণই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে। আধ্যাত্মিক জগতে যাঁহারা উন্নত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়াছেন। এই অবস্থায় উপস্থিত হইলে প্রাণে যে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার আর তুলনা হয় না।

> "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥" গীতা।

"যাহা পাইয়া অপর লাভকে তাঁহার অপেক্ষা অধিক মনে হয় না এবং যে অবস্থায় আসিয়া মহাদুঃখেও অভিভূত হইতে হয় না, তাহাই যোগের অবস্থা, তাহাই ব্রহ্মদর্শনের অবস্থা।"

প্রকৃত ভক্তি ও প্রকৃত প্রেম লাভ হইলে এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রেমের তরঙ্গে, সে প্রেমের উচ্ছ্বাসে জগৎ প্লাবিত হয়। এই ভাব প্রাণে পাইয়াই বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ জগৎ জয় করিয়াছেন; তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া যাহা বলিয়াছেন লোক মন্ত্র-মুগ্ধ হইয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। অনেক সময়ে আবার দেখা যায় যে, সাধক ক্রমে ক্রমে শান্তভাব ধারণ করেন। যখন তাঁহার উপর নির্ভর স্থায়ীভাব ধারণ করে, তখনও তাঁহার বিরহে প্রাণ আকুল হয় বটে কিন্তু ততটা

উন্মত্তের ভাব থাকে না। প্রেমের প্রথমে উচ্ছ্বাস থাকে, ক্রমে উচ্ছ্বাস প্রশমিত হইয়া স্থায়ী নির্ভরের ভাব, প্রকৃত মহাভাবের অবস্থা ধারণ করে। তখন সাধক বলেন, "তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আমার তাহাতেই সম্পূর্ণ কল্যাণ"। দিন নাই, রাত্রি নাই, "শিবং শিবং হি কেবলং শিবং শিবং হি কেবলম্", এই ভাব সাধক প্রাপ্ত হন।

সমবেত উপাসনা।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা সাধারণতঃ ব্যক্তিগত উপাসনাতেই খাটে। ঈশ্বর ও আমি; তুমি আর আমি মাঝে কেহ নাই—তিনি আমার ভিতরে, আমি তাঁহার ভিতরে। তিনি আমার পিতা, মাতা, সখা, সুহৃদ্, গুরু, হৃদয়স্বামী। তাঁহার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ। সুতরাং একান্তে নির্জ্জনে আমি তাঁহার আরাধনা করিব, ধ্যান করিব, তাঁহার চরণে প্রাণের বেদনা জানাব, প্রার্থনা করিব। কিন্তু দশজনে সমবেত হইয়াও তাঁহার চরণে বসিব; এক সঙ্গে, এক প্রাণে তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিব, তাঁহার চরণে সকলের আকুল প্রার্থনা জানাব। এই জন্যই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ১৮২৮ সালের ২০শে আগষ্ট (৬ই ভাদ্র) কমললোচন বসুর ভাড়াটে বাড়ীতে সামাজিক উপাসনা প্রথম আরম্ভ করেন। এবং এই উপাসনার সুবিধার জন্য ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে দশজনে তাঁর নামে সমবেত হয়, সেখানে তিনি আবির্ভূত হন।৮ গীতাতে আছে—

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

যাঁহাদের চিত্ত আমাতে অর্পিত, যাঁহাদের প্রাণ আমার চরণে পড়িয়া আছে, তাঁহারা সমবেত হইয়া পরস্পরকে আমার মহিমা বুঝাইয়া দেন, সর্ব্বদা তাঁহারা আমার কথা বলিয়া হর্ষ ও আনন্দ লাভ করেন। এই যে নিত্যযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহারা আমাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে তাহাদিগকে এমন বুদ্ধি যোগ আমি প্রদান করি, যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়।

সমবেত উপাসনা দুই প্রকার। (১) কোনও স্থানে সর্ব্বসাধারণ সকল সম্প্রদায়ের লোক একত্র হইয়া যে পরমেশ্বরের অর্চ্চনা করে; (২) গৃহে পরিবারে সকলে মিলিয়া যে উপাসনা অথবা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জন্মদিন, নামকরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে যে উপাসনা হয়।

(১) সামাজিক উপাসনা।

সকলে কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত হইয়া যে উপাসনা হয়, তাহাকে সামাজিক উপাসনা বলে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্ম মন্দিরের যে ট্রাষ্ট ডিড্ করেন, তাহাতে বর্ণিত আছে, যে কোন সম্প্রদায়ের, যে কোনও ধর্ম্মাবলম্বী লোক ভক্তি ভাবে, শান্তির সহিত উপাসনাতে যোগ দিতে চান, তিনিই এই উপাসনাতে আসিতে পারেন। জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, নারী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই ব্রহ্মোপাসনার জন্য ব্রহ্ম মন্দিরে উপস্থিত হইবার অধিকারী। কিন্তু কেহ গোলমাল করিয়া বা অসভ্য আচরণ দ্বারা উপাসনার ব্যাঘাত

জন্মাইতে পারিবেন না। এই সমাজে উপাসনার মুখপাত্ররূপে অবশ্য একজন আচার্য্য থাকিবেন। তিনি সচ্চরিত্র, জ্ঞানী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন। সমবেত উপাসনাতে যে কেবল আচার্য্যেরই দায়িত্ব তাহা নহে, উপাসকমণ্ডলীরও দায়িত্ব আছে। আচার্য্যের জ্ঞান, ভাব, ভক্তি যেমন উপাসকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করিবে, সেইরূপ উপাসকমণ্ডলীর ব্যাকুলতা, ভাব, ভক্তি পরস্পরকে ও আচার্য্যকে অনুপ্রাণিত করিবে। আমাদের অনেকেই বাল্যকালে ব্যক্তিগত ভাবে উপাসনা করিতে জানিতাম না। ব্রহ্ম মন্দিরে সমবেত উপাসনাতে আসিয়াই উপাসনার মিষ্টত্ব অনুভব করিয়াছি ও পরে একাকী ব্যক্তিগত ভাবে উপাসনা করিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছি। আমরা পরস্পরকে আপনার লোক বলিয়া চিনিব কিরূপে? সত্য বটে, সামাজিক সম্মিলনে, সভাতে, অনুষ্ঠানে, উৎসবে আমরা মিলিত হই, পরস্পরকে দেখি, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত পরিচয় হয় না। যখন ঈশ্বরের চরণে একত্রে বসিয়া তাঁহারই অর্চ্চনা করি, তখনই আমরা পরস্পরকে চিনিতে পারি ও আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। প্রিয়কার্য্য সাধন আমাদের উপাসনার একটি অঙ্গ। আমরা যদি উপাসনাস্থানে না যাই, তবে কি কার্য্যের সূত্রপাত হয়, কোন্ দুর্ভিক্ষ জলপ্লাবন, মহামারীতে সাহায্য করার প্রস্তাব হয়, তাহা বুঝিব কিরূপে, তৎপক্ষে অনুপ্রাণনা পাইব কি প্রকারে? আমাদের লোক আছে, অর্থও আছে, অনেকের সেবা করিবার ইচ্ছাও আছে; কিন্তু তাহা কার্য্যে লাগান যায় না কেন? কারণ ঈশ্বরসম্মুখে আমরা সমবেত হই না। অনেকেই মন্দিরে উপাসনাতে যান না। কেবল সভা ও কমিটি করিলে সমাজের কাজ করা হয় না। সকলে সমবেত হইয়া উপাসনা করা চাই।

এই যে মণ্ডলীর উপাসনা, এখানে যাঁহারা উপস্থিত কেবল কি

তাঁহাদেরই সঙ্গে আমরা যোগ অনুভব করি? যাঁহারা পরলোকে গিয়াছেন, যাঁহারা দূরে রহিয়াছেন তাঁহাদের সঙ্গেও ঈশ্বরের চরণে বসিয়া আমরা নৈকট্য অনুভব করি। কেবল তাহা নহে, যাঁহারা আমাদের ধর্ম্মাবলম্বী নহেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ঈশ্বরের চরণে পাই। আমাদের ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, আমাদের উপাসক মণ্ডলীও বিশ্বজনীন।

(২) পারিবারিক উপাসনা।

পারিবারিক উপাসনা দুই প্রকার। (ক) পরিবারের সকলে সমবেত ভাবে ঈশ্বরচরণে বসিয়া উপাসনা করা। প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে ও ঈশ্বরচরণে বসিতেই হইবে। তদ্ব্যতীত পরিবারের সকলে একত্রে বসিতে হইবে। অনেক বালক বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উপাসনার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, স্বামী স্ত্রীতে একত্রে উপাসনা করিতে হইবে। (খ) এতদ্ব্যতীত প্রতি শুভ কর্ম্মে, জন্মে, জন্মদিনে, বিবাহে, নামকরণে, শ্রাদ্ধে, বিদ্যারম্ভে, অর্থোপার্জ্জনে, প্রতি ঘটনায় তাঁহার চরণে বসিতে হইবে। আমাদের প্রতি কর্ম্ম তাঁহারই আশীর্ব্বাদ লইয়া। সুতরাং প্রতি কর্ম্মেই তাঁহার চরণে বসিতে হইবে।

সাধু প্রকাশচন্দ্র রায়, শুনিয়াছি, প্রতি মাসের বেতন পাইয়া প্রথমে ভগবচ্চরণে রাখিতেন। তারপর তাঁহারই দান বলিয়া খরচ করিতেন। আমাদের এইরূপ করিতে হইবে। প্রতি কর্ম্ম প্রতি বাক্য, প্রতি চিন্তা ঈশ্বরাণুপ্রাণিত হইবে। নতুবা আমাদের ঠিক ব্রাহ্ম হওয়া হইল না।

সেবা ধর্ম্ম।

সংসার ও ধর্ম্ম।

ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রিয়কার্য্য বোধে নর সেবাই প্রকৃত উপাসনা। ঈশ্বরে প্রীতি কি তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। উদ্বোধন, প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান ও সমাধি এই সকলই প্রীতির অবস্থা। এই সকলের ভিতর দিয়া পরমেশ্বরের সঙ্গে যোগ লাভ করিতে হয়। কিন্তু এই সকলই উপাসনার সমস্ত দিক্ নহে—ইহাই পূর্ণ উপাসনা নহে। যাঁহারা প্রকৃত উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হন, তাঁহাদিগকে যেমন একদিকে সাধন করিতে হইবে, তাঁহার আরাধনা, প্রার্থনাদি করিতে হইবে, অপর দিকে তাঁহার প্রিয়কার্য্যও সাধন করিতে হইবে, তাঁহার সন্তানগণের সেবা করিতে হইবে।

অনেকের বিশ্বাস এই যে ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে কিংবা পর্ব্বত গহ্বরে যাইয়া বাস করিতে হয়; সেখানে একাকী ধ্যানস্থ হইয়া ভগবানের চিন্তা করিতে হয়; সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম হয় না। এক ভাবে তাঁহাদের কথা কতক পরিমাণে যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। সংসার এত প্রলোভনে পূর্ণ, সংসারে এত পাপ, অত্যাচার রাজত্ব করিতেছে যে, তাহা দেখিয়া মানবের সহজেই মনে হইতে পারে যে সংসার ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল স্থান নয়। হায়, হায়! সংসার এতই প্রলোভনময়, এমনই বিপদ-সঙ্কুল যে শত শত উৎসাহী যুবক যাঁহারা এক সময়ে ধর্ম্মের জন্য

নানাপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন এবং বহু নির্য্যাতন অম্লান-বদনে মস্তকে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার সংসারে প্রবেশ করিয়া স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা এবং অপ্রেমে ডুবিয়া গিয়াছেন। সংসারে এরূপ ঘটনা নিয়তই সংঘটিত হইতেছে; তাহা দেখিয়া সংসারকে ধর্ম্ম সাধনের প্রতিকূল বলিয়া লোকের মনে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, যে ভয়েতে সংসার পরিত্যাগ করা যায়, সে ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া সহজ নহে। পাপ ত মনেই থাকে, তুমি বনেই যাও, আর গিরিগুহাতেই যাও, মন তোমার সঙ্গে রহিয়াছে এবং তৎসঙ্গে পাপচিন্তাও রহিয়াছে। বনে গেলেই ত আর পাপচিন্তা হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এরূপও দেখা গিয়াছে যে পর্ব্বতগুহাবাসী কত উদাসীন সন্ন্যাসীও কত রকম গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। তবে জঙ্গলে যাওয়াতে লাভ কি? বিশেষতঃ দেখিতে হইবে, ইহাতে ভগবানের কিরূপ ইচ্ছা? এই সংসার ভগবানের বিচিত্র লীলা ক্ষেত্র; ইহা তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং শিক্ষার জন্য মানবকে এখানে তিনিই প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষ সংসারে আসিয়া তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। সংসারে মানবমণ্ডলী নানাপ্রকার অবস্থার মধ্যে পড়িয়া, নানাপ্রকার প্রলোভনের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া এবং নানাপ্রকার সদ্বৃত্তির পরিচালনা দ্বারা শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। মানবকে তিনি কতক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, সদসৎ বুঝিবার শক্তি দিয়াছেন; এখানে সে যেরূপ ভাবে চলিবে তদনুসারেই সে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবে। এই সংসার তাঁহারই লীলা ক্ষেত্র। জগতের জীবজন্তু তাঁহারই সৃষ্ট, সমস্ত মানবমণ্ডলী তাঁহারই পরিবার; তিনিই সকলকে বিশেষ

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন এবং সকলকেই তিনি রক্ষা করিতেছেন। মানুষ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একাকী ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিবে, ইহাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে সংসারের অন্যরূপ বন্দোবস্ত হইত। এখানে দেখা যায় পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিতেছে, কেবল তাহা নহে, পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। বলিতে কি, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব জীবন প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেছে। পরস্পরকে পৃথক করিয়া রাখ মানব-সমাজ জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইবে। পরমেশ্বর মানব-হৃদয়ে প্রেম, দয়া, সহানুভূতি এবং অপরদিকে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন তাহা সমাজে বাস করিবারই উপযোগী। এই সকল বৃত্তির কোন অর্থ থাকে না, এই সকল বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে না, যদি মানুষ জনসমাজ পরিত্যাগ করে। আর এক দিক দিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায় যে সংসারে আসিয়া নরসেবা করাই মানব জীবনের উদ্দেশ্য। সমস্ত নরনারী তাঁহা হইতেই প্রসূত। তাঁহাকে ভালবাসিবে অথচ তাঁহার সন্তান সন্ততিগণকে ভালবাসিবে না, ইহা স্রষ্টার ইচ্ছা নহে। সংসারে দেখা যায় যে, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার নিকট থাকিতে ইচ্ছা করে; তাহার যাহাতে সুখ হয়, সে তাহাই করে এবং সর্ব্বদা তাহার প্রিয় কার্য্য সাধনে যত্নবান্ হয়। সে যাহাকে ভালবাসে তাহারও তাহাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার স্ত্রী পুত্রগণের সেবা করিতে আনন্দ অনুভূত হয়। প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ এই। আর মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কিন্তু তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে না? ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য কি? তাঁহার নিজের কোন অভাব

নাই যে দুর্ব্বল মানুষ তাহা পূরণ করিবে। তাঁহার এই জগৎ পরিবারের সেবা করাই তাঁহার প্রিয় কার্য্য করা। সমস্ত জগৎবাসী জীবজন্তুই তাঁহার পরিবার, তাহাদের সেবা করিলে ঈশ্বরেরই সেবা করা হয়। এই সেবাধর্ম্মের গুণ জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; খৃষ্টীয় শাস্ত্রে, "Love thy neighbour as thyself."—"তোমার প্রতিবেশীকে আপনার ন্যায় ভালবাস", বৈষ্ণব শাস্ত্রে "জীবে দয়া কর" প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ এই মহাসত্যই ঘোষণা করিতেছে। বৌদ্ধ শাস্ত্রের ত কথাই নাই; বৌদ্ধগণ কেবল নরসেবা করিয়াই বিরত হন নাই, পশু পক্ষীদের সেবার জন্যও তাঁহারা বিধান করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্র এবং মুসলমান শাস্ত্রও "পুণ্যং পরোপকারং পাপঞ্চ পরপীড়নম্" এই বাক্যের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। এই মহাসত্য কেবল মতে আবদ্ধ ছিল না। জগতে যত মহাজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাতে মানবের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক দুঃখ যন্ত্রণা দূর হয়, তৎপ্রতি সকলেরই লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা সমাজ সংস্কারক, কেহ বা ধর্ম্ম সংস্কারক, কেহ বা রাজনৈতিক সংস্কারক আবার কেহ বা কারাসংস্কারক রূপে কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু সকলেরই মূলনীতি ঈশ্বরপ্রেম ও মানব সেবা। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বুদ্ধ, চৈতন্য ত সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন; যীশুখৃষ্ট ত বিবাহই করেন নাই। তবে তাঁহাদের কি সংসার পরিত্যাগ করা হইল না? তাঁহারা সন্ন্যাসী হইলেও উদাসীন সন্ন্যাসী ছিলেন না। লোকসেবাকেই তাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা আরও ঘোর সংসারী হইয়াছিলেন। তাঁহারা জগতের সমস্ত নরনারীর সুখ দুঃখের চিন্তার

ভার আপনাদের মস্তকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদার, বিশাল হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। জগৎব্যাপী তাঁহাদের দয়া, বিশ্বব্যাপী তাঁহাদের প্রেম। যাবতীয় নরনারীর দুঃখে তাঁহারা ক্রন্দন করিতেন।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, আমাদের দেশীয় ঋষিগণ বুঝি সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত অরণ্যে অবস্থান করিতেন, সংসারের সুখে, দুঃখে তাঁহারা উদাসীন ছিলেন। বাস্তবিক অরণ্যে বাস করিলেও তাঁহারা নরসেবা ব্রতেই রত ছিলেন। নিতান্ত উদাসীনের সংখ্যা অতি সামান্য। তাঁহারা সময়ে সময়ে নির্জ্জনে বাস করিতেন এবং সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া ব্রহ্মধ্যানে কতক সময় অতিবাহিত করিতেন। এইরূপ নির্জ্জন বাসের আবশ্যকতা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বদাই যে বনে থাকিতেন তাহা নহে। প্রয়োজন হইলেই লোকহিতার্থ তাঁহারা লোকালয়ে আগমন করিতেন। তাঁহারা বিবাহাদিও করিতেন। তাঁহাদের বংশধরগণ আজও ভারতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে গৌতম, কাশ্যপ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি যে সকল গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়, উহা তাঁহাদেরই নাম অনুসারে হইয়াছে; তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ ঐ সকল গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে, যে দেশের ঋষিগণ শাস্ত্র প্রণেতা, ঋষিগণ দর্শন বিজ্ঞান প্রণেতা, ঋষিগণ আইন বিধাতা, ঋষিগণ রাজার পরামর্শ দাতা এবং ঋষিগণই অরাজকতানিবারণকর্ত্তা, সেই দেশের লোকেই মনে করে যে ধর্ম্মলাভ করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয়। ঋষিরা সংসারত্যাগী ছিলেন, এ কথা ভ্রমাত্মক। বাস্তবিক ধর্ম্ম সাধককে, ঈশ্বর লাভের জন্য ব্যাকুল চিত্তকে সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মযোগ সাধনেও প্রবৃত্ত হইতে হইবে। গীতাকার এ জন্য বলিয়াছেন :—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥”

“লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারে না; কেবল মাত্র সন্ন্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না।”

তবে যাঁহারা ধার্ম্মিক তাঁহাদের সংসার পালন সাধারণ লোকের মত নয়। তাঁহারা অনাসক্ত ভাবে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করেন, ফলাফলের দিকে দৃষ্টি রাখেন না। সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ সমান জ্ঞান করিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হন। ফলদাতা ঈশ্বর, ফলের উপর মানুষের কোন্ হাত নাই। মানুষের কর্ত্তব্যসাধনে অধিকার আছে, কিন্তু ফলাফলের উপর তাহার কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। সাধক অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মফল বর্জ্জিতভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবেন, ফলদাতা পরমেশ্বর যেরূপ বিধান করেন তাহাই অম্লান বদনে মস্তকে ধারণ করিবেন। গীতা বলিতেছেন :—

“বিহায় কামান্ চঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥

“যে ব্যক্তি কামনা সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মমতা শূন্য (আসক্তি-শূন্য) হইয়া ভোগ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হইবেন।”

গীতাকার অন্যত্র বলিতেছেন :—

“তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥”

“অতএব তুমি ফলাসক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হন।”

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্মজ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।"

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল "

সুতরাং দেখা যায় যে, প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মের মহিমা বিশেষ ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে কার্য্যই হউক তাহা অনাসক্তভাবে করিতে হইবে। একজন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু এই সম্বন্ধে সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে, বড় লোকের বাড়ীর দাসীগণ যেরূপে কার্য্য করে, মানুষকেও সংসারে সেইরূপভাবে কার্য্য করিতে হইবে। তাহারা ছেলে মেয়েদিগকে আদর করে, পালন করে, আহার করায়, দিনরাত্রি তাহাদিগকে লইয়া থাকে, তাহাদিগকে ভালবাসে, কিন্তু ইহা তাহারা বেশ জানে যে, এ সকল ছেলে মেয়ে তাহাদের নয়; গৃহস্বামী যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই তাহাদিগকে লইয়া যাইতে পারিবেন। সেইরূপ এই সংসারে পরমেশ্বরের দাসদাসীরূপে সকলে কার্য্য করিবে, পরমেশ্বরের সেবা করিবে; কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তেই ইহা স্মরণ রাখিবে যে, পরিবার পরিজন কেহই স্বীয় সম্পত্তি নহে, সকলই পরমেশ্বরের। তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখনই লইয়া যাইবেন, তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই কারণ নাই। সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালন করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর যাহাদের ভার আমাদের উপর দিয়াছেন তাহাদিগকে রক্ষা না করিলে পাপ হয়। কিন্তু তাহাদিগকে পালন করিতে যাইয়া কেহ যেন আবার নীতি বিগর্হিত কার্য্য করিয়া না বসেন। সৎপথে থাকিয়া পরিবার প্রতিপালনে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাতে যদি উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ না হয় তবে পরিবার অনাহারে মরিবে তবুও অন্যায় উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারিবে না। এইরূপে অনাসক্তভাবে সৎপথে থাকিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

যাঁহারা ধর্ম্মজীবনে আরও উন্নত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কেবল অভাব পক্ষে কার্য্য করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, তাঁহারা কেবল অনাসক্তভাবে কার্য্য করিয়াই বিরত থাকেন না, তাঁহারা যাহা করেন, সমস্তই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া থাকেন।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

"গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন এবং যে যে কর্ম্ম করিবেন সমস্তই ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।"

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুস্বমদর্পণম্॥" গীতা।

"হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর, যাহা কিছু খাও, যাহা কিছু দান কর, যাহা কিছু তপস্যা কর, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।"

সুতরাং উচ্চধর্ম্ম যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সমস্তই ব্রহ্মেতে অর্পণ করেন, তাঁহারা সমস্তই ব্রহ্মের জন্য করেন, আপনাদের আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখেন না। এইরূপে আরও যখন উন্নত হন, যখন স্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পান, তখন কেবল তাঁহার আদেশ অনুসারেই কার্য্য করিতে থাকেন। তখন সমস্তই সাধক ব্রহ্মময় দেখিতে পান, তাঁহার কার্য্যকলাপ সমস্তই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখনকার কার্য্য কিরূপ হয় তৎসম্বন্ধে গীতাকার সুন্দর একটি শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহা এই :—

"ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥"

"ব্রহ্মরূপ অর্পণ (যজ্ঞ পাত্র) দ্বারা ব্রহ্মরূপ ঘৃত ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে হুত হয় এবং তিনি (সাধক) ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিদ্বারা ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন।"

যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কি কার্য্য কি অকার্য্য, তাহা অন্যে নির্ণয় করিতে পারে না। ব্রহ্ম তাঁহাদের সাক্ষাৎ উপদেষ্টা। তাঁহাদের কার্য্য, আচার ব্যবহার কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িক নিয়মে আবদ্ধ থাকে না। ব্রহ্ম কর্ত্তৃক যেরূপ আদিষ্ট হন তাঁহারা সেইরূপই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের জন্য অন্যে কোন বিধি ব্যবস্থা করিতে পারে না। সাধকের এরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইতে বিশেষ সাধন ও বহু চেষ্টার প্রয়োজন। প্রথমেই তিনি অনাসক্ত ভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হন না; প্রথমেই তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ বাণী শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। তাই বলিয়া কি তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? সাধকের ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভেই লক্ষ্য থাকিবে, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ। সেই লক্ষ্য, সেই আদর্শের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হইবে। যেমন একদিকে ব্রহ্মে প্রীতি বদ্ধমূল করিবার জন্য, তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা, আরাধনা, ধ্যান ধারণাদির প্রয়োজন, তেমনি অপর দিকে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাও আবশ্যক। যদিও সাধক প্রথমে স্পষ্টভাবে তাঁহার আদেশ জানিতে পারেন না, তথাপি নানা প্রকার অবস্থা, বুদ্ধি বিবেচনা প্রভৃতির সাহায্যে কতক পরিমাণে ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিতে সমর্থ হন। বাস্তবিক ধর্ম্ম লাভের জন্য লালায়িত হইলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে সহজেই অনেক জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ব্যাকুল সাধকের হৃদয়ে পরমেশ্বর শুভ ইচ্ছার উদ্রেক করিয়া দেন। ধর্ম্মের এমনই একটি প্রভাব আছে যে, উহা হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই, মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, উদারতা বৃদ্ধি পায় ও মনোবৃত্তি সকল সম্প্রসারিত হয় এবং সহানুভূতি বর্দ্ধিত হয়। সংসার ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে হইলে মহর্ষি রচিত এই উপদেশটি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়।

লোকেশ-চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে লোকনাথ, হে চৈতন্যময় অধিদেব, হে মঙ্গলময় সর্ব্বব্যাপী দেবতা, তোমার আজ্ঞায় লোকের হিত ও তোমার প্রীতির জন্য আমি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

ধর্ম্ম ও সংস্কার কার্য্য।

অনেকের ধারণা আছে যে, ধর্ম্মের সহিত সংস্কার কার্য্যের কোন সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তাহা ভ্রান্তিমাত্র। ধর্ম্ম হৃদয়ে প্রবেশ করিলেই সাধকের মানসিক ভাব পরিবর্ত্তিত হয়। চারিদিকের দুর্নীতি দূর করিবার ইচ্ছা হয়। যাঁহারা ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের উদার প্রেম ক্ষুদ্র গৃহে বদ্ধ না থাকিয়া জগৎকে আলিঙ্গন করিয়াছে; তাঁহারা জগতের নর-নারীর হিতব্রতে জীবনের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়াছেন। মানব সাধারণের সামাজিক, নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি বিধানের জন্য তাঁহারা ধন, মান, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন; যাহারা দীন দরিদ্র, কেহ যাহাদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, জগতে যাহারা অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের চক্ষুর জল মুছাইয়াছেন; যাহারা নানা প্রকার সংক্রামক ব্যাধিতে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে তাহাদিগকে শুশ্রূষা

করিতে যাইয়া আত্মপ্রাণ হারাইয়াছেন ; যাহারা পাপে তাপে ক্লিষ্ট, সমাজ যাহাদিগকে বক্ষ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে তাহাদিগকে সুমধুর বাণী শুনাইয়া ধর্ম্মের পথে আনয়ন করিয়াছেন। এ সকল দৃশ্য কল্পনাতীত। উহা আমরা ধারণাও করিতে পারি না। এক এক জন ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, চৈতন্য, ম্যাট্‌সিনি, নাইটিঙ্গেল আসিয়া জগতে নূতন যুগের অবতারণা করিয়াছেন। ঈশ্বর প্রীতিতে উন্মত্ত হইয়া তাঁহারা বিশ্বজনীন প্রেমে আপনাদিগকে হারাইয়াছেন। সে দৃশ্য অবর্ণনীয়, সে ভাব ধারণার অতীত। তাঁহারা ধর্ম্মে জীবিত ছিলেন, ধর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু সংসার-মোহে নিদ্রিত জীবনে প্রথম যখন ধর্ম্মভাবের সঞ্চার হয়, তখন সাধক সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মগত প্রাণ না হইলেও তাঁহার মনে ঐ সকল সংস্কারের আভাস দেখা যাইতে থাকে। স্রোতস্বিনী সকল যখন গিরি গহ্বরে উৎপন্ন হয় তখন তাহাদের স্রোত অতি অল্প থাকে, প্রসার অতি ক্ষীণ থাকে ; কিন্তু ক্রমে যতই নিম্নপ্রদেশে আসিতে থাকে ততই বিস্তৃত ও বেগবতী হইয়া ভয়ানক তরঙ্গমালা উত্থিত করিয়া দেশ, জনপদ, রাজ্য ভাসাইয়া মহাসাগরে পতিত হয়। সেইরূপ ধর্ম্মোন্মুখ জীবনে মানব প্রেমের যে অল্প আভাস দেখা যায় তাহা ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করে এবং অবশেষে এক মহা প্রেমসমুদ্রে আপনাকে হারাইয়া ফেলে। বাস্তবিক ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই চিন্তাশীল সাধকের মনে সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের ভাব উদয় হয়। ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হইলে যে সকল কাজ সুফল প্রসব করিয়া পাপ তাপ প্রপীড়িত মানব মণ্ডলীকে শীতল করিবে, তাহা ধর্ম্মোন্মুখ অবস্থাতেই অঙ্কুরিত হয়। যাঁহারা ভবিষ্যতে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক প্রথমেই এই সকল ভাব পোষণ করিতে হইবে। বাস্তবিক ধর্ম্মভাব মানব হৃদয়ে

প্রবেশ করিলে দেশের সর্ব্বপ্রকার দুর্গতি দূর করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা হয়।

সাধক প্রথমতঃ দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া ব্যথিত হন। তাঁহার মনে হয়, আহা! এতগুলি গরীব লোক এত কষ্ট পাইতেছে! আমি কি ইহাদের কিছু সাহায্য করিতে পারি না? এইরূপে দয়া-পরবশ হইয়া তিনি গরীব দুঃখীদিগকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মশাস্ত্রই এই দয়ার মহিমা ঘোষণা করিতেছেন; সমস্ত ধার্ম্মিক মণ্ডলীই দয়াশীল। ধার্ম্মিকদের কথা বলি কেন? হৃদয়ে অল্পাধিক পরিমাণে দয়া না আছে এমন লোক অতি বিরল। কত লোক গরীবদিগকে অজস্রধারে ধনদান করিতেছেন। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ দানকে একটি দৈনিক ব্রত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অকাতরে ধনদান করিয়াও গরীবের দুঃখ কেহ দূর করিতে পারেন নাই; এইরূপ দানে সাময়িক উপকার আছে বটে কিন্তু ইহা দ্বারা গরীবের দুঃখের মূল উৎপাটিত হয় না। তাহারা অর্থাভাবে কত কষ্ট পাইতেছে; নানারূপ রোগ যন্ত্রণায় কত অস্থির হইতেছে, কে তাহার খবর লয়? শোকার্ত্তকে কে সান্ত্বনা দেয়? কত পাপ, কত অত্যাচার তাহাদের মধ্যে রহিয়াছে, কে তাহা নিবারণ করে? এই সকল দুঃখের মূলে কি? চিন্তাশীল সাধক এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া সেই মূল উৎপাটনে রত হন। মহাত্মা শাক্যসিংহ লোকের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিয়া মনে করিলেন, ধর্ম্মের অভাব, বিষয়ে আসক্তি ও অসাম্যই সকল প্রকার দুঃখ যন্ত্রণার মূল। তাই তিনি রাজ্য সম্পদ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, স্নেহশীল পিতা, স্নেহরূপিণী মাতা, প্রাণপ্রতিমা ভার্য্যা ও স্নেহাস্পদ নবকুমারকে পরিত্যাগ করিয়া, আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। মানবমণ্ডলীর সংসারাসক্তি বিদূরিত করিয়া যাহাতে ধর্ম্মের দিকে

তাহাদের মন ফিরাইতে পারেন, জগৎ হইতে অসাম্য দূর করিয়া সাম্যমন্ত্রে যাহাতে সকলকে দীক্ষিত করিতে পারেন, তিনি তাহার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও চিন্তাশীল সাধক লোকের দুঃখ যন্ত্রণার মূল উচ্ছেদ করিবার জন্য যত্নশীল হন। নিম্ন শ্রেণীর লোক নানা কারণে কত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে; তন্মধ্যে শিক্ষার অভাবই যে সর্ব্ব প্রধান কারণ তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ সমাজে যে বৈষম্য প্রণালী বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও নিম্ন শ্রেণীর উন্নতির এক প্রধান অন্তরায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকগণ স্বার্থান্ধ হইয়া নিম্ন শ্রেণীকে চাপা দিয়া রাখিতে চান; এই ভারতবর্ষে এই বৈষম্য প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের মহা অমঙ্গল সংঘটিত করিতেছে, নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের উন্নতির বিঘ্ন জন্মাইতেছে, তাহাদের সুশিক্ষার প্রতিকূলতাচরণ করিতেছে, দেশের আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যাঘাত জন্মাইতেছে। বাস্তবিক জাতিভেদ যে কেবল নিম্নশ্রেণীরই অনিষ্ট করিতেছে তাহা নহে; দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ও অর্থ সম্বন্ধীয় অনিষ্টও সাধন করিতেছে। সাধকের এই সকল বিষয়ে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। তখন জাতিভেদের প্রতি তিনি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। ভগবান্ সকলকেই সমান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; তাঁহার সূর্য্য চন্দ্র সকলকেই আলোক প্রদান করিতেছে; তাঁহার বায়ু সকলেরই গৃহে প্রবেশ করিয়া জীবন রক্ষা করিতেছে; তাঁহার জল সকলেরই তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে; তিনি সকলেরই সুখ শান্তির জন্য ধরাকে ধনধান্যে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, বৃক্ষরাজিকে ফলফুলে পরিশোভিত করিয়াছেন। সকলকেই তিনি শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে সুসজ্জিত করিয়া এই জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কাহাকেও ব্রাহ্মণ, কাহাকেও চণ্ডাল করিয়া সৃষ্টি

করেন নাই। তবে কেন এক শ্রেণীর লোক চিরকাল অপর শ্রেণীর দাস হইয়া থাকিবে? তবে কেন এক শ্রেণীর লোক জ্ঞানলাভ করিয়া সুখ শান্তি উপভোগ করিবে, আর অন্য শ্রেণীর লোক চিরকাল অপমান নির্য্যাতন সহ্য করিবে, তাহারা শরীরের রক্ত জল করিয়া খাটিবে, কিন্তু তাহার প্রতিদানস্বরূপ দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিবে, জ্ঞান ও ধর্ম্মের বিমল আনন্দ তাহারা অনুভব করিতে পারিবে না? ভগবানের রাজ্যে এ বৈষম্য কেন? চিন্তাশীল সাধক এই সকল দেখিয়া সকল প্রকার বৈষম্য, জাতিগত ও কুলগত সকল প্রকার আধিপত্য দূরীভূত করিতে প্রয়াস পান। এই সকল জাতিগত বৈষম্যের বিষয় ভাবিতে যাইয়া তিনি আরও দেখিতে পান যে, কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই যে বৈষম্যের আগুনে পুড়িয়া মরিতেছে, তাহা নহে; উচ্চ শ্রেণীই হউক আর নিম্ন শ্রেণীই হউক, নারীজাতি নানাপ্রকার অত্যাচার ভোগ করিতেছে। সকল দেশেই পুরুষজাতি নারীজাতির উপর আধিপত্য করে, কিন্তু ভারতবর্ষে নারীজাতির অবস্থা অতীব শোচনীয়। এখানে নারীজাতির শিক্ষার ব্যবস্থা নাই, তাঁহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছা নাই, দায়াধিকার নাই। বাল্যকালে তাঁহারা পিতার অধীন, যৌবনকালে স্বামীর অধীন এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীন। ইহাই তাঁহাদিগের দুঃখের চরম সীমা নহে। এক সময় ছিল যখন ভারতীয় রমণীগণ অত্যন্ত সম্মান প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মলাভ করিতেন, আপনারা সর্ব্বগুণে বিভূষিত হইতেন, এবং সন্তান-গণের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই ধর্ম্ম ও নীতির বীজ অঙ্কুরিত করিতেন। কিন্তু এখন তাহার কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখন হিন্দুরমণী দাসীর ন্যায় ব্যবহৃতা, অত্যাচারে প্রপীড়িতা, হৃদয়বিহীন পুরুষগণের পদদলিতা। তাঁহারা ভৃত্যের ন্যায় গৃহের সমস্ত কার্য্য

করেন অথচ মুখ ফুটিয়া কথা বলিবার তাঁহাদের অধিকার নাই। বাল্যকালে যখন সংসারের কিছুই তাঁহারা বোঝেন না, তখন পিতা মাতা তাহাদের সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে যদি কাহারও স্বামীর মৃত্যু হয়, তখন তাঁহাকে চিরবৈধব্যব্রত পালন করিতে হয়। যদি বিষাদের প্রতিমা কেহ দেখিতে চান তবে ঐ ভারতীয় হিন্দু বিধবাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। পুরুষগণ একবারে শতাধিক বিবাহ করিতে পারেন, অশীতিবর্ষ বয়সের সময়েও আবার অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন করিতে পারেন, কিন্তু চারি পাঁচ বৎসরের বালিকাও একবার বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে পারেন না। তাঁহারা যে অন্য কত প্রকারে লাঞ্ছিতা হন তাহা বর্ণনা করা যায় না। বাল্যবিবাহ, বহু-বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, শিক্ষা ও স্বাধীনতার অভাব, চিরবৈধব্য প্রভৃতি নানাপ্রকার কুপ্রথা ভারতীয় রমণীজন্মকে নানাপ্রকার যন্ত্রণার আধার করিয়া তুলিয়াছে। চিন্তাশীল সাধক এই সকল দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারেন না। তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল ধারে অশ্রু পতিত হইতে থাকে। তিনি ইহাদের কষ্ট দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হন।

চিন্তাশীল সাধকের মন লোকের সর্ব্বপ্রকার দুঃখ যন্ত্রণা দূরীভূত করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। যেমন একদিকে সমাজের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সমাজের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তিনি সমাজসংস্কার ব্রতে ব্রতী হন; সেইরূপ আবার দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থা দেখিয়াও তাঁহার মনে কষ্টের উদ্রেক হয়। যেখানে দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার, গরীবের প্রতি ধনীর অবিচার, যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য, যেখানে প্রজার প্রতি রাজার অন্যায় আচরণ সেই স্থানেই

তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তাঁহার হস্ত দুঃখ বিমোচনে প্রসারিত হয়। তাই দেখা যায় যে, কত সাধু মহাত্মা দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন, রাজার অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন। তাই দেখা যায় কত ধর্ম্মপ্রাণ সাধক মানব-মণ্ডলীর দারিদ্র্য যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হন, কতজন কারাগারের অত্যাচার নিবারণ করিতে ব্যস্ত হন, আবার অনেকে রোগ যন্ত্রণাগ্রস্ত নরনারীর শুশ্রূষায় জীবন উৎসর্গ করেন। কত ওয়াসিংটন্, কত ডেমিয়েন্, কত নাইটিঙ্গেল্, কত বুথ্ মানবের দুঃখ দূর করিবার জন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন।

চিন্তাশীল সাধক এখানেই নিশ্চিন্ত থাকেন না। তিনি দেখিতে পান যে সকল দুঃখ যন্ত্রণার মূলে ধর্ম্ম ও নীতির অভাব। ধর্ম্ম ও নীতির অভাবে মানুষ নানাপ্রকার দুর্দ্দশায় পতিত হইতেছে, নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। সমাজে একদিকে মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী রাজত্ব করিতেছে, নানাপ্রকার দুষ্ক্রিয়াসক্তি অপ্রতি-হত প্রভাবে চলিতেছে, অপর দিকে ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে; মানুষ ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ধর্ম্মের পথ হইতে সরিয়া পড়িতেছে। এবং স্বার্থপর ব্যক্তিগণ ধর্ম্মের নানাপ্রকার অসার বাহ্যাড়ম্বর আনিয়া উপস্থিত করিতেছে। পরমেশ্বর এক ও মহান্, তিনি সর্ব্বব্যাপী, চিন্ময়, শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ। কিন্তু মানুষ তাঁহাকে আপনার মনোমত গঠিত করিয়া লয়। মানুষ সেই সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া পূজা করে। ভগবান্ মানুষের হাতে পড়িয়া মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ পর্য্যন্ত হইয়াছেন; তিনি মানুষের ন্যায় কাম ক্রোধ ও হিংসার বশবর্ত্তী হইয়াছেন; মানব-রূপ ধারণ করিয়া সুখ দুঃখ, হর্ষ, বিষাদের অধীন হইয়াছেন। বলিতে

কি, মানুষ তাঁহাকে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চকরূপে সজ্জিত করিয়াছে। কাজেই ঈশ্বরই যখন নীতিমান্ নহেন তখন মানুষও নীতি লঙ্ঘন করিতে পারে। তাই ধর্ম্মের নামে কত পাপ, কত অত্যাচার সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। চিন্তাশীল সাধক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যান এবং ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য প্রয়াস পান। তিনি দেখেন যে এ জগৎ এক পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই উদ্ভূত; তিনি নিত্য, সত্য, চিন্ময়; অসংখ্য দেব দেবী কল্পনা মাত্র। তিনি দেখেন ঈশ্বর বাহ্যবস্তু চাহেন না, হৃদয়গত ভক্তি ও প্রেমই তাঁহার পূজার উপকরণ; তাঁহার পূজা আধ্যাত্মিক।

তাঁহার পূজা করিতে হইলে পবিত্র হইতে হইবে; নৈতিক নিয়ম সকল তাঁহারই বিধান। তাই সাধক প্রেম ও নীতির ধর্ম্ম প্রচার করিতে যত্নবান্ হন। তিনি দেখেন এক ঈশ্বর হইতে সমস্ত নরনারী প্রসূত হইয়াছে; সকলেই তাঁহার সন্তান; তাই তিনি জনসাধারণের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক অত্যাচার যন্ত্রণা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। অবশ্য সকল সাধক সকল সংস্কারে সমানভাবে মনোনিবেশ করেন না; একজন মানুষের পক্ষে সমস্ত সংস্কারে ব্রতী হওয়া সাধ্যায়ত্ত নহে। মধ্যে মধ্যে এমন লোক দেখা যায় বটে যাঁহারা সকল প্রকারের সংস্কার কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এরূপ চরিত্রের প্রধানতম দৃষ্টান্ত। তিনি একাধারে ধর্ম্ম, রাজনীতি সমাজনীতি, সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত লোক প্রায় জন্মে না; এরূপ ক্ষণজন্মা পুরুষ জগতে অতি বিরল। সাধারণতঃ মানুষ সর্ব্ব বিষয়ের সংস্কারে মনোনিবেশ করিতে পারে না। যদিও তাঁহাদের উদার প্রশস্ত হৃদয় ঈশ্বরপ্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জগতের সমস্ত দুঃখ, যন্ত্রণা,

পাপ, অত্যাচার দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হয়, তবুও বিষয় বিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষভাবে আপনাকে নিয়োজিত করেন। তাই দেখা যায়, বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজ সংস্কারে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; ফাদার দামিয়েন্ রোগীর শুশ্রূষায় আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন; হাওয়ার্ড্ কারাসংস্কারক ও মাট্‌সিনি রাজনৈতিক সংস্কারক রূপে পরিচিত ছিলেন। আবার ঈশা, চৈতন্য, বুদ্ধ ও মহম্মদ ধর্ম্মসংস্কার ব্রতে আপনাদিগকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ধর্ম্ম প্রাণে প্রবেশ করিলে মন উন্নত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, লোকের দুঃখ দারিদ্র্য দূর করিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং ধর্ম্মজীবনের ঊষাকালেই সকলপ্রকার সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইতে ইচ্ছা হয়।

সেবার বিধান।

ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয় না; বরং যাহাতে লোকের মঙ্গল হয়, যাহাতে পাপ, অত্যাচার দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া সত্যের বিমল আলোকে মানবের মুখমণ্ডল প্রতিভাত হয় তদ্বিষয়ে সাধকের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই ধর্ম্মের মূল। জ্ঞানশাস্ত্রে যাহাকে কর্ম্ম বলা হইয়াছে ভক্তি-শাস্ত্র তাহাকেই সেবা বলিয়া থাকে। ঈশ্বর প্রীতি কামনায় যাহা করা যায় তাহাকে ভক্তগণ সেবা নামে অভিহিত করেন। বাস্তবিক সংসার-প্রতিপালন, জ্ঞান উপার্জ্জন, নানাবিধ সংস্কার চেষ্টা সকলই ঈশ্বর ও তাঁহার সন্তানগণের সেবা। যে সাধক পরমেশ্বরকে অন্তরের সহিত প্রীতি করেন, তাঁহাকে প্রাণমন সমর্প্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি

তাঁহার আদেশ জানিবার জন্যও নিশ্চয়ই ব্যস্ত হন, তিনি তাঁহার সন্তান সন্ততিগণের সেবা করিবার জন্য অগ্রসর হন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। নরনারীর সেবাই পরমেশ্বরের সেবা। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পরমেশ্বরের পরিবার সুতরাং সাধক প্রাণপণে জগতের সেবায় নিযুক্ত হইবেন।

অনেকে সংস্কার কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করিয়া পূর্ব্বেই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হন। তাঁহারা মনে করেন, ঈশা, বুদ্ধ, মহম্মদ, অথবা পার্কার রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের ন্যায় অতুল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যাহা সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে পারেন নাই, তাহাতে আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল-চিত্ত, ক্ষীণমস্তিষ্ক মানবের হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। আমরা হীন, আমাদের বুদ্ধি, চেষ্টা, অধ্যবসায় অতি অল্প; পরমেশ্বর আমাদিগকে দুর্ব্বল মস্তিষ্ক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন; ঐ সকল সংস্কারকার্য্য দূরে থাকুক, ঈশ্বরের সামান্য অভিপ্রায়ও আমাদের দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, আমরা শত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের সমান হইতে পারি না। সকল ব্যক্তিকে তিনি সমান শক্তি প্রদান করেন নাই, সুতরাং সকলে যে ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে, সকলে যে তাঁহার সেবা করিতে পারিবে ইহা আশা করা যায় না। এইরূপ ভাব দ্বারা পরি-চালিত হইয়া অনেক সহৃদয় সাধক নিরাশায় ডুবিয়া যান; আমার কিছু করিবার শক্তি নাই, আমার কিছু করণীয় নাই বলিয়া সর্ব্ব চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ আবার ঈশ্বরের সর্ব্বভূতে সমান প্রেম এই কথায় সন্দিহান হইয়া ধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করেন।

বাস্তবিক পরমেশ্বরের কার্য্য কলাপ অতীব বিচিত্র। তাঁহার গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে; সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে

দেখিতে যাইয়া নবীন সাধকের মনে নানা প্রকার নিরাশার ভাব জাগিয়া উঠিতে পারে; তাঁহার উদার বিশ্বব্যাপী প্রেমে সংশয় জন্মিতে পারে। কিন্তু একটু গভীরভাবে দেখিলেই সেই সকল নিরাশা কিংবা সংশয়ের কারণ দূরীভূত হয়। সংসারে সকলে সমান শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ করে নাই একথা অত্যন্ত সত্য, এবং সকলে সকল কার্য্যের উপযুক্ত নহে ইহাও নিশ্চিত। যাঁহারা ঈশ্বরকে নিরপেক্ষ প্রমাণ করিতে যাইয়া এরূপ বলেন যে, জন্মের সময় সকলেই সমভাবাপন্ন শক্তি লইয়া সংসারে আসিয়াছে, পরে মাত্র শিক্ষা, ব্যবস্থা ও চেষ্টার পার্থক্যহেতু উন্নতির বিভিন্নতা হইয়াছে তাঁহারা অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছেন। বাস্তবিক জন্মগত যথেষ্ট বৈষম্য রহিয়াছে। যদিও সকলের অন্তরে অনন্ত-স্বরূপ স্বয়ং বিদ্যমান্ রহিয়াছে, এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের বীজ সকলেরই হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে এবং সকলেই ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া অনন্তের দিকেই ধাবমান্ হইবে, সকলেরই হৃদয়স্থিত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সুফল প্রসব করিবে, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানব জন্মগত কতকগুলি পার্থক্য লইয়া সংসারে আগমন করে। জন্মের সময়ে সকলের সকল শক্তি সমানভাবে প্রস্ফুটিত থাকে না। নানা কারণে এই জন্মগত পার্থক্য হইয়া থাকে; পিতা মাতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাব, দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, ও নৈসর্গিক অবস্থা অনুসারে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। বিশেষতঃ ঈশ্বর বিশেষ বিশেষ লোককে বিশেষ কার্য্যের উপযোগী শক্তি সমন্বিত করিয়া জগতে প্রেরণ করেন। শিক্ষা, অবস্থা ও চেষ্টাদ্বারা অনেক পরিমাণে মানব চরিত্র নিয়মিত হয় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া জন্ম-গত পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। এই পার্থক্য দূর করা অসম্ভব এবং যদি সম্ভবও হয় তাহা হইলেও বাঞ্ছনীয় নহে। জগতে কেমন

বৈচিত্র্য রহিয়াছে। নানা প্রকারের বৃক্ষ লতা, পশু পক্ষী জগতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বিভিন্ন ঋতু, মাস, পক্ষ, জগতের সুখ বৰ্দ্ধিত করিতেছে। নানা বর্ণের পুষ্প, প্রকৃতির নানা প্রকার পরিবর্ত্তন, জগতের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত করিতেছে। এই বিভিন্নতা, এই পার্থক্য কে দূর করিতে ইচ্ছা করে? কে সমস্ত বিচিত্রতা দূর করিয়া এক করিতে ভালবাসে? বৈচিত্র্যই সুখের মূল, আনন্দের প্রস্রবণ, সৌন্দর্য্যের খনি। মানব মনও বিচিত্র বলিয়া সুখের ভাণ্ডার হইয়াছে। সকল লোকের যদি এক প্রকার শক্তি, এক প্রকার জ্ঞান, এক প্রকার ভাব ও ইচ্ছা হইত মানব সমাজের সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া যাইত, মানব পরিবার এত সুখের আগার হইত না, এত প্রেম পরস্পরের মধ্যে দেখা যাইত না। বিচিত্রতা তুলিয়া দাও, মানব মন নীরস হইয়া যাইবে, হৃদয় শুষ্ক হইয়া যাইবে, জীবন ভারবহ বোধ হইবে। বিচিত্রতা আমাদের অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়।

তবে প্রশ্ন এই, যদি মানব জীবন বিচিত্র হইল, যদি সকলের শক্তি সমান না হইল, তবে কেমন করিয়া সকলে জগতের কার্য্য করিবে? কেমন করিয়া সকলে ঈশ্বর ও মানবের সেবা করিবে? চৈতন্য ও বুদ্ধের শক্তি অধিক ছিল, তাঁহারা মানব প্রেমে মত্ত ছিলেন; কিন্তু সাধারণের সেরূপ স্বাভাবিক শক্তি নাই, তবে তাঁহাদের উপায় কি হইবে? তাহারা কেমন করিয়া প্রেমিক হইবে? কেমন করিয়া সংস্কারক হইবে? একটু গভীর ভাবে দেখিলেই এ প্রশ্নের উত্তর সহজে পাওয়া যায়। সকলের হৃদয়েই অনন্তস্বরূপের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহা ক্রমে বিকশিত হইয়া অনন্তের দিকে প্রধাবিত হইবে। তবে ইহ জীবনে সকলের সকল বৃত্তি সমান পরিমাণে প্রস্ফুটিত হওয়া সম্ভব নহে, সকলে সমানভাবে উন্নত বৃত্তি (equally developed capacities) লইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই।

বাস্তবিক জগতে সকলের এক রকম কার্য্য নহে; ভগবান্ প্রত্যেক মনুষ্য, কেবল মনুষ্য কেন, প্রত্যেক বস্তুকেই বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সকলেই প্রেরিত পুরুষ, সকলের জীবনেরই বিশেষ লক্ষ্য আছে। মানবজীবন খেলা করিয়া কাটাইবার বস্তু নহে। মানবজীবনের গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। সকল জীবনের এক কার্য্য নহে। কাহার জীবনের কি বিশেষ কার্য্য তাহা অন্যে বলিতে পারে না; যে ব্যক্তি সত্য পিপাসু হইয়া নিষ্ঠার সহিত আপনার জীবনের উদ্দেশ্য জানিতে চায়, যে সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়, ভগবান্ তাহার প্রাণের ভিতরে তাহার জীবনের লক্ষ্য বলিয়া দেন। ভগবান্ যেমন মানব জীবনের এক একটি কার্য্য দিয়াছেন, তেমনই তিনি তদুপযোগী শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। শক্তির অতীত কোন কার্য্য মানবের নিকট তিনি চান না। মানুষ যে শক্তি-টুকু পাইয়াছে তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হইবে; জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়া তৎ সংসাধনে সেই শক্তির নিয়োগ করিলেই পরমেশ্বর প্রীত হইবেন। এ বিষয়ে বাইবেল গ্রন্থে একটি সুন্দর গল্প আছে;— এক ব্যক্তি তাহার কয়েকটি পুত্রকে টাকা দিয়া ব্যবসা করিতে বলিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দশ টাকা পাইয়াছিল সে তাহা ব্যবসা দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া কুড়ি টাকা করিয়া তুলিল; মধ্যম পুত্র আট মুদ্রা খাটাইয়া ষোল মুদ্রা করিল; এইরূপ সকলেই টাকা বর্দ্ধিত করিল; কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র এক টাকা পাইয়াছিল; সে তদ্দ্বারা কোন ব্যবসায় না করিয়া উহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিল এবং সেই টাকাটি পিতাকে ফিরাইয়া দিল। পিতা তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, আমি তোমার নিকট কুড়ি টাকা চাই নাই; তোমাকে এক টাকা দিয়া-ছিলাম, তুমি দুই টাকা আনিলেই যথেষ্ট মনে করিতাম; যাহাকে

যত টাকা দিয়াছি, তাহার নিকট আমি তদনুরূপ লাভ চাই, অতিরিক্ত চাই না। বাস্তবিক পরমেশ্বরও তাহাই চান; যাহাকে যে কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া তিনি দিয়াছেন তাহার নিকট তিনি সেই কার্য্যই চান। যাহার উপর যে কার্য্যের ভার সে তাহা করিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তাঁহার কার্য্য অনন্ত, তাহার কার্য্যে ছোট বড় ভেদ নাই। সকল কার্য্যই সমান। ভগবানের এক মহান্ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, প্রত্যেক মনুষ্য, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষলতা, জলবায়ু প্রভৃতি দ্বারা তিনি সেই লক্ষ্য সিদ্ধ করাইতেছেন; এ স্থলে কাহারও কার্য্য কম নয়। এই যে নানাপ্রকার কল কারখানা রহিয়াছে; উহার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বয়লারেরও যেরূপ দরকার, ঐ ক্ষুদ্র স্ক্রুটিরও সেইরূপ দরকার। একের দ্বারা অন্যের কার্য্য হয় না। প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে, সেই বিশেষত্বটুকু অন্যের দ্বারা রক্ষিত হয় না। প্রচণ্ড সূর্য্য প্রত্যহ উদিত হইয়া পরমেশ্বরের কার্য্য করিতেছে; সে অতি প্রকাণ্ড, মহা তেজস্বান্, তাহার দ্বারা ভগবানের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে; তাই বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র বালুকণাকে তুচ্ছ করিতে পার না। বালুকণা ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তাহারও কার্য্য আছে, সে কার্য্য সূর্য্য দ্বারা সম্পন্ন হয় না। তবে কাহার কার্য্য বড় বলিব? ঐ যে বিশাল সমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে, সে পরমেশ্বরের কার্য্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া ক্ষুদ্র শিশির বিন্দুকে অগ্রাহ্য করিতে পার না; কারণ তাহারও কার্য্য আছে যাহা সমুদ্র দ্বারা সম্পন্ন হয় না। তবে কাহাকে বড় বলিব? যাঁহারা হোমিওপ্যাথি পড়িয়াছেন তাঁহারা জানেন যে একটা ঔষধকে ডাইলিউষন্ করিয়া নানা ক্রমে পরিণত করা যাইতে পারে; এক হইতে সহস্র ক্রমও দেখা যায়। ইহার কোন্ ক্রম ভাল কোন্ ক্রম মন্দ কেহই বলিতে পারে না; কোন ব্যায়রামের পক্ষে উচ্চ ক্রম উপকারী আবার

কোন ব্যায়রামের পক্ষে নিম্নক্রম উপকারী। একের দ্বারা অন্যের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না; সুতরাং কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিব?

বাহ্যজগতে যাহা দেখিতে পাই, মানব সমাজেও তাহাই। কাহার কার্য্য বড় কাহার কার্য্য ছোট কেমন করিয়া বলিব? ঈশা, মুসার কার্য্য আছে; ওয়াসিংটন্, নেপোলিয়নের কার্য্য আছে; তাঁহারা পরমেশ্বরের কার্য্য করিয়া ধন্য হইয়াছেন, জগতে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন; কিন্তু তাই বলিয়া কি তোমার আমার কিছুই কার্য্য নাই? তাঁহাদের জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, আমাদের জীবনেরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তাঁহাদের কার্য্য ঐ কৃষক দ্বারা সম্পন্ন হয় না, আবার ঐ কৃষকের কার্য্যও তাঁহাদের দ্বারা সংসাধিত হয় না। লৌকিক ভাবে আমরা কার্য্যের তারতম্য করি, উহা স্বাভাবিক; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের নিকট সকল কার্য্যই সমান। তাঁহার নিকট ঐ বেদীর উপর উপবিষ্ট আচার্য্যের কার্য্য, আর ঐ লাঙ্গলধারী কৃষকের কার্য্য সমান, কোন তারতম্য নাই। কারণ তাঁহার রাজ্যে উপদেশেরও প্রয়োজন, কৃষিকার্য্যেরও আবশ্যক। এক কাজ দ্বারা অন্য কার্য্য হয় না; একজন দ্বারা অন্যের কার্য্য চলে না। সকলই ভগবানের সেবা, তাঁহার নরনারীর সেবা। কার্য্য ত সকলেই করিয়া থাকে; কেহ ক্ষুৎপিপাসার তাড়নায়, কেহ যশমান লাভের ইচ্ছায়, কেহ বা পরমেশ্বরের আজ্ঞাপালন উদ্দেশ্যে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়; নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রায় কেহই বসিয়া থাকে না। এই সকল কার্য্যই কি ঈশ্বরের সেবা হইল? যে দিন রাত্রি পাপের সেবা করিতেছে, অন্যকে প্রবঞ্চিত করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে সেও কার্য্য করে; আর যিনি অন্যের উপকারের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতেছেন তিনিও কার্য্য করেন। ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তিও কার্য্য করেন, ঈশ্বর

অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কার্য্য করে, সকলই কি ঈশ্বরের সেবা? অবশ্য মানুষ যে ভাবেই কার্য্য করুক তদ্দ্বারাই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইয়া থাকে; মানুষ পাপ করুক আর পুণ্যই করুক তাঁহার উদ্দেশ্য সংসাধনের কেহই বাধা জন্মাইতে পারে না। তবে হৃদয়ের ভাবানুসারে সেই কার্য্যের দোষ ও গুণের নির্ণয় হইয়া থাকে। মানুষের পাপ কার্য্য দ্বারাও ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে, তাই বলিয়া উহা ঈশ্বরের সেবা করা হইল না। এক ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট সাধন করিতে যাইয়া যদি এমন কার্য্য করিয়া ফেলে যাহাতে তাহার অপকার না হইয়া উপকার হইল তবে যেমন সেই কার্য্যের আমরা প্রশংসা করি না; সেইরূপ যদি এক ব্যক্তি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে অথচ তাহাতে ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হয়, তবে সেই কার্য্যকেও আমরা সেবা বলিব না। বাস্তবিক যে কার্য্য করা যায় তাহা ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া করিতে হইবে; ঈশ্বরের কার্য্য মনে করিয়া পবিত্র ভাবে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। শিক্ষক মনে ভাবিবেন, আমি ঈশ্বরেরই সন্তান, তাঁহারই আদেশে কয়েকটি সত্য তাঁহার কয়েকটি সন্তানকে শিক্ষা দিতেছি, আমি প্রভুর দাস প্রভুরই কার্য্য করিতেছি। ডাক্তার ভাবিবেন, আমি তাঁহার সন্তানগণের শারীরিক ব্যাধি দূর করিবার চেষ্টা করিতেছি; ইহা তাঁহারই কার্য্য। কৃষক ভাবিবেন, আমি ভগবানের ভৃত্য, তাঁহার সন্তানগণের ভরণ পোষণের জন্য তাঁহারই আদেশে শস্য উৎপাদন করিতেছি। আবার মুটে ভাবিবেন, আমি প্রভুর সন্তানগণের মোট বহন করিয়া তাঁহার অপর কয়েকটি সন্তানের ভরণ পোষণের দ্রব্য যোগাইতেছি। মেথর ভাবিবেন, আমি প্রভুর আদেশে তাঁহার সন্তানগণের সুখ সুবিধার জন্য, পথ পরিষ্কার করিতেছি। এই ভাবে যিনি যে কার্য্য করেন তাহাই

ভগবানের সেবা, নরনারীর সেবা। এই ভাবে কার্য্য করিলে ঐ রাজার কার্য্য আর ঐ কৃষকের কার্য্য, ঐ আচার্য্যের কার্য্য আর ঐ মেথরের কার্য্য ইহাতে কোন প্রভেদ থাকে না। কার্য্যে আবার ছোট বড় কি? সকলেই তাঁহার ভৃত্য, তাঁহারই আদেশে সামান্য সামান্য কার্য্য করিতেছে। একের কার্য্য যখন অন্য দ্বারা সম্পন্ন হয় না এবং সকল কার্য্যই যখন তাঁহার মহান্ উদ্দেশ্যের আংশিক সাধন, তখন কেমন করিয়া কার্য্যের তারতম্য করিব? সকল কার্য্যই সমান, সকল কার্য্যেরই লক্ষ্য এক—দেবসেবা ও নরসেবা। ঈশ্বর উদ্দেশ্য করিয়া কার্য্য করিলে কার্য্যের তারতম্য থাকে না। এইরূপ কার্য্য করিতে করিতে সাধকের মন ক্রমে উন্নত হয়, দিব্য চক্ষু খুলিয়া যায়; পূর্ব্বে যাহা কষ্টকর ছিল তাহা সুখসাধ্য হইয়া উঠে। ক্রমে মানসিক বৃত্তি সকল প্রস্ফুটিত হইয়া অনন্তের দিকে ছুটিতে থাকে; অপ্রেম ঘুচিয়া যাইয়া হৃদয়ে বিশ্বজনীন প্রেমের আবির্ভাব হয়। তখন দেখা যায় যে, প্রাণ তাঁহারই চরণে পতিত রহিয়াছে, হস্ত তাঁহারই কার্য্য করিতেছে, রসনা তাঁহারই গুণগান করিতেছে, নয়ন সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহারই অনুপম রূপ দর্শন করিতেছে। মানবের মন ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, প্রাণে এক উদাস ভাব প্রবেশ করিয়া মানুষকে ব্রহ্মগত প্রাণ করিয়া তোলে। সে ভাব অবর্ণনীয়, সে ভাব অতুলনীয়; তাহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন।

ধৰ্ম্মজীবনের অন্তরায়।

ধৰ্ম্মজীবন কি, ধৰ্ম্মজীবন কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা কথঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। সাধক সত্যনিষ্ঠা ও ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া একদিকে যেমন ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা, আরাধনায় মনোনিবেশ করিবেন, সৎসঙ্গ, সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালোচনা প্রভৃতিতে আত্মা ও মনকে নিয়োজিত করিবেন, তেমনিই অপর দিকে ঈশ্বরে লক্ষ্য রাখিয়া সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইবেন, নরসেবা রূপ মহাব্রতে নিযুক্ত হইবেন। প্রাণ মন ব্রহ্মপদে সমর্পণ করিয়া হস্ত পদ তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু সাধক সহজে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন না। বাহির হইতে ধৰ্ম্ম অতীব মধুর বলিয়া বোধ হয়; সেই মাধুর্য্য রসে আকৃষ্ট হইয়াই অসংখ্য নরনারী ধর্ম্মের পথ গ্রহণ করে। পরিণামেও ধৰ্ম্ম মানব-হৃদয়ে অমৃত ধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহার প্রাথমিক অবস্থা বড়ই কষ্টকর। সাধকের ধৰ্ম্মজীবনের প্রারম্ভে নানা প্রকার নির্য্যাতন আসিয়া তাঁহাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। ধৰ্ম্মপথে অনেক অন্তরায় আছে। ভগবান্ ধর্ম্মের পথ সরল করিয়া দেন নাই। ধৰ্ম্মপথ যদি অত্যন্ত সহজ হইত, ধৰ্ম্মপথে যদি অসংখ্য কণ্টক রোপিত না থাকিত, তাহা হইলে ধর্ম্মের এত মাধুর্য্য থাকিত না, ধৰ্ম্মলাভে এত আনন্দ হইত না। জলবায়ু মানব জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হইলেও সহজলব্ধ বলিয়া মানুষ তাহার আদর করে না, তাহার মহিমা বোঝে না। কিন্তু স্বর্ণ তত প্রয়োজনীয় না হইলেও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া লোক সমাজে আদৃত হয়; তাই ভগবান্ দয়া করিয়া ধর্ম্মের প্রথম সোপান একটু কণ্টকাকীর্ণ করিয়া

দিয়াছেন। এই সকল অন্তরায় অতিক্রম করিতে যাইয়া সাধকের নৈতিক বল ও ধর্ম্ম বল শতগুণে বর্দ্ধিত হয়; হৃদয়ের বৃত্তি সকল সম্যক্‌-রূপে প্রস্ফুটিত হয়। আর যে সকল ঘটনাকে ধর্ম্মজীবনের অন্তরায় বলা হইয়া থাকে, তাহাদের যে কোনও উপকারিতা নাই তাহা নহে; প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল মানবজীবন বিকাশের সহায়। তবে অতিরিক্ত মাত্রায় যে শক্তিরই পরিচালনা করা যায়, তাহাতেই অপকারের সম্ভাবনা আছে। যাহা হউক, ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সাধককে ধর্ম্মজীবনের অন্তরায়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তাহাদিগকে বিশেষভাবে দমন করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত না করিয়া তাহাদের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মজীবনের সহায়রূপে পরিণত করিতে হইবে।

সাধক ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে হইতে দুই প্রকার শত্রু দেখিতে পান:–(১) বহিঃশত্রু, (২) অন্তঃশত্রু। রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক, আর্থিক যে সকল অসুবিধা মানবের ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় তাহারাই বহিঃশত্রু। আর কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, সুখেচ্ছা প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি সমূহই ধর্ম্ম পথের অন্তঃশত্রু।

বহিঃশত্রু।

প্রাচীনকাল হইতেই মানব মণ্ডলী রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিতেছে। অবশ্য মানবজাতির ইতিবৃত্তে এমন এক সময় ছিল, যখন সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিল, কোন রাজা ছিল না, কোন আইন কানুন ছিল না। কিন্তু যখনই মানবজাতির মধ্যে একটু একটু

জ্ঞান ও সভ্যতার বিমল জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল, তখনই তাহারা আপনাদের শাসন সংরক্ষণের জন্য শৃঙ্খলা করিতে লাগিলেন। রাজা আইন দ্বারা তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতেন, অত্যাচারীকে দমন করিতেন, অধার্ম্মিককে শাস্তি প্রদান করিতেন। ক্রমে ক্রমে রাজার শক্তি এত বর্দ্ধিত হইল যে তিনি মানবের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে হরণ করিতে অগ্রসর হইলেন; রাজনৈতিক, সামাজিক এমন কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অধিকারও লোপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে যাহার উৎপত্তি সেই রাজাই নিজে স্বেচ্ছাচারী হইয়া অপরের স্বাধীনতা হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখনই কোন মানব ঈশ্বরের আদেশ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করিয়াছেন, নূতন মত প্রচার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, বিবেকের স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখনই রাজশক্তি সেই ব্যক্তিকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। তাই দেখা যায়, শত শত ধর্ম্মবীর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে যাইয়া দুরন্ত রোমক সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন; তাই দেখা যায় রিড্‌লি, লাটিমার্, ক্রান্‌মার্ প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ মনিষীগণ আপনাদের ধর্ম্মমত রক্ষা করিতে যাইয়া জ্বলন্ত আগুনে প্রাণ হারাইয়াছেন; তাই দেখা যায়, সাধু হরিদাস হরিনাম প্রচার করিতে যাইয়া বায়ান্ন বাজারে প্রহৃত হইয়াছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করিয়া মহামনা সক্রেটিস্‌কে বিষ-পানে প্রাণ হারাইতে হইল! পিলগ্রিম্‌স্ ফাদার্সদিগকে (Pilgrims fathers) ইংলণ্ড হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া আমেরিকা যাত্রা করিতে হইল। হায়, হায়! ধর্ম্মের নামে কতবার নরশোণিতে ধরা প্লাবিত হইয়াছে বলা যায় না। সকল দেশেই সময়ে সময়ে ক্ষুদ্রচেতা রাজন্যবর্গ

প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগকে নির্য্যাতন করিয়াছেন। এই রাজশাসনের মূলেও সদুদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সে উদ্দেশ্য লোপ পাইয়া রাজশক্তি অত্যাচারে পরিণত হইয়াছে। সুখের বিষয়, নূতন সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানব সন্তান ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। যদিও স্থানে স্থানে রাজগণ বিধর্ম্মীদিগের উপর এখনও উৎপীড়ন করেন, তথাপি মোটের উপর যে উদারতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আজ কাল ধর্ম্মজীবন লাভের প্রতিকূলে রাজার পক্ষ হইতে বিশেষ অন্তরায় উপস্থিত হয় না। বর্ত্তমান শতাব্দী এই বিষয়ে অত্যন্ত সুখদায়ক। আজ নিরাপদে প্রায় সর্ব্বত্রই মানবগণ স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে, রাজা তাহার বাধা জন্মায় না; যেখানে রাজা ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়া বাধা দেন সেখানে অন্যান্য রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়া অত্যাচারীকে দমন করেন। সুতরাং ধর্ম্ম সম্বন্ধে রাজনৈতিক অত্যাচার এক প্রকার দূরীভূত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত ধর্ম্মে অবিশ্বাসের জন্য রাজার অত্যাচার দেখা যায় না বটে, কিন্তু সামাজিক দণ্ড আজিও পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষ সামাজিক জীব, প্রাচীনকাল হইতেই দলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। পরস্পরের সাহায্য ব্যতীত মানুষের জীবন ধারণ করিবার উপায় নাই। একাকী জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত কার্য্য করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তাই ভগবান্ মানবসন্তানকে সমাজে একত্র বাস করিবার উপযোগী করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির ভাব জাগাইয়া দিয়াছেন। সমাজ যেমন এক দিকে অসহায়ের সহায়, গরীবের বন্ধু, তেমনি অপর দিকে দুষ্টের দমন কর্ত্তা, উচ্ছৃঙ্খলের নিয়ামক। সমাজের শাসন অত্যন্ত কঠোর।

বরং রাজশাসন অনেক সময়ে ম নুষ অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হয়, কিন্তু সমাজকে লঙ্ঘন করা সহজ ব্যাপার নহে। যদি সমাজ বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তবে দেশে নানা প্রকার দুর্নীতি প্রবেশ করে। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এখানে সমাজের বন্ধন শিথিল হইতেছে, তাই নানা প্রকার দুর্নীতি, দুষ্ক্রিয়া সমাজে অতি সহজে স্থান পাইতেছে। কয় জন লোক প্রকৃত ভাবে ধর্ম্মকে ভয় করিয়া চলে! কয়জন লোক ঈশ্বরের আজ্ঞা মনে করিরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়? অধিকাংশ লোকই রাজশাসন ও সমাজশাসনের ভয়ে গুরুতর অধর্ম্মের কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু সমাজ অনেক সময়ে আপনার উদ্দেশ্য ও অধিকার বিস্মৃত হইয়া প্রকৃত ধার্ম্মিকের ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। সমাজে নীতি ও ধর্ম্মের আদর না আছে তাহা নহে, কিন্তু তাহার আদর্শ তত উচ্চ নয়। সাধারণ লোককে গুরুতর পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাখিবার পক্ষে ঐ আদর্শ যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যিনি নিজকে ঈশ্বর চরণে সমর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন, জীবনে তাঁহার আদেশ পালন করিতে ব্যাকুল হন, তিনি সমাজের সেই ক্ষুদ্র আদর্শে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। সুতরাং যখন তিনি সমাজের আদর্শ অতিক্রম করিতে চান তখন সমাজ তাঁহাকে দমন করিতে চেষ্টা করে। সমাজ বড়ই রক্ষণশীল; সমাজ নূতনত্ব ভালবাসে না। তুমি সমাজের আদর্শ অনুসারে চলিয়া ধার্ম্মিক হও, ভাল কথা; সমাজ তোমাকে ভালবাসিবে, সমাজ তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। কিন্তু সমাজের আদর্শ লঙ্ঘন করিয়া যদি এক পদও অগ্রসর হও, তাহা হইলেই সমাজ তোমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে। সমাজ সংস্কারের বড়ই বিরোধী। বিশেষতঃ পুরোহিতগণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রক্ষণশীল। প্রচলিত লোকাচারই ইহাদের অবলম্বনীয়; তাই দেখা যায়, যখনই কোন সংস্কারক প্রচলিত

দেশাচারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়াছেন, তখনই তাঁহারা তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছেন। তাই দেখা যায়, ধর্ম্মপ্রাণ ঈশা অভিনব সত্য প্রচার করিতে যাইয়া ক্রুশ-কাষ্ঠে অকালে প্রাণ হারাইলেন; তাই দেখা যায় মহম্মদ, লুথর ও পার্কার প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণকে নানা প্রকার সামাজিক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, বর্ত্তমান শতাব্দীতে এই বঙ্গদেশেই রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেশের দুর্গতি দূর করিতে যাইয়া সমাজের নিকট নানা প্রকারে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও অপদস্থ হইয়াছেন।

ইউরোপে সমাজের অত্যাচার কতক পরিমাণে রহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজ সমস্ত সংস্কারের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ভারতের সমাজে এখন আর তেমন জীবনীশক্তি নাই; কাজেই দেখা যায় বাস্তবিক যাহা পাপ, যাহা দুর্নীতি তাহার বিরুদ্ধে কেহই দণ্ডায়মান হয় না, কিন্তু সৎসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেকেই অস্ত্র ধারণ করে। সমাজে সুরাপান, ব্যভিচার, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিতেছে, কেহই তাহাতে আপত্তি করে না; বরং যাহারা এই সকল দুষ্ক্রিয়ায় রত তাহারাই অনেক সময়ে সমাজে শ্রেষ্ঠ হইয়া দাড়ায়। অথচ যাঁহারা সরলভাবে একেশ্বরের পূজা করিতে চান, যাঁহারা সত্যনিষ্ঠা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে দেশশুদ্ধ লোক খড়্গহস্ত। দেশের লোক মৃত না হইলে সমাজের এরূপ দুর্দ্দশা হইবে কেন? যে দেশের ঋষিগণ ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছিলেন, যাঁহাদের বেদ, বেদান্ত, দর্শন, বিজ্ঞান পরিমিত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে, আজ সেই দেশে সেই ঋষি-

গণের বংশধরগণ ব্রহ্মোপাসনা অধর্ম্মকর বলিয়া মনে করিতেছেন এবং অপরিসীম ঈশ্বরের স্থানে ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার পূজা করিয়াই তৃপ্ত হইতেছেন, ইহা অতীব দুঃখের কথা। যাহা হউক, এই সামাজিক অত্যাচারে নবীন সাধককে হীনবীর্য্য করিয়া তোলে। যখন বাহিরে সকলে নানাপ্রকার উৎপীড়ন আরম্ভ করে, তখন পরিবার হইতেও নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। সমাজের কথা মানুষ অগ্রাহ্য করিতে পারে, কিন্তু একদিকে পারিবারিক নির্য্যাতন, অপর দিকে পিতামাতার ক্রন্দন ধ্বনি কে অতিক্রম করিতে পারে? পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের শাসন সন্তানের পক্ষে অত্যন্ত উপকার জনক। যে সকল যুবক অভিভাবকের শাসনে নাই, তাহারা সহজেই উচ্ছৃঙ্খল ও দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া পড়ে। পিতামাতা সন্তানগণকে সুশাসনে রাখিয়া ধর্ম্ম, নীতি ও জ্ঞানের পথে প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেক সময়ে পিতা মাতাও সন্তানগণকে শাসন করিতে গিয়া তাহাদের সৎবৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। তাঁহাদের দেখা উচিত যে, বালক কোনরূপ অসৎ পথ অবলম্বন না করে, অথচ যেন স্বাধীন চিন্তার স্রোত তাহার প্রাণে প্রবাহিত হইয়া তাহাকে সত্যের পথে পরিচালিত করিতে পারে। কিন্তু অনেক পিতামাতা সন্তানকে আপনাদের আদর্শ অনুসারে গঠন করিতে যাইয়া তাহাদের স্বাধীন চিন্তাস্রোত একেবারেই বন্ধ করিবার প্রয়াস পান। এই প্রকার শাসন উপকারী না হইয়া বরং অনিষ্টজনক হইয়া থাকে। কয়জন যুবক আছে, যাহারা বীরমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া এই সকল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিতে পারে? অনেক সময়ে আবার স্বাধীনভাবে ধর্ম্ম ও নীতির আদর্শ পালন করিতে যাইয়া অনেককে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে হয়। তখন নানা প্রকার দুঃখ যন্ত্রণা আসিয়া উপস্থিত হয়। একে পিতা মাতার স্নেহের অভাব, লোকের

সহানুভূতির অভাব, নানা প্রকার নিন্দা, গঞ্জনা, তাহার উপর ঘোর দরিদ্রতা দুর্ব্বল সাধককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। এই সকল নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও সত্যপথ ধরিয়া থাকা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। অনেকে এই ভীষণ বিপদ সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া পূর্ব্বেই পশ্চাৎপদ হন; সামাজিক, পারিবারিক ও আর্থিক কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন; কিন্তু যাঁহারা ইহাতেও ভীত নহেন তাঁহাদের উপর আরও তীব্রবাণ নিক্ষিপ্ত হয়; সেটি পিতামাতার করুণ ক্রন্দন ধ্বনি। বাস্তবিক পিতা মাতা ইচ্ছা করেন না যে, নিজের সন্তান সমাজ হইতে তাড়িত হয়। তাঁহারা সন্তানের মঙ্গল কামনা করেন, তাহাকে ধার্ম্মিক দেখিতে ইচ্ছা করেন, অনেক সময়ে তাহার মতও ভাল বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা সমাজের অধীন, সমাজের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারেন না। তাই তাঁহারা ক্রন্দন করিতে করিতে প্রিয়তম সন্তানগণকে নূতন ধর্ম্মপথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করেন। এ পরীক্ষা অতি ভীষণ পরীক্ষা, এ পরীক্ষায় অনেকেই পরাস্ত হন। কেবল যিনি একমাত্র সত্যের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তিনিই জয়লাভ করিতে পারেন; ভগবান্ তাঁহাকে নব বল প্রদান করেন, প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে নৈতিক বলের অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্যনিষ্ঠা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া সাধক সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবেন, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন হইয়া সামাজিক, পারিবারিক ও আর্থিক কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিবেন, এবং তাঁহার প্রতি মন রাখিয়া সত্যপথে চলিতে থাকিবেন। সমাজ পরিত্যাগ করিব, পরিবারে থাকিব না, পিতা মাতার সঙ্গে সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিব, এরূপ ভাব কোন সাধকের মনে থাকা উচিত নহে; বরং সত্যপথ হইতে বিচলিত না হইয়া যে পরিমাণে সমাজ ও পিতা মাতার অনুগত হইয়া চলা যায় সেই পরিমাণেই মঙ্গল। কিন্তু

সত্যপথে চলিতে গেলে যদি কেহ বাধা দেন, যদি সমাজ কিংবা পিতা মাতা আপনাদের বক্ষ হইতে তাড়াইয়া দেন, তবে সাধক আর কি করিবেন? তখন পিতা মাতা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন হইতেই হইবে। তিনি তাঁহাদিগকে সুখী করিতে পারিলেন না বলিয়া কাঁদিতে পারেন, কিন্তু কোন ক্রমেই সত্যপথ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে তাঁহাকে কঠোর কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

অনেকে বলেন যে সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া সামাজিক নিয়মের (Social order) বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করা উচিত নহে; সমাজের বক্ষে কোন রকম আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। সমাজে থাকিয়া আস্তে আস্তে লোকদিগকে প্রস্তুত করিতে হইবে। সংস্কারকগণ সমাজে থাকিয়া দেশের যতদূর কল্যাণ করিতে পারেন, সমাজ পরিত্যাগ করিলে ততদূর পারেন না; সমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সংস্কার করা উচিত। অনেকে এতদূরও বলেন যে সমাজ যে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে, সংস্কারকগণের জীবনেও ততদূর পর্য্যন্তই অগ্রসর হওয়া উচিত; তাহা অপেক্ষা অধিক দূর যাইয়া সমাজে বিশৃঙ্খলতা উৎপাদন করা অন্যায়। আপাততঃ এই সকল কথা অত্যন্ত সুযুক্তিসম্মত বলিয়া মনে হয়। সমাজের নিকট মানব অত্যন্ত ঋণী, মানুষ, মানুষ হইতে পারিত না, যদি সমাজ তাহাকে তুলিয়া না ধরিত। বাল্যকাল হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমাজ নানা প্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়া মানবের মনকে ও নৈতিক বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। সেই সমাজের বক্ষে আঘাত করিতে কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির না কষ্ট উপস্থিত হয়? কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত যে সংস্কারকগণ কি উদ্দেশ্যে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া সমাজে বিপ্লব উপস্থিত করেন। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ নিবারণের জন্য মহা

আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ প্রচলন জন্য মহা বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন; সমাজের লোকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া, সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া, বালবিধবার বিবাহ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা কি সমাজের শত্রু ছিলেন? তাঁহারা সমাজকে ভালবাসিতেন বলিয়াই এ প্রকার বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন। যে সমাজে বাস করিতে হইবে, যে সমাজ মানবের জীবন গঠনের প্রধানতম সহায়, সেই সমাজশরীরে ব্যাধি দেখিলে কাহার মনে না কষ্ট হয়? যে সন্তানবৎসলা জননী সন্তানের বক্ষে স্ফোটক দেখিয়াও আপাততঃ যন্ত্রণার ভয়ে উহাতে অস্ত্র প্রয়োগ করিতে অসম্মত হন, তাহাকে কি বাস্তবিক সন্তানের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিব? সেইরূপ নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত সমাজকে সংস্কৃত করিতে গেলে সাময়িক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় বলিয়া যিনি এই মহা হিতকর ব্রত হইতে বিরত থাকেন, তাহাকে সমাজের প্রকৃত হিতৈষী বলিব কি না সন্দেহ। সংসারের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সমাজ সংস্কারকগণকে 'একগুঁয়ে' বলিয়া আপ্যায়িত করেন এবং চঞ্চলচিত্ত, তরল রক্তবিশিষ্ট, অপরিপক্ক বুদ্ধি, সমাজদ্রোহী প্রভৃতি বাক্যে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু জগতের ইতিহাসে এই সকল বুদ্ধিমান্ লোক দ্বারা কখনও কোন সংস্কার হয় নাই। যাঁহারা নির্ব্বোধ, একগুঁয়ে বলিয়া পরিচিত, তাঁহারাই জগতে নূতন যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন।

সমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া সংস্কার করা সম্ভবপর নহে। এক ব্যক্তি বাল্যবিবাহ অন্যায় মনে করেন; তিনি উহা সমাজ হইতে তুলিয়া দিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু সমাজ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে না। সুতরাং তাঁহাকে কি সমাজের মত অনুসারে অষ্টম বৎসরে গৌরী-দান করিতে হইবে? যেহেতু কন্যার অধিক বয়সে বিবাহ দিলে,

সমাজের বক্ষে আঘাত লাগে, যেহেতু তিনি সমাজচ্যুত হন, এই ভয়ে কি তিনি সত্য মত পরিত্যাগ করিয়া, বিবেকের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন? সমাজ যে পর্য্যন্ত তাঁহার মত গ্রহণ না করিবে সে পর্য্যন্ত কি তাঁহার নিজ কার্য্যেও অন্যায় ও অসত্যের প্রশ্রয় দিতে হইবে? একদল লোক মদ্যপান করে; তাহাদের মধ্যে একজনের মদ্যের প্রতি ঘৃণা জন্মিল, তিনি উহা পান করাকে অনিষ্টকর বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অন্যকে সেই পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা করিলেন। এখন সঙ্গীদিগকে যে পর্য্যন্ত মদ্য পরিত্যাগের মতে আনিতে না পারিবেন সে পর্য্যন্ত কি তিনি নিজে মদ্য পরিত্যাগ করিবেন না? এ অতি আশ্চর্য্য যুক্তি! সত্য পথে চলিতে গেলে যদি সমাজের বক্ষে আঘাত লাগে, তাহার উপায় নাই। সংগ্রাম ব্যতীত কোন দেশে কোন কালে সংস্কার হয় নাই। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ব প্রকার সংস্কারেই মহা সংগ্রামের আবশ্যক। সভা করিয়া মত লইয়া কখন কোন সংস্কার হয় নাই। এই কয়েক বৎসর হইল বিলাত যাত্রা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল; অনেক সভা সমিতি বসিয়াছিল; অনেক পণ্ডিত মত দিয়াছিলেন যে, শিক্ষার জন্য বিলাত গেলে জাতিচ্যুত হইতে হইবে না। সেই মত কি কেহ গ্রহণ করিয়াছে? যে সকল পণ্ডিত বিলাত যাত্রার পক্ষে মত দিয়াছিলেন তাঁহাদেরই অনেকে হয়ত বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিকে সমাজচ্যুত করিতে অগ্রসর হইবেন। এইত বৎসর বৎসর সামাজিক সমিতি বসিতেছে! সেখানে দেশের বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ নানা প্রকার সংস্কারের উপকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। কিন্তু সেই অনুসারে কি কার্য্য হইতেছে? অবশ্য সভা সমিতি, বক্তৃতা, পুস্তক প্রচারাদি দ্বারা লোকের মনে সংস্কারের

ভাব শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। সংস্কৃত ভাবগুলি, জনসাধারণের মনে প্রবিষ্ট করাইবার জন্য নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করা উচিত। কিন্তু একমাত্র এই সকল সভা সমিতি বক্তৃতাদির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিলে সংস্কার হওয়া অসম্ভব। পূর্ব্বে এদেশে রাজশক্তি সংস্কারের সহায় ছিল। যখন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত স্থান, কাল ও অবস্থা অনুসারে কোন নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি রাজসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী যখন সংস্কারের যুক্তিযুক্ততা অনুভব করিয়াছেন, তখন তাহা সংহিতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং রাজশক্তি দ্বারা তাহা প্রচারিত হইয়াছে। এইরূপেই মনু, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি সংহিতা প্রচলিত হইয়াছে; এই ভাবেই বর্ত্তমান সময়েও রঘুনন্দনকৃত স্মৃতি বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সে রকম সংস্কারের সম্ভাবনা নাই। এখন রাজা বিদেশী ও বিধর্ম্মী এবং উদার ভাবাপন্ন। তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে উদাসীন থাকিতেই হইবে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরও এখন তেমন আধিপত্য নাই; তাঁহাদের প্রতি লোকের এমন শ্রদ্ধা নাই যে, লোকে তাঁহাদের কথা শুনিবে। কাজেই সংস্কারের একমাত্র উপায় এই যে, সংস্কারকগণ নিজেদের জীবনে সংস্কৃত মতগুলি পালন করিবেন; তাহা দেখিয়া অন্য লোক তাঁহাদের অনুগামী হইবে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান্ সময়ে যেটুকু সংস্কার হইয়াছে, তাহা এই রূপেই সংসাধিত হইয়াছে। সংস্কারকগণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজেদের জীবনে তাহা পালন করিয়াছেন; সমাজ তাঁহাদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাহা তাঁহারা গ্রাহ্য করেন নাই; অকাতরে সমাজের নির্য্যাতন মস্তকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া বহুলোক তাঁহাদের

অনুসরণ করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় যখন বিলাতে গমন করেন, তখন দেশের লোক স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান ম্লেচ্ছদেশে গমন করিবে, ইহাকে তাহারা এক মহাবিপ্লব মনে করিয়াছিল। তিনি কোন সভা সমিতির মত লইয়া বিলাতে যান নাই; তৎপর শত শত হিন্দু যুবক বিলাতে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাও সমাজের মত লইয়া যান নাই। সমাজ রামমোহন রায়কে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কারণ তিনি একা ছিলেন। কিন্তু এখন সমাজ এই বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিগণকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন কোথায়? সমাজ ইহাদের সহিত পরোক্ষভাবে আহার বিহার করিতেছেন। বাস্তবিক এই ভাবেই সংস্কার হয়। সমাজের মত লইয়া বিলাত যাইতে হইলে, বোধ হয় এতদিনে একটি লোকও বিলাত যাইতে পারিত না।

অনেকে বলেন ব্রাহ্মসমাজ বড়ই তীব্রগতিতে চলিতেছেন। ব্রাহ্মগণ যদি অসবর্ণ বিবাহ না দিতেন, হিন্দু সমাজের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলিতেন, তাহা হইলে দেশের অধিক উপকার হইত। কিসে দেশের বেশী উপকার হইত, তাহা ঈশ্বর জানেন। তবে জিজ্ঞাস্য এই যে মিলিয়া মিশিয়া চলার সীমা কোথায়? কতদূর সংস্কার করিলে মিলিয়া মিশিয়া চলা হইত? এমন সময় ছিল যখন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় গেলেই সমাজ উৎপীড়ন আরম্ভ করিতেন; তখন মিলিয়া মিশিয়া থাকার সীমা ছিল, বাড়ীতে বসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করা। আর আজকাল মিলিয়া মিশিয়া থাকার অর্থ ব্রাহ্মমতে বিবাহাদি অনুষ্ঠান না করা—অসবর্ণ বিবাহ না করা। আর কয়েক দিন পরে এই সীমা কোথায় যাইবে কে বলিতে পারে? অনেকে বলেন, যখন হিন্দুসমাজ এত উদার হইয়াছেন যে, বিদেশে যে যাহা করে, কিছুতেই বাধা দেন না,

তখন আর নির্ব্বোধগণের মত ব্রাহ্মগণ সমাজ পরিত্যাগ করিয়া দেশে অশান্তির বীজ বপন করেন কেন? বাস্তবিকই ব্রাহ্মগণ বোকা! তাহা না হইলে যাহাতে দুই দিক ঠিক থাকে তাহা না করিয়া একদিকে তাঁহারা ঝোক দেন কেন? কিন্তু তাহাদের ভাবা উচিত, সমাজ যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা ঐ নির্ব্বোধগণের সমাজ পরিত্যাগের জন্য। তাঁহারা নানাপ্রকার নিন্দা, অপমান, দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যে ফল উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাই উপভোগ করিয়া দেশের শিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকেই আবার সুমিষ্ট কথায় সম্ভাষণ করিতেছেন! তাঁহারা বলেন "সমাজ যতদূর অগ্রসর হইয়াছে ততদূর অগ্রসর হও, ইহার বেশী চলিও না।" এই কথা যে কত অসার তাহা বুঝিতে পারি না। সমাজকে না চালাইলে সমাজ কিরূপে চলে? নানা প্রকার অবস্থায় পড়িয়া, নানাপ্রকার কুলোকের অত্যাচারে সমাজের একটা গতি হয় বটে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণের কি উচিত যে সমাজকে সেই স্রোতে ছাড়িয়া দেন এবং নিজেরাও সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দেন? যদি শিক্ষিত লোকেরা সমাজকে চালাইতে কুণ্ঠিত হন, উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইতে পরাঙ্মুখ হন, তবে সমাজ অশিক্ষিত লোকের ক্রীড়া পুত্তলি হইয়া মহাপাপের আগার হইয়া উঠিবে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উদাসীন থাকিলে চলিবে কেন? তাঁহারা সমাজ তরণীর কর্ণধার হইয়া সমাজকে চালাইবেন, অন্য লোক তাঁহাদের পথ অনুসরণ করিবে। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সত্যপথ ধরিয়া চলিতে হইবে; তাহাতে সমাজ রাখুন আর পরিত্যাগ করুন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। সংগ্রামই মানবের জীবন। কেহ যেন সংগ্রামকে ভয় করিয়া কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত না হন।

সংসারের বুদ্ধিমান্ লোকেরা সংস্কারের বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি

উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন উপযুক্ত সময় আসিবে তখন আপনা আপনিই সংস্কার হইয়া যাইবে। এখনও সময় আসে নাই, সুতরাং 'সংস্কার, সংস্কার' বলিয়া চীৎকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। নবীন সাধকের নিকট এই কথাটিও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে এরূপ অসার কথা আর দুইটি পাওয়া যায় না। সময়ের কি হাত পা আছে, যে সে আসিবে আর সংস্কার হইয়া যাইবে? কখন সময় আসিবে কেহ কি বলিয়া দিতে পারেন? অনেকে বলিবেন, যখন কোন নূতন সত্য গ্রহণে লোকে আপত্তি করিবে না, তখনই তাহার সময় হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এমন সময় কি কখন আসিয়া থাকে, যখন নূতন সত্য গ্রহণে একেবারেই কেহ আপত্তি করে না? ইহা অলসের কথা; সময় কখনও আপনাআপনি আসিবে না। সময়কে প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। যখন কোন সত্য এক জনের প্রাণেও আসে, তখনই মনে করিতে হইবে যে, তাহার সময় হইয়াছে; নতুবা ঐ ব্যক্তির মনে উহা জাগিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন যে, যখন দেখিব এক ব্যক্তি প্রাণপণ করিয়াও একটি সত্য প্রচার করিতে পারিলেন না, তখনই বুঝিব যে, সে সত্য প্রচারের সময় আসে নাই। ইহা অতি আশ্চর্য্য কথা! কোন্ সত্য লোকে গ্রহণ করিবে কোন্‌টা করিবে না তাহা পূর্ব্বে কেমন করিয়া জানা যায়? কে জানিত ঐ ক্রুশেবিদ্ধ দরিদ্র সূত্রধর তনয়ের প্রচারিত সত্য সমস্ত সভ্য জগৎ গ্রহণ করিবে? কে জানিত, শত্রুদল পরিবেষ্টিত আরবের মহাপুরুষের প্রচারিত ধর্ম্ম, কোটি কোটি লোকের মুক্তির পথ পরিষ্কার করিবে? আবার কে জানিত, ইটালীর উৎপীড়িত প্রজাপুঞ্জ ম্যাট্‌সিনীর জীবনপ্রদ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দেশকে স্বাধীনতা রত্নে বিভূষিত করিবে? অন্য-

দিকে যে সকল চেষ্টা ফলবতী হইল না বলা হয়, তাহা দ্বারা যে কোন উপকারই হয় না, তাহা নহে। উইক্লিফের লোলার্ড সম্প্রদায় অধিক বিস্তৃত হয় নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা লুথরের পথ প্রদর্শক হইয়া দেশকে সংস্কারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্র্যাকো নগরে ক্যামারেল্ ওয়াগেল্ এবং জেনিভা নগরে সার্ভিটাস্ ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্ম সমর্থন করিতে যাইয়া নিহত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের তেজোবীর্য্য ও আত্মোৎসর্গ ভবিষ্যৎ বংশে জীবনী-শক্তি প্রদান করিল এবং পরবর্ত্তী সংস্কারের পথ খুলিয়া দিল। বাস্তবিক কোন কার্য্যেরই বিনাশ নাই; কার্য্য করিতে থাক, ক্রমে ক্রমে সেই কার্য্য একত্র হইয়া ভবিষ্যতে মহা ফল উৎপাদন করিবে। আমাদের বিশ্বকবি "অনন্ত জীবন" কবিতায় লিখিয়াছেন :—

"নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদী স্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়।
জাননা, কোথায় তারা যায়?
একেকটি কণা ল'য়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জাননা ত কোথায় তা যায়?
আকাশের সাগর সীমায়।
আকাশ সমুদ্র জলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন;

কত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন।
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ।
করিব গানের মাঝে বাস,
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে
বহে যা'বে গানের বাতাস।"

এই কবিতাটি কি সংস্কারকদের কার্য্যের অমরত্ব প্রকাশ করে না? তাই বলি, সাধক সময় আসে নাই বলিয়া চুপ করিয়া থাকিবেন না। তিনি ঈশ্বরে মন রাখিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য করিবেন, সংস্কার কার্য্যে প্রাণ মন নিয়োজিত করিবেন, ফলদাতা ভগবান্ পরিণামে যাহা ভাল তাহারই বিধান করিবেন। সময়ের একটা ভালমন্দ নাই; কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান করিতেই হইবে; সময় কখন নিজে আসিবে না, তাহাকে টানিয়া আনিতে হইবে।

সমাজ ও পরিবারের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাইয়া সাধকের মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হয়। পিতামাতার তুল্য ইহ সংসারে পূজনীয় আর কেহ নাই। পিতামাতা এই পৃথিবীতে সাক্ষাৎ দেবতা; সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা আবশ্যক, তাঁহাদের সেবা করা উচিত এবং তাঁহাদের বাক্য পালন করা কর্ত্তব্য। পিতামাতা সন্তানকে কিরূপ ভালবাসেন; তাঁহারা সন্তানের জন্য কত সুখ স্বার্থ বিসর্জ্জন দেন! সন্তানের ব্যারাম হইলে দিন নাই, রাত্রি নাই, সর্ব্বদা অক্লান্ত শরীরে শুশ্রূষা করেন। তাঁহাদের ঋণ কি কখনও পরিশোধ করা যায়? হে সন্তান, ঐ পিতামাতা তোমাকে লালনপালন করিয়াছেন, আপনারা

নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া তোমার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; তোমার মানসিক উন্নতির বিধান করিয়া তোমাকে মানুষ নামের যোগ্য করিয়াছেন; আজ তুমি বড় হইয়া, কোথায় তাঁহাদিগকে সুখে শান্তিতে রাখিবে, না, তাঁহাদের বক্ষে শেল বিদ্ধ করিয়া চলিয়া যাইতেছ। তোমার কি দয়া নাই? এই কি তোমার ধর্ম্ম? তুমি ধর্ম্ম সাধন করিতে চাও? পিতা মাতার সেবা করা কি ধর্ম্ম নহে? তাঁহাদের বাক্য পালন করা কি কর্ত্তব্য নহে? তাঁহাদিগকে কাঁদাইয়া যাওয়া কি উচিত? এই প্রকার কথা ধর্ম্ম পিপাসু যুবককে বলা হয়; কথাগুলি সারবান্‌ও বটে। বাস্তবিক পিতামাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। ইহ জগতে তাঁহাদের মত পূজনীয় আর কেহ নাই। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহাদের সেবা করা, তাঁহাদের দুঃখ দূর করা, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা সন্তানের কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম লইয়া মত ভেদ, যেখানে তাঁহাদের আদেশ ও ধর্ম্মের আদেশ পরস্পর বিরোধী, সেস্থলে সাধক কোন্ পথে চলিবেন? সত্য বটে ইহ জগতে তাঁহারা দেবতা, কিন্তু পরমেশ্বর তাঁহাদেরও দেবতা। তাঁহারা আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন; কিন্তু পরমেশ্বর তদপেক্ষাও বেশী দিয়াছেন। পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা তাঁহাদিগকে পাইয়াছি, ধন রত্ন পরিপূর্ণ এই বসুন্ধরা, বিদ্যা, বুদ্ধি, বল সমস্তই পাইয়াছি। এখন পরমেশ্বরের কথা শুনিব, না তাঁহাদের কথা শুনিব? পরমেশ্বর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবকে সংসারে পাঠাইয়াছেন; প্রত্যেক মানুষের জীবনেরই এক একটি বিশেষ কার্য্য আছে, মানুষকে সেই লক্ষ্য ধরিয়া ঈশ্বরের আদেশে কার্য্য করিতে হইবে। হইতে পারে, সাধক আজ যাহা পরমেশ্বরের বাক্য বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ; পরে আবার মত পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আজ যাহা সত্য বুঝিয়াছেন, তাহাত পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার ধর্ম্মপথে চলিতে নিজের বিদ্যা

বুদ্ধি বিবেকই এক মাত্র পথ প্রদর্শক; "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়"; সুতরাং তাঁহাকে ধর্ম্মের পথে চলিতে হইবে। পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া কাহারও উদ্দেশ্য নয়, তবে ধর্ম্মপথে চলিতে গেলে যদি তাঁহাদের আদেশ সময়ে সময়ে লঙ্ঘন করিতে হয়, তবে আর উপায় নাই। এই বিষয়ে হিন্দু শাস্ত্রে সুন্দর দুইটি চিত্র অঙ্কিত আছে; তাহা অনুধাবন করিলেই সমস্ত সংশয় ঘুচিয়া যায়।

রামায়ণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পিতৃভক্ত পরম ধার্ম্মিক রামচন্দ্র পিতাকে সত্য হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার আদেশে রাজ্যধন পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলেন। আপনার সুখের দিকে তিনি তাকাইলেন না; তিনি এই বলিতে বলিতে অরণ্যে গমন করিলেন :—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন গণিতং তদিহাভ্যুপৈতি
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপচক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনং জটিলস্তপস্বী।"

"যাহা মনে ভাবিয়াছিলাম, তাহা এখন দূরে চলিয়া গেল; যাহা কখনও ভাবি নাই তাহাই উপস্থিত হইল। কোথায় প্রাতে আমি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী হইব, আর কোথায় জটিল তপস্বী হইয়া বনে যাইতেছি।"

পিতৃ বাক্য পালনের জন্য সুখ স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখকে তিনি আলিঙ্গন করিলেন; তাঁহার মনে একবারও বিকৃতভাব উপস্থিত হইল না। এমন পিতৃভক্ত আর কে আছে? জগতে এরূপ চিত্র অতুলনীয় তাই জগৎ শতকণ্ঠে তাঁহার গুণ গান করে।

আবার আর একটি চিত্র দর্শন করুন, ইহাতেও মন মোহিত হইবে। দৈত্যকুলচূড়ামণি প্রহ্লাদ হরিভক্তিতে গদ গদ হইয়া নাম কীর্ত্তন করিতেছেন; তাঁহার পিতা কত প্রকারে নিষেধ করিতেছেন, কত ভয়

দেখাইতেছেন, কত উৎপীড়ন করিতেছেন, আবার মাঝে মাঝে কত ক্রন্দন করিতেছেন, কিন্তু প্রহ্লাদ অটল, অচল। তাঁহার পিতা বলিলেন, হরি আমার শত্রু, তাঁহার নাম লইও না; আর যদি একান্তই ঐ নাম ছাড়িতে না পার, মনে মনে নাম জপ কর, প্রকাশ্যে ও নাম গ্রহণ করিও না। প্রহ্লাদ তাহা শুনিলেন না, শত নির্য্যাতন সহ্য করিয়া, পিতৃ-বাক্য অবহেলা করিয়া, হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এ দৃশ্যেও জগৎ বিস্মিত হইল; সকলে শত কণ্ঠে প্রহ্লাদের গুণ গাহিতে লাগিল। এই দুইটি চিত্রই হিন্দু শাস্ত্র হইতে গৃহীত; সকলেই দুইটিরই বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকেন। রাম পিতৃ আজ্ঞা পালন করিয়া পূজিত, প্রহ্লাদ উহা লঙ্ঘন করিয়া প্রশংসিত। ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? বাস্তবিক দুটি চরিত্রই অতীব মধুর। রামের সঙ্গে দশরথের ধর্ম্ম লইয়া মতভেদ ছিল না; সুখ লালসা আর পিতৃ আজ্ঞা পালন এই দুই লইয়া রামের মনে সংগ্রাম। রাম আপনার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, পিতৃ আজ্ঞা পালন করিলেন। আর প্রহ্লাদের সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর ধর্ম্ম লইয়া মত ভেদ: সেখানে প্রহ্লাদ আপনার মত পিতার আজ্ঞায় ছাড়িতে পারিলেন না। এই জন্য উভয়েই মহৎ; দুই জনই আমাদের পূজার যোগ্য।

বাস্তবিক পিতা মাতার আজ্ঞায় সংসারের সমস্ত সুখ, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু ধর্ম্ম মত হইতে এক চুলও বিচলিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। সংসারে এমন কিছুই নাই, যাহা পিতা মাতার আদেশে পরিত্যাগ করা না যায়; কিন্তু ধর্ম্ম মত হইতে বিন্দুমাত্রও দূরে সরিতে পারা যায় না। ধর্ম্মের জন্য যে সমস্তই পরিত্যাগ করা যায়, তাহা আমাদের এই পতিত দেশেও পিতৃমাতৃগণ বিশেষ ভাবে শিক্ষা দিয়া থাকেন। যদি সন্তান ঘটনা বশতঃ বিধর্ম্মী হইয়া যায়, তবে অনেক স্থলেই পিতা মাতা দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়াও প্রাণপ্রতিম

সেই সন্তানকে পরিত্যাগ করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা কি পরিষ্কাররূপে প্রমাণ করেন না যে, ধর্ম্মের জন্য সমস্তই পরিত্যাগ করা যাইতে পারে? যে সকল পাষণ্ড আপনাদের আরামস্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া পিতামাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, তাহারা মনুষ্য নামের যোগ্য নহে। কিন্তু ধর্ম্মের জন্য যদি বাধ্য হইয়া, পিতামাতাকে কষ্ট দিতে হয়, তাহা হইলে আর উপায় নাই। সাধক এরূপ অবস্থায় অতি সাবধানে চলিবেন; যত বিনম্র বচনে তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিতে পারেন, তাহা করিবেন; প্রাণপণে তাঁহাদের যথাসাধ্য সেবা করিবেন। পিতামাতা পূজনীয়, সুতরাং কেবল ঈশ্বরের আদেশেই পিতামাতার আদেশ লঙ্ঘন করা যাইতে পারে, আপনার সুখ, স্বচ্ছন্দতা কিংবা আরামের জন্য নহে।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা সংস্কৃত মতগুলি অত্যন্ত ভালবাসেন; সংস্কৃত মতগুলি প্রচারিত হইতে দেখিলে এবং তদনুসারে মানুষকে কার্য্য করিতে দেখিলে তাঁহাদের প্রাণে প্রকৃতই আনন্দ হয়। কিন্তু তাঁহারা নিজে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে কিংবা ঐ সকল অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎভাবে যোগ দিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, আমরা ত সংস্কারেরই প্রয়াসী, সমস্ত সংস্কারের সঙ্গেইত আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি রহিয়াছে, তবে প্রকাশ্যভাবে যোগ নাই বা দিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? আমরা বিশ্বাস করি যে নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সঙ্গে একত্রে আহার করিলে কোন দোষ নাই এবং যাঁহারা ঐরূপ করেন, তাঁহাদিগকেও আমরা আদরেই গ্রহণ করি; তবে আমরা নিজে নিম্নশ্রেণীর প্রদত্ত অন্ন নাইবা আহার করিলাম। এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সমস্ত সংস্কার কার্য্য হইতে আপনাদিগকে পৃথক রাখেন। অনেক লোকই আপনারা অগ্রসর হইয়া সংস্কার কার্য্যে লিপ্ত হইতে

ইচ্ছা করেন না। ইহাতে অনেক রকম অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। তাহাদের মধ্যে যাঁহারা পদস্থ তাহাদিগকে অন্যেরা অনুসরণ করিয়া থাকে; তাহাদিগকে সংস্কার বিষয়ে উদাসীন দেখিয়া তাহারাও ঐ বিষয়ে উদাসীন হয়। এইরূপ নীতি সকলে অবলম্বন করিলে কিরূপে সমাজ সংস্কৃত হইবে? বাস্তবিক প্রত্যেকেরই অগ্রবর্ত্তী হইয়া সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রত্যেক মনুষ্যের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত যে তাহার এই সামাজিক সুখ শান্তি, মানসিক ও নৈতিক শক্তি বিকাশের মূল সূত্র কোথায়? প্রথমে মানব সমাজ অতি অসভ্য অবস্থায় ছিল; আদিম পুরুষেরা আমমাংস ভক্ষণ করিত; তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, ধর্ম্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শ ছিল না, পারিবারিক সুখ শান্তি এত প্রচুর পরিমাণে ছিল না। আর আজ সমাজ কত উন্নত, কত শিক্ষিত। এই উন্নতির মূল কোথায়? সেই আদিম অবস্থায় যদি প্রত্যেক ব্যক্তি সংস্কার বিমুখ হইয়া বসিয়া থাকিত তাহা হইলে আজিও সেই অবস্থার অভিনয় দেখিতে পাইতাম; এত সুখ, শান্তি, জ্ঞান, বিজ্ঞান পরিপূর্ণ সমাজ প্রাপ্ত হইতাম না। এত উন্নতি, এত সৌভাগ্যের গূঢ় রহস্য কোথায়? সেই আদিম অবস্থা হইতেই নরনারীগণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ, জ্ঞাত কিংবা অজ্ঞাত ভাবে সংস্কার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহাতে আপনাদের ও সমাজের মঙ্গল হয় তজ্জন্য তাঁহারা যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন; সমাজের মঙ্গলকর নিয়ম প্রচলন করিতে যাইয়া নানা প্রকার বিপদে পতিত হইয়াছেন, অনেক সময়ে জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ শরীরের রক্ত বিন্দু বিন্দু পাত করিয়া আমাদের উন্নতির পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন; আমাদেরই উন্নতির জন্য ঈশা রক্তদান করিয়াছেন, সক্রেটিস্ বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, বুদ্ধ, চৈতন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন। কেবল তাঁহাদের কথা বলি কেন পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই

অল্পাধিক পরিমাণে ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের উন্নতির জন্য স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা সেরূপ না করিলে আমরা কখনও অসভ্যতা অতিক্রম করিতে পারিতাম না। তাই বলি যদি আমাদের উন্নতি আমাদের বিদ্যা বুদ্ধি, আমাদের সুখৈশ্বর্য্য, আমাদের ধর্ম্ম ও নীতি পূর্ব্বপুরুষগণের আত্মত্যাগের ফল হয়, তবে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের উন্নতির জন্য আমাদেরও কি আত্মত্যাগ ব্রত অবলম্বন করা উচিত নয়? সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হওয়া কর্ত্তব্য নহে? সকলেই যদি উদাসীনতা অবলম্বন করেন তবে সমাজ যে স্থিতিশীল হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার আর যে উন্নতি হইবে না; এবং ভবিষ্যৎবংশীয়গণ অন্যজাতির সহিত জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইয়া আমাদিগকেই অভিসম্পাৎ করিবে। সুতরাং যাঁহারা দেশের উন্নতি চান তাঁহারা উদাসীন ভাবে সংস্কার কার্য্যে সহানুভূতি করিলে চলিবে না; তাঁহাদিগকে প্রকাশ্য ভাবে সংস্কারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

কেহ কেহ বলেন, প্রকাশ্য ভাবে ধর্ম্ম করিতে গেলে বিশেষতঃ সংস্কার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলে নানাপ্রকার অসুবিধায় পতিত হইতে হয়। এরূপ করিলে প্রাচীন বন্ধুদের নিকট কোনরূপ সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতে পারে না; নূতন সমাজে প্রবিষ্ট হইয়াও যে কাহারও কোন সহায়তা পাওয়া যাইবে, তাহারও সম্ভাবনা অতি অল্প থাকে; সুতরাং কোন্ ভরসায় প্রাচীন সমাজের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? এইরূপ কথার কোন উত্তর নাই। ধর্ম্মপিপাসু সাধকের সুবিধা অসুবিধার প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত নহে। সমাজ পরিত্যাগ করা না করা আলোচ্য বিষয় নহে। সাধককে সত্যপথে চলিতে হইবে; তাহাতে সমাজ রাখে কিংবা তাড়াইয়া দেয় কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই। কে সাহায্য করিবে, কে না করিবে, তাহা ভাবিয়া

চিন্তিয়া কোন সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হওয়া যায় না। রাজর্ষি রামমোহন যখন সংস্কার ব্রত গ্রহণ করিলেন, তখন কাহার উপর তাঁহার নির্ভর ছিল? খৃষ্টের প্রথম প্রচারক দলের কে সহায় ছিল? "সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।" তাঁহার দিকে তাকাইয়া সাধক কার্য্য করিবেন; সত্য যাহা, ন্যায় যাহা ঈশ্বরানুমোদিত যাহা, তাহা প্রাণপণে পালন করিবেন। নতুবা ধর্ম্ম লাভের আশা দুরাশা মাত্র। তাঁহার দিকে তাকাইয়া নির্ভয়ে তাঁহার কার্য্য করিলে, তিনি হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া, নববলে বিভূষিত করিবেন।

অন্তঃ শত্রু।

ধর্ম্মজীবনের বহিঃশত্রু বিষয়ে কথঞ্চিৎ পরিমাণে আলোচনা করা হইয়াছে। বাস্তবিক সামাজিক ও পারিবারিক অত্যাচারে অনেকে ধর্ম্মপথ হইতে চ্যুত হন। তাহার উপর যখন পিতামাতার আর্ত্তনাদ, আত্মীয় স্বজনের করুণ ক্রন্দনধ্বনি নবীন সাধকের মনকে বিগলিত করে তখন সহজেই তাঁহার মন প্রকৃত ধর্ম্মপথ হইতে সরিয়া পড়ে। মানুষ অশেষ অত্যাচার ববং অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারে কিন্তু আত্মীয়স্বজনের চক্ষের জল দর্শন করিতে পারে না। যাহাহউক, এই যে বাহিরের অন্তরায়ের কথা বলা হইল, ইহারা যতই প্রবল হউক, ইহাদিগকে দূরীভূত করা ততদূর কষ্টকর নয়; একটু নৈতিক বল, একটু দৃঢ়তা থাকিলেই এই সকল শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু আর এক প্রকার শত্রু আছে যাহা বাহিরের শত্রু অপেক্ষাও ভীষণতর রূপ ধারণ করিয়া মানবের মনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারা অন্তঃশত্রু।

শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকেই রিপু আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। এই মানসিক রিপুগণের অত্যাচারে অনেক সাধককে ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের সঙ্গে নীতির বিশেষ সম্পর্ক নাই। ঈশ্বরের ধ্যান, ধারণা, নাম জপ, কীর্ত্তন এক, সত্যনিষ্ঠা, অনসূয়া, পবিত্রতা আর এক। ধর্ম্ম ও নীতি অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে। এই ভাবটি কোথা হইতে আসিল ঠিক বলা যায় না। তবে শঙ্করাচার্য্যের বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ এদেশে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল তাহাতে জীব ও ব্রহ্ম একই। সেই মত বিকৃত হইয়া এ দেশের নর নারীর হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহারা সেই মতের সুযোগ লইয়া আপনাদের পাপ ঈশ্বরের উপর আরোপ করিতে প্রয়াস পান। যে কোন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে নীতিবিষয়ক আলোচনা করা যায় তিনিই বলেন যে আমাদের কোন শক্তি নাই ; ঈশ্বরেরই শক্তি, আমরা যাহা করি তাহা তিনিই করান ; পাপ পুণ্য একটা লৌকিক ভাব, উহা ভ্রম মাত্র। এই মত এদেশীয় নরনারীব হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়াতে তাঁহারা নীতির পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছেন। তাই দেখা যায়, এদেশে স্খলিত চরিত্র ব্যক্তিগণও ধার্ম্মিক বলিয়া সাধারণের নিকট পূজ্য হন, এবং সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বাস্তবিক নীতি সুরক্ষিত না হইলে ধর্ম্মজীবন লাভ করা অসম্ভব। পাপ কলুষিত হৃদয়ে ঈশ্বর প্রকাশিত হন না।

মানবহৃদয়ে অনেকগুলি বৃত্তি আছে ; এই সকল বৃত্তি অনেক সময়ে ধর্ম্মপথের সহায় হয় বটে কিন্তু সময়ে সময়ে আবার তাহারা ধর্ম্মপথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। জ্ঞানিগণ মনের বৃত্তি সমূহকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন—সৎ প্রবৃত্তি ও অসৎ প্রবৃত্তি। দয়া, প্রেম, সত্যপরায়ণতা প্রভৃতিকে তাঁহারা সৎ প্রবৃত্তি বলিয়াছেন এবং

কাম, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতিকে অসৎ প্রবৃত্তি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। বাস্তবিক বৃত্তিসমূহকে সু ও কু এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় কি না সন্দেহ। ভগবান্ কোন বৃত্তি বৃথা প্রদান করেন নাই; সমস্ত বৃত্তি-গুলিরই উপকারিতা আছে। মানব হৃদয়ে এমন বৃত্তি নাই যাহা হইতে কেবলই কুফল প্রসূত হয়—যাহার মোটেই সদ্ব্যবহার হইতে পারে না। আবার এমন বৃত্তিও নাই যাহা হইতে কেবলই সুফল উৎপন্ন হয়, যাহার বিকার হইতে পারে না। তবে কতকগুলি বৃত্তি আছে যাহা হইতে অনেক সময়েই সুফল প্রসূত হইতে দেখা যায় এবং আর কতকগুলি আছে যাহারা অধিকাংশ সময়েই মানব মনকে কুপথগামী করে। তাই বলিয়া তাহাদের মধ্যে শ্রেণীগত কোন পার্থক্য নাই। (**The difference is not of kind but of degree**). ভগবান্ সমস্ত বৃত্তিগুলিই মানবের হিতের জন্য প্রদান করিয়াছেন; মানুষ স্বাধীন, তাই সময়ে সময়ে বৃত্তিগুলির অপব্যবহার করিয়া কুফল উৎপন্ন করে— স্বর্গের সংসারকে নরকে পরিণত করে। তাই মানব প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া দাঁড়ায়। ধর্ম্ম জীবনের যত প্রকার রিপু আছে তন্মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তেজনাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল; ইহাতে মানুষকে পশু করিয়া তোলে। মানব হৃদয়ে যে সকল বৃত্তি আছে তাহার সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে যে সকল বৃত্তিকে সাধা-রণতঃ মানবজীবনে কার্য্য করিতে দেখা যায় তাহাদের বিবরণ ক্রমে দেওয়া যাইতেছে। এই বৃত্তি বিভাগ সম্বন্ধে কতক পরিমাণে দার্শনিক শ্রেষ্ঠ ডাক্তার মার্টিনোর অনুকরণ করা হইয়াছে।

বৃত্তি বিভাগ।

(১) নিন্দাপরায়ণতা ও বিদ্বেষভাব (censoriousness and antipathy.)—নিন্দাপরায়ণতা ধর্ম্মজীবনের একটি প্রধান শত্রু। যাঁহারা পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ান, পরের কুৎসা লোকের নিকট প্রচার করাই যাঁহাদের অভ্যাস, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না। এক প্রকার লোক আছে, যাহাদিগকে মক্ষিকা প্রকৃতির মানুষ বলা যায়। মক্ষিকাগণ যেমন দিবারাত্রি ক্ষত স্থান অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, যেখানে পচা ঘা দেখিতে পায় সেই স্থানেই যাইয়া তাহারা উপস্থিত হয়; সেইরূপ এই শ্রেণীর লোকও অন্যের দোষ অনুসন্ধান করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এইরূপ লোকের সংখ্যাই সমাজে অধিক। পরনিন্দা, পরকুৎসাতে কি এক আরাম, কি এক সুখ আছে বলা যায় না। পরনিন্দা করিতে বসিলে আহার নিদ্রা পর্য্যন্ত মনে থাকে না। পরনিন্দার কি মোহিনী শক্তি! তবে কি এই প্রবৃত্তি ভগবান্ মানুষের কেবল অধোগতির জন্যই প্রদান করিয়াছেন? ইহার কি সদ্ব্যবহার কিছু নাই? ভগবান্ পাপের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা দিয়াছেন; পাপের প্রতি একটা স্বাভাবিক ঘৃণার ভাব না থাকিলে সংসার নরকে পরিণত হইত। এই পাপের প্রতি ঘৃণা প্রবৃত্তি বিকৃত হইয়া নিন্দাপরায়ণতায় পরিণত হইয়াছে। পাপের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতে যাইয়া মানুষ পাপীকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। পাপের প্রতি ঘৃণার উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ নিজে পাপ হইতে দূরে থাকিবে এবং অন্যকেও দুষ্কার্য্য করিতে দেখিলে তাহা হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবে। মানুষ পাপ-বিদ্বেষ প্রবৃত্তির গূঢ় মর্ম্ম ভুলিয়া

পাপীকে ঘৃণা করিতে লাগিল; এবং পাপীকে সংশোধিত করিতে হইবে এই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া পরনিন্দায় রত হইল। পরনিন্দায় অত্যন্ত আনন্দ হয়; তাহার কারণ এই যে, অন্যের দোষ প্রতিপাদন করিতে পারিলে নিজের দোষ লুকাইতে পারা যায়। অন্যে নিজের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ ইহা অনেকেরই সহ্য হয় না। অনেকেরই হিংসুটে প্রকৃতি আছে, তাই তাহারা অন্যের নিন্দা করিয়া মনে কিছু সুখ অনুভব করে। অনেক সময়ে আত্মকৃত পাপের জন্য মানুষকে বিবেক দংশন করিতে থাকে; সেই বিবেকের কঠোর দংশন হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেকে অন্যের দোষ দেখাইয়া আপনাদের মনকে কোন রকমে সান্ত্বনা প্রদান করে। মানবের এ অতি শোচনীয় অবস্থা! সাধক এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকিবেন; আত্মচিন্তার অভাবেই এ দোষটি হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। যে ব্যক্তি নিজের বিষয় চিন্তা করে, সে কি আর পরের নিন্দা করিবার সময় ও সুবিধা পায়? সে দেখে যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কত পাপ তাহার হৃদয়ে রহিয়াছে, সে কোন্ প্রাণে অন্যের নিন্দা করিবে? সাধক নিজের দোষ ও অন্যের গুণ অনুসন্ধান করিবেন; তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিবেন যে বিশেষ আবশ্যক ব্যতীত কখনও অন্যের নিন্দা মুখ হইতে বাহির করিব না। তিনি সর্ব্বদা আত্মচিন্তা করিবেন এবং সৎভাব দ্বারা হৃদয় পূর্ণ রাখিবেন। আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ভক্তিভাজন ব্যক্তির বিষয় চিন্তা করিবেন; এবং সর্ব্বোপরি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। অবশ্য এমন সময় ও অবস্থা আছে যখন কর্ত্তব্যানুরোধে পরের দোষ প্রমাণ করিতে হয়। কোন বন্ধু দোষ করিলে তাহার নিকট যাইয়া তাহাকে সংশোধনের জন্য দুঃখিত হৃদয়ে তাহার দোষ জ্ঞাপন করিতে হয়; সে ও নিন্দার ভাবে নয়, সংশোধনের জন্য। অপরাধী ব্যক্তি শাস্তি না

পাইলে সাধারণের অপকার হয় এই জন্যও অনেক সময়ে লোকের দোষ প্রকাশ করিতে হয়। এই সকল স্থলে সাধকের দেখা উচিত যে অপরাধীর দোষ স্মরণে ও প্রকাশে তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়াছে, না তাহার জন্য প্রাণে দুঃখ হইয়াছে। বাস্তবিক যদি কেহ কাঁদিতে কাঁদিতে পরের দোষ বলিতে পারেন, তবেই বুঝিব যে তিনি প্রকৃতভাবে অপরাধীর অপরাধ দেখিতে সমর্থ হইয়াছেন; নতুবা অন্যের দোষ দেখিয়া যদি হৃদয় নাচিয়া উঠে তবে সে অবস্থা সাধনার অত্যন্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে। সাধক এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া মনকে প্রস্তুত করিবেন; পাপকে ঘৃণা করিবেন কিন্তু পাপীকে ভালবাসিয়া পাপ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

(২) প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ক্রোধ (Vindictiveness and anger.)—ধর্ম্ম জীবনের আর একটি শত্রু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি। অনেক লোকের এমন কোপন স্বভাব যে, কেহ তাহাদের একটু অনিষ্ট করিলে, একটু ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিলেই তাহাদের এত ক্রোধ হয় যে তাহাতে তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্ম্ম সাধকের ক্ষমাশীল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। যাহার হৃদয়ে প্রতিহিংসার অনল জ্বলিতে থাকে তাহার সাধন ভজন কিছুই হয় না। এই প্রবৃত্তির মূল দেখিতে গেলে ভগবানের মহৎ উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রোধ অত্যন্ত উপকারী প্রবৃত্তি; ক্রোধ একেবারে না থাকিলে সংসার বাসের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়া উঠিত। এই ক্রোধের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলেই প্রতিহিংসা পরায়ণতার সৃষ্টি হয়। যদি ক্রোধ না থাকিত তবে স্বার্থপর মানুষ অপরের সর্ব্বনাশ করিতে ভীত হইত না; প্রবল দুর্ব্বলের উপর, ধনী গরীবের উপর নিঃশঙ্কচিত্তে অত্যাচার করিত; নিঃসহায়া বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পাষণ্ডগণ আপনাদের কোষাগার পূর্ণ করিত; কত

অসহায়া রমণী সতীত্বরত্ন হারাইত, কত অলঙ্কারে বিভূষিত সুকুমার দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইত; এই সকল অত্যাচার, নৃশংস ব্যাপার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে কেহই অগ্রসর হইত না। তাই ভগবান্ মানব হৃদয়ে ক্রোধ দিয়াছেন; দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিলেই মানব হৃদয়ে ক্রোধের উদ্রেক হয় এবং তৎপ্রতিবিধানে প্রবৃত্তি জন্মে। কেবল তাহা নহে, অনেক সময়ে অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে হইলেও ক্রোধের আবশ্যক। মানবের উপকারের জন্যই এই ক্রোধ বৃত্তিটি ভগবান্ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু মানুষ ইহাকে কলুষিত করিয়া পাপের ভার বৃদ্ধি করিতেছে। প্রতিহিংসাপরায়ণতা অতি ভয়ানক রিপু; ইহাতে মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লোপ পায়; ইহার সাময়িক উত্তেজনায় মানুষ না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। অনেকের হৃদয়ে ইহা স্থায়ী ভাব ধারণ করিয়া সংসারকে নরকে পরিণত করে। কত মানব এই প্রবৃত্তির উত্তেজনায় প্রেম, দয়া প্রভৃতি বৃত্তির মস্তকে পদাঘাত করিয়া নরশোণিতে ধরা রঞ্জিত করিয়াছে! হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে চাপিয়া রাখিয়া পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধুর বক্ষে তরবারি নিক্ষেপ করিয়াছে! সাধক এই রিপু সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধান হইবেন। ইহাতে মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত করিয়া ফেলে। যখন একটু একটু ক্রোধের ভাব আসিবে তখনই সাধক অন্যদিকে মন লইয়া যাইতে চেষ্টা করিবেন। আমাদের মুখ অনেক সময়ে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে; যখন ক্রোধের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় তখন মুখের কি যে এক বিকৃত আকৃতি হয় তাহা দেখিলে বাস্তবিকই মনে ঘৃণা জন্মে। ক্রোধের উত্তেজনার সময়ে আপনার মুখ দর্পণে দেখিলে নিজের বিকৃত আকৃতি দর্শন করিয়া, সাধকের মনে লজ্জা উপস্থিত হইতে পারে এবং ক্রোধের ভাব ক্রমে ক্রমে প্রশমিত হইতে পারে। ক্রোধের সময়ে

উচ্চৈস্বরে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অথবা কোন কবিতা কিংবা অন্য কিছু আবৃত্তি করিলে উহা প্রশমিত হয়। সাধক দেখিবেন যে, যেখানে অত্যাচার সেখানে যেন ক্রোধের প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। কিন্তু প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে কখনও হৃদয়ে স্থান দিবেন না। উহা স্থায়ী হইয়া মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করে। নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে সহজেই এই রিপু দমন করা যায়; তাহা হইলে ক্রোধের উদয় হইলেই, আমি ত ক্রোধ করিব না, এই কথা মনে আসে। আর আপনার ঐকান্তিক যত্ন না থাকিলে কোন উপায়েই কিছু ফল হয় না।

(৩) সন্দিগ্ধচিত্ততা ও ভয় (Suspiciousness and fear.)—সন্দিগ্ধচিত্ততাও সাধন পথের একটি প্রধান অন্তরায়। অনেক লোক আছেন যাঁহারা সংসারে কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারেন না; তাঁহারা সংসারে কেবলই প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা দেখিতে পান। জগৎ যে প্রেম শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে, জগতে মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকিলেও তাহার মধ্যে সত্য, পবিত্রতা ও প্রীতির দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ইহা তাঁহারা দেখিতে পান না। তাঁহারা অতি সাবধানে চলেন; অতি সতর্কতার সহিত কথা বলেন; যেন শত্রুগণপরিবেষ্টিত দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এরূপ মনে করেন। ভগবান্ মানবহৃদয়ে ভয় দিয়াছেন; ভয় একটি উৎকৃষ্ট বৃত্তি। ভয় না থাকিলে মানুষ আপনার শক্তির অতিরিক্ত কার্য্য করিতে যাইয়া নানা বিপদে পতিত হইত। ভয় আছে, তাই মানুষ সতর্কভাবে চলে, আপনার শক্তি অনুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ভয় আছে বলিয়াই মানুষ এই পাপ তাপ অত্যাচার পরিপূর্ণ সংসারে দুর্জ্জনের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে; ভয় আছে বলিয়াই মানুষ অন্যের প্রতি অত্যাচার করিতে অনেক

সময়ে সাহস পায় না। ভয় মানুষকে আপনার শক্তি বুঝাইয়া দেয়, ভয় মানুষকে দুষ্ট লোকের হাত হইতে রক্ষা করে। কিন্তু এই ভয়কে মানুষ বিকৃত করিয়াছে; অতিরিক্ত ভয় যাহাদের আছে; তাহারাই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া দাঁড়ায়। সত্য বটে, জগতে অনেক দস্যু, অনেক ধূর্ত্ত, অনেক প্রতারক আছে, কিন্তু তাই বলিয়া সকলকে অবিশ্বাস করিলে সংসারে চলা দুষ্কর। সংসারের অধিকাংশ কার্য্যই বিশ্বাসের উপর চলিতেছে। পরস্পরের উপর বিশ্বাস না থাকিলে সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইত; এমন কি মায়ের হস্তে পুত্র আহার করিতে সাহসী হইত না। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের কি শোচনীয় অবস্থা! ইহারা সংসারের সৌন্দর্য্য ও প্রেম উপভোগ করিতে পারে না; শারদীয় পৌর্ণমাসীর সুবিমল জ্যোৎস্নালোক, বসন্তকালের মৃদুমন্দ প্রভাত সমীরণ, সকলই ইহাদের নিকট নীরস বলিয়া বোধ হয়। নবলাবণ্যযুক্ত বালকের মধুর হাসি, নবযৌবনের অপূর্ব্ব প্রীতি, ইঁহারা কিছুই উপভোগ করিতে পারেন না। সংসার ইহাদের নিকট কেবলই শুষ্ক, কেবলই নীরস। এ অতি বিকৃত অবস্থা। এ অবস্থায় পতিত হইলে জীবনের সমস্ত স্ফূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়, সমস্ত তেজোবীর্য্য লোপ প্রাপ্ত হয়। যাহার হৃদয়ে একবার সন্দেহকীট প্রবেশ করিয়াছে সে পিতামাতার অকৃত্রিম স্নেহ, প্রিয়তমা ভার্য্যার পবিত্র প্রেম, বন্ধু বান্ধবের নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সকলের মধ্যেই স্বার্থ দেখিতে পায়। এমন কি ঈশ্বরের প্রেম, দয়া এবং অস্তিত্বে পর্য্যন্ত সন্দিহান হইয়া নরদেহ-ধারী পশু সাজিয়া বসে। সাধক এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকিবেন। একদল লোক আছেন যাঁহারা স্বভাবতই লোককে অবিশ্বাস করেন, পরে যখন কাহারও বিশ্বাসের প্রমাণ পান, তখনই তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেন। সাধক কখনও এ প্রকার ভাব পোষণ করিবেন না।

যে পর্য্যন্ত অবিশ্বাসের বিশেষ কারণ না পাইবেন সে পর্য্যন্ত সকলকেই বিশ্বাসের চক্ষে দেখিবেন। জানি, ইহাতে অনেক সময়ে প্রবঞ্চিত হইতে হইবে; কিন্তু ধর্ম্মপিপাসু সাধক বরং সাংসারিক প্রবঞ্চনা সহ্য করিবেন তথাপি বিশ্বাসরূপ আধ্যাত্মিক বৃত্তিটি হারাইবেন না। আর ইহাও নিশ্চিত যে, যিনি অন্যকে অকাতরে বিশ্বাস করেন, তিনি পরিণামে প্রবঞ্চিত হন না। মানুষ বিশ্বাসীকে এক দিন, দুই দিন বঞ্চনা করিতে পারে, কিন্তু তথাপি যদি তিনি লোককে বিশ্বাস করিতে থাকেন তবে আর কেহ তাঁহাকে প্রবঞ্চনা করিতে সাহস পায় না। প্রবঞ্চিত হওয়াও বরং ভাল, তবুও বিশ্বাসরূপ অমূল্য রত্ন হারান ভাল নয়।

(৪) ভোগলিপ্সা ও আহার বিহার (Love of ease and appetites)—ভোগলিপ্সাও ধর্ম্ম জীবন গঠনের একটি প্রধান অন্তরায়। ইহাতে সাধককে কঠোর কর্ত্তব্যের পথ হইতে চ্যুত করিয়া আরাম ও শান্তির অন্বেষণে নিযুক্ত করে। ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ শরীর ও মনের মহা অনিষ্ট সাধন করে ও ধর্ম্ম জীবন নষ্ট করিয়া ফেলে। পরমেশ্বর মানবের শরীর সংরক্ষণের জন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রাম প্রবৃত্তি দিয়াছেন। এই সকল শরীর রক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। তিনি মানবকে শরীর ও মন দিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন; মানুষ বৈধ উপায়ে শরীর রক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। উপযুক্ত আহার ও বিশ্রাম শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন। মানবকে তিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধি দিয়াছেন; সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই মানবের পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করা উচিত ও উপযুক্তরূপ বিশ্রাম করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু মানবের এই কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপরই কেবল যদি ঈশ্বর নির্ভর করিতেন, তবে অনেকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাই তিনি আহার ও বিশ্রামে সুখ দিয়াছেন; কেবল তাহা নয়, যদি ইহাতেও মানবসন্তান কর্ত্তব্য পালন না করে সেইজন্য তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা ও শ্রান্তিরূপ অঙ্কুশ দিয়াছেন, যাহার তাড়নে মানুষকে বাধ্য হইয়া শরীর রক্ষার উপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইতেছে। মানুষ আহার ও বিশ্রামের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইয়া যথেচ্ছ আহার, বিহার করিয়া থাকে। রসনার তৃপ্তির জন্য মানুষ যেমন একদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ করে, এবং তদ্গতিকে নানা প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তেমনই অপরদিকে অতিরিক্ত বিশ্রামদ্বারা শরীরকে অবশ ও অবসন্ন করিয়া তোলে, সর্ব্বরকমের কার্য্য করিবার স্পৃহা নষ্ট করিয়া ফেলে। ভোগলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যে কেবল আহার বিহারে অত্যাচার করে তাহা নয়, নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে থাকে; কিসে একটু সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইবে, কিসে লোকে আমার দিকে একটু তাকাইবে, এই চিন্তাতেই বিলাসপরায়ণ ব্যক্তি বিব্রত থাকেন। এই সকল কারণে মানুষ একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এই ভোগবাসনার আনুষঙ্গিক অনেক প্রকার পাপ আছে যাহা মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করিয়া ফেলে। তখন জলে আর পিপাসার শান্তি হয় না। সুরাপান ভোগবাসনার পরম সাথী, ব্যভিচার আনুষঙ্গিক কার্য্য। কত লোক ভোগবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মানবজীবন কলঙ্কিত করিয়াছে, শরীর নষ্ট করিয়াছে এবং যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়াছে! অনেককে অবশেষে অর্থাভাবে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে এবং রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে। সাধক এই ভোগলিপ্সা একেবারেই পরিত্যাগ করিবেন।

এই মানবজীবন খেলিবার নয়; ইহাতে ভগবানের মহান্ উদ্দেশ্য মানবকে সংসাধন করিতে হইবে; তজ্জন্য শরীর রক্ষার প্রয়োজন, এবং তদুপযোগী আহার ও বিশ্রাম করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধক ততদূর আহার ও বিশ্রাম করিতে পারেন যাহাতে শরীর রক্ষা হয়; তদ-তিরিক্ত কিছু করিবার তাঁহার অধিকার নাই। তাঁহার স্পষ্ট মনে রাখা উচিত যে খাওয়ার জন্য বাঁচিয়া থাকা নয়, কিন্তু বাঁচিয়া থাকিয়া ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য খাওয়া। ঈশ্বরের দিকে মন থাকিবে, বিলাসিতার দিকে, ভোগলিপ্সার দিকে যেন মন না যায়। মানুষ সংসারে অনেক আবশ্যকতার সৃষ্টি করে; মাত্র জীবনধারণ করিবার জন্য মানুষের যে সকল জিনিষের প্রয়োজন, মানুষ অনর্থক ভোগলিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়া তদতিরিক্ত জিনিষের আবশ্যকতার উৎপাদন করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা অনেক নূতন বিলাস সামগ্রীর আমদানী করিয়াছে, সাধক সেই সকল জিনিষ হইতে দূরে থাকিবেন। তিনি যেন সভ্যতার হুজুকে মাতিয়া বিলাসপরায়ণ হইয়া না উঠেন।

(৫) ইন্দ্রিয়াসক্তি ও প্রজাবৃদ্ধি (**Sensuality and procreation**):—এখন যে প্রবৃত্তির কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি ইহা ধর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। ইহাতে মানবজীবনকে যতদূর অধঃ-পাতিত করে, মনের সৎপ্রবৃত্তি যতদূর নষ্ট করে এবং ধর্ম্মপথ হইতে মানুষকে যতদূর বিচলিত করে এমন আর কোন রিপুই করিতে পারে না। অথচ মানবহৃদয়ে এরূপ প্রবলবৃত্তি আর দ্বিতীয় নাই। সমস্ত সাধুগণ, সমস্ত শাস্ত্র, এই রিপুর বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিয়াছেন। এই রিপু যিনি যতদূর জয় করিতে পারেন, তিনিই ততদূর উন্নত। জিতেন্দ্রিয়তা বলিলে কাম জয় করাই বুঝায়। ইহা অতি ঘৃণিত প্রবৃত্তি বলিয়া ইহার উল্লেখেও মানুষ লজ্জা বোধ করে। ক্রোধ

প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল রিপু আছে, তাহা সর্ব্বজনসমক্ষে পরিচালনা করিতেও লোক ততদূর লজ্জিত হয় না; কিন্তু ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত যাহারা, তাহারাও ভদ্রজনসমক্ষে ইহার নাম পর্য্যন্ত করিতেও লজ্জা অনুভব করে। হায়, হায়! এই প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া কত লোককে যে পশুত্বে পরিণত করিয়াছে তাহার সীমা ও সংখ্যা নাই। যৌবনকালেই রিপুর উত্তেজনা আরম্ভ হইয়া থাকে। প্রেম ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি। প্রেম না থাকিলে সংসারে মাধুর্য্য থাকিত না; সংসার শুষ্ক, নীরস প্রতীয়মান হইত। প্রেম মানবসমাজ বন্ধনের রজ্জু। প্রেম আছে বলিয়াই ভাই ভগ্নী, স্ত্রী পুত্র, পিতামাতা, একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সুখ ও শান্তিতে সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতেছে। সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাও স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি। যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, তাহার প্রতি মন স্বভাবতঃ প্রধাবিত হয়, তাহাকেই বক্ষে ধারণ করিতে ইচ্ছা হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই মানবের মনে প্রেম ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা অত্যন্ত প্রবল হয়। যখন নবীন যুবকের মনে সুকোমল বৃত্তিগুলি একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, যখন বুকভরা প্রেম ও প্রাণভরা আশা লইয়া নবীন যুবক নব উদ্যম ও উৎসাহের সহিত সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন জগৎ তাঁহার নিকট এক নূতন রাজ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়; প্রকৃতি দেবী যেন নূতন বসন পরিধান করিয়া নব নব ভাব লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে যাইতেছেন; কি এক মহা আবরণে যেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহা হইতে উন্মুক্তা হইয়া প্রকৃতি যুবকের হৃদয়ে অমৃতধারা বর্ষণ করিতেছেন! তরুণ যুবকের এই প্রেম, এই আশা, এই উদ্যম, এই উৎসাহ দর্শন করিলে কাহার মনে না আনন্দ হয়? তাহার এই নবীন প্রেমের উচ্ছ্বাস, বিশ্ব-

প্লাবনকারী প্রেমের তরঙ্গ, প্রেমোৎফুল্ল মুখমণ্ডলের অনুপম লাবণ্য ও কান্তি দর্শন করিলে কাহার হৃদয়ে না আনন্দ ও আশার উদ্রেক হয়? কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সময়ে প্রেম ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়াসক্তিরূপ পাপবিষ যুবকহৃদয়ে প্রবেশ করে। এই প্রেম ও সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই নবীন যুবককে বিপথে লইয়া যায়। তরুণ যুবকের নবপ্রস্ফুটিত হৃদয়কমলে কি যে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে তাহার সমস্ত লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়, চক্ষু জ্যোতিহীন হয়, শরীর ক্ষীণ হয়, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়, ধারণাশক্তির হ্রাস হয়, উৎসাহ উদ্যম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগের উৎপত্তি হয়, এবং অকালে করাল মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। অসময়ে অস্বাভাবিকরূপে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিলে কি রূপ ফল হয় তৎসম্বন্ধে ডাক্তার নিকল্‌স্ বলিয়াছেন:—"It is a medical—a physiological fact, that the best blood in the body goes to make the elements of reproduction in both sexes. In a pure and orderly life this matter is reabsorbed. It goes back into the circulation ready to form the finest brain, nerve and muscular tissue. This life of man, carried back and diffused through his system, makes him manly, strong, brave, heroic. If wasted, it leaves him effeminate, weak and irresolute, intellectually and physically debilitated and a prey to sexual irritation, disordered function, morbid sensation, disordered muscular movement, a wretched nervous system, epilepsy, insanity and death."—"চিকিৎসা শাস্ত্র ও শারীর বিজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিয়াছেন

যে, শরীরের রক্তের সারাংশই নরনারীর জনয়িত্রী শক্তির মূল উপাদান। যাঁহার জীবন পবিত্র ও নিয়ত তাঁহার শরীরে এই পদার্থ মিলাইয়া যায় এবং পুনরায় রক্তের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া অত্যুৎকৃষ্ট মস্তিষ্ক, স্নায়ু এবং মাংসপেশী গঠিত করিয়া থাকে। মানবের এই জীবনী রক্তের মধ্যে পুনরায় গৃহীত হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে সমধিক মনুষ্যত্ব সম্পন্ন, দৃঢ়কায়, সাহসী ও উদ্যমশীল এবং বীর্য্যশালী করে। আর এই বস্তুর ব্যয় মানুষকে হীনবীর্য্য, দুর্ব্বল এবং চঞ্চলমতি করিয়া ফেলে, তাহার শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হয়, রিপুর উত্তেজনা বলবতী হয়, শরীর যন্ত্রের ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, ইন্দ্রিয়-বৃত্তি বিকৃত হইয়া পড়ে, মাংসপেশীর ক্রিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হয়, স্নায়বীয় যন্ত্র নিতান্ত হীনশক্তি হইয়া যায়। মূর্চ্ছা, উন্মাদ রোগ এবং মৃত্যু ইহার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।"

ডাক্তার ফ্যাল্‌রেট্‌ বলিয়াছেন ঃ—"**Debility of intellect and especially of memory characterises the mental alienation of the licentious** ঃ—"ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা দ্বারা লক্ষিত হয়।"

"মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ।"

"বিন্দু পাতে মৃত্যু, বিন্দু ধারণে জীবন"। (শিবসংহিতা)।

ধর্ম্মশাস্ত্র ও চিকিৎসা শাস্ত্র সমস্তই অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনার কুফল প্রদর্শন করিতেছেন। কেবল যুবকদেরই যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় চালনা দোষের তাহা নহে। যুবকই হউন আর বৃদ্ধই হউন, বৈধ কিংবা অবৈধ, স্বাভাবিক কিংবা অস্বাভাবিক রূপে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরিচালনা করিলেই কর্ম্মফল ভোগ করিবেন। তবে যৌবনকালেই পাপের বীজ হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, তাই সেই সময়েই বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

হায়, হায়। অস্বাভাবিক উপায়ে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে যাইয়া কত যুবক যে সর্ব্বনাশপ্রাপ্ত হইতেছে কে তাহার সংবাদ লয়? যে বালক এক সময়ে অপূর্ব্ব কান্তিযুক্ত ছিল, শ্রমশীলতা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় পিতামাতা ও শিক্ষকের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল, যাহার উপর কত আশা ন্যস্ত করা হইয়াছিল, হায়, হায়! যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতেই সমস্ত আশা অঙ্কুরে বিনাশ প্রাপ্ত হইল! এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ইহার কারণ কি কেহ অনুসন্ধান করিয়া থাকেন? সমাজ নীরব ও নির্জ্জীব। পিতামাতা ও শিক্ষকগণ এ বিষয়ে মনোযোগ দেন না। দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! পূজ্যপাদ ঋষিগণ ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রতপালনের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন; আর আজ সেই ছাত্রজীবনে নানা প্রকার দুর্নীতিব্যাধি প্রবেশ করিয়া দেশকে উৎসন্ন দিতেছে! ধর্ম্মাচার্য্যগণ তাহা দেখিয়াও দেখেন না। কেবল তাহা নয়, অনেকে অল্প বয়সে বালক বালিকার বিবাহ প্রদান করিয়া কুপ্রবৃত্তি পরিচালনের সুবিধা করিয়া দিতেছেন। আহা! সরলমতি যুবকের মনে পাপের বীজ প্রবেশ করিতে না করিতেই যদি তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হয়, যদি কোন চরিত্রবান্ পুরুষ যুবক হৃদয়ের প্রেমের উচ্ছ্বাসকে নিয়মিত করিয়া দেন, যিনি সকল প্রেমের আধার ও সকল সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ তাঁহার প্রতিই যুবকের মন প্রধাবিত করিয়া দেন, তবে ঐ সকল বৃত্তি দ্বারা যুবকের ক্ষতি না হইয়া বরং উপকারই হইয়া থাকে। তিনিই সকল প্রেমের আধারভূত, সমস্ত সৌন্দর্য্যের খনি। প্রেমমন্দাকিনী সেই দেবাধিদেবেরই শ্রীপাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া জগৎ প্লাবিত করিতেছে, তাঁহারই অনুপম সৌন্দর্য্যে জগৎ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সেই প্রেমের উৎস, সেই সৌন্দর্য্যের আধারের প্রতি নবীন যুবকের মন প্রধাবিত করান আবশ্যক।

উপযুক্ত শিক্ষা, উপদেশ ও আদর্শের অভাবে ও কুসঙ্গীর দোষে যে কীট বালক হৃদয়ে অকালে প্রবেশ করে, তাহা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিত্তবৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিতে থাকে এবং অবশেষে মানবকে মহা ব্যভিচারে লিপ্ত করে। ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে প্রতিনিয়ত দেখা যাইতেছে। কেবল তাহা নহে, সংসারে কত রক্তপাত, কত ভ্রূণহত্যা, কত আত্মহত্যা এই ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে সংঘটিত হইতেছে—ধরা নরকে পরিণত হইতেছে—মনুষ্যত্ব পশুত্বে পরিবর্ত্তিত হইতেছে! আবালবৃদ্ধ সকলেই কি এক ঘোর কুহকে ভুলিয়া আছেন! হা ধর্ম্ম, তুমি কোথায়? বলিব কি, ধর্ম্মের নামেও কত ব্যভিচার সমাজ মধ্যে স্থান পাইতেছে! অনেকে প্রকাশ্যে কোন ব্যভিচার করেন না বটে, কিন্তু মন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যে বিকৃত হইয়াছে। এই বৃত্তি যাহার প্রবল ধর্ম্ম ও নীতি তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না।

এই যে বৃত্তির কথা বলা হইল, যাহার বিষময় ফল দেখিয়া সুধীগণ চিন্তিত হইতেছেন, যাহার অতুল প্রভাব খর্ব্ব করিবার জন্য কত চেষ্টা, কত উদ্যোগ হইতেছে, অথচ কিছুতেই ফললাভ হইতেছে না, ইহা কি কেবল কুফলই উৎপন্ন করে? ভগবান্ কি মানবের অধঃপতনের জন্যই এই বৃত্তিটি প্রদান করিয়াছেন? ইহার কি কোন সৎ ব্যবহার নাই? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মানব হৃদয়ে এমন একটিও বৃত্তি নাই যাহার কোনই আবশ্যকতা নাই। যে বৃত্তি থাকাতে সংসারে জীব প্রবাহ বর্দ্ধিত ও রক্ষিত হইতেছে, যে বৃত্তি থাকাতে ভগবানের মহান্ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইতেছে, তাহার কি কোন উপকারিতা নাই? বাস্তবিক জীবস্রোতের রক্ষণ ও বর্দ্ধন ভগবানের বিধান; সেই জন্যই তিনি মানব হৃদয়ে এই বৃত্তিটি দিয়াছেন। যত প্রকার সম্পর্ক আছে তন্মধ্যে দাম্পত্যসম্বন্ধই অতীব মধুর; প্রেমিকহৃদয় নরনারী প্রেমে এক হইয়া

ঈশ্বরের কার্য্য করিবেন, তাঁহার আদেশে প্রজাবৃদ্ধি দ্বারা জীবপ্রবাহ রক্ষা করিবেন, ইহাই ভগবানের অভিপ্রায়। জীবপ্রবাহ বৃদ্ধি করা জীবনের এক মহাব্রত; ইহাকে কেহ যেন অপবিত্র ভাবে না দেখেন, তাহাতে মহা প্রত্যবায় আছে। ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ঈশ্বরের ইচ্ছানুবর্ত্তী হইয়া প্রজাবৃদ্ধি করিবেন, সর্ব্বাগ্রে সংযতচিত্তে বীর্য্যবান্ ও চরিত্রবান্ সন্তানের জন্য স্বামী ও স্ত্রী ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন; পরে অবিকৃত ভাবে ঈশ্বরাদেশে জীবপ্রবাহ বর্দ্ধনরূপ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিবেন, ইহাই ভগবানের বিধান। যেখানে এই পবিত্র ভাব নাই সেখানেই ব্যভিচার। অসংযত চিত্তে যথেচ্ছ ব্যবহার করা সমাজ বিরুদ্ধ না হইলেও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। স্বামী স্ত্রীর অপরিমিত ইন্দ্রিয় চালনাকে সমাজ ব্যভিচার বলে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে ইহাকেও ব্যভিচার বলিতে হইবে। সমাজ কি অধঃপাতেই যাইতেছে! ইন্দ্রিয়াসক্তি মানব হৃদয়ে মজ্জাগত ভাব ধারণ করিয়াছে।

সাধক ইন্দ্রিয়বিকার হইতে মুক্ত থাকিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। তিনি মন সর্ব্বদা পবিত্রভাবে রাখিবেন, সৎ চিন্তা দ্বারা সর্ব্বদা মন পূর্ণ করিবেন; নতুবা পাপবাসনা ধীরে ধীরে হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। শূন্য মন সয়তানের কারখানা (Idle mind is devil's workshop), এ কথাটি অত্যন্ত সত্য। ঈশ্বরের কোন নাম সর্ব্বদা মনে রাখিতে পারিলে উপকার হয়; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনা প্রস্তুত করিয়া যদি মনে মনে সর্ব্বদা বলা যায়, তাহাতেও হৃদয় পবিত্র থাকে। যাহার মনে কুভাব বেশী আসে সে সর্ব্বদা কোন কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে চেষ্টা করিবে, অথবা অন্য লোকের মধ্যে থাকিবে, কখনও একাকী থাকিবে না। সমবয়স্ক ব্যক্তিগণের সঙ্গে শয়ন করিলে মনে কুভাব আসিতে পারে; সুতরাং কোন শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তির সঙ্গে অন্ততঃ একাকী

শক্ত বিছানায় শয়ন করিলে মনে কুভাব আসিতে পারে না। কুভাব হৃদয়ে আসিলে জোর করিয়া উহাকে তাড়াইতে হইবে; কোন সৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে কিংবা ঈশ্বরের নাম উচ্চৈস্বরে আবৃত্তি করিলেও কুভাব মন হইতে তিরোহিত হয়। কিছু সময় নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে মনের কুভাব দূর হয়। একান্ত কুভাব দূর করিতে না পারিলে লোকের নিকট দৌড়াইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য, অথবা কোন শারীরিক ব্যায়াম আরম্ভ করা আবশ্যক। সকল প্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিতে হইবে। আহারাদি সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া আবশ্যক। মাংস, গরম মসলাযুক্ত দ্রব্য, অতিরিক্ত মরিচ প্রভৃতি যে সকল খাদ্য উত্তেজক তাহা ভক্ষণ করিলে রিপু দমন করা কষ্টকর। ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুল-ভাবে প্রার্থনাই কুচিন্তা দমনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। ব্যাকুলভাবে তাঁহার নিকট প্রাণের বেদনা জানাইলে তিনি সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন, দুর্ব্বল সাধককে নব বলে বলীয়ান্ করেন। প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবনের মূল মন্ত্র। ব্যাকুলভাবে একান্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট ক্রন্দন করিলেই সাধক ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

(৬) চঞ্চলতা ও কার্য্যতৎপরতা (**spontaneous activity and deliberate activity.**) :—

চঞ্চলতা ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অন্তরায়। অনেক লোকের প্রকৃতিই এইরূপ তাহারা একস্থানে স্থির থাকিতে পারেন না, স্থির-ভাবে একটি বিষয়ের চিন্তা করিতে পারেন না। তাহারা প্রায়ই একাজ সেকাজে দিন রাত্রি ব্যস্ত থাকেন। একটি বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিলে আর একটি বিষয় আসিয়া মনকে বিক্ষিপ্ত করে। অনেক সময়ে তাহাদের কার্য্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি এমন প্রবল হয় যে হিতাহিত জ্ঞান রহিত হয়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়াই হাতে যে কার্য্য পান, তাহাই তাহারা

করিয়া বসেন। পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখসৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য এত অধীর হইয়াছিল যে তাহাদিগকে ইংরেজরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য পাঠান আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইল। অনেকের কার্য্য করিবার ইচ্ছা এমনই প্রবল। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির ধর্ম্মসাধন করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যে কোন কার্য্যই কেন করা যাক্ না, তাহাতে সমস্ত শক্তি নিয়োগ না করিলে সফলকাম হওয়া যায় না। আবার দিবারাত্র নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলে চিন্তা করিবার অবসর থাকে না, ধ্যান ধারণা করিবার সুযোগ থাকে না। চঞ্চলচিত্ত লোক যখন নির্জ্জনে চিন্তা করিতে বসে তখন ঐ সকল কার্য্যের চিন্তা আসিয়া তাহার মন বিক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। কিন্তু এই চঞ্চলতার আর একটা দিক্ (side) আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভগবান্ কোন বৃত্তিই আমাদের অপকারের জন্য দেন নাই; উপযুক্ত ব্যবহার করিলে সকল বৃত্তি হইতেই সুফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি মানবকে কার্য্য করিবার প্রবল ইচ্ছা দিয়াছেন; মানুষের শারীরিক গঠন ও শক্তি এইরূপই যে তাহাকে স্বতঃই কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এই কার্য্যতৎপরতা অত্যন্ত আবশ্যক। সংসারে মনুষ্যকৃত যে সকল সুন্দর সুন্দর পদার্থ দেখিতেছি তাহা সমস্তই কার্য্যশীলতার ফল। মানুষের কার্য্য করিবার প্রবল স্পৃহা না থাকিলে পৃথিবী অন্যরূপ ধারণ করিত। বিচিত্র সৌধমালা, দ্রুত সংবাদবাহী তাড়িত বার্ত্তাবহ, বিদ্যুৎগামী বাষ্পীয় যান, আকাশগামী ব্যোমযান, কিছুই আমরা দেখিতে পাইতাম না। অধিক কি, কার্য্যতৎপরতার অভাব হইলে আমাদের শরীর রক্ষার উপযোগী দৈনিক আহার্য্যও প্রস্তুত করিতে পারিতাম না। কেবল কর্ত্তব্যজ্ঞানের উপর কার্য্যের ভার দেওয়া হইলে, মানুষ তাহা ভুলিয়া অলস হইয়া থাকিত। কিন্তু ভগবান্ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন কিছু দিয়াছেন যে, তাহার

প্রেরণায় সে কার্য্য না করিয়াই থাকিতে পারে না। কিন্তু এই কার্য্য-পরায়ণতার অপব্যবহারেই চঞ্চলতার উৎপত্তি। মানুষ একস্থানে এক কার্য্যে স্থির থাকিতে চায় না। আমাদের কার্য্যে প্রবল ইচ্ছা থাকিবে, কিন্তু তাই বলিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কার্য্য পরিবর্ত্তন করিলে চলিবে না। সাধক গভীর গবেষণার দ্বারা আপনার কর্ত্তব্য স্থির করিবেন; তৎপর সমস্ত মন, সমস্ত শক্তি সেই কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত রাখিবেন। তিনি সমস্ত বাধা, বিঘ্ন, শারীরিক ও মানসিক ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য-সাধনে প্রাণ মন নিয়োজিত করিবেন। তাহা হইলেই কার্যশীলতার যথোপযুক্ত ব্যবহার করা হইবে।

বাহ্য চঞ্চলতা যেমন মানুষকে এক কার্য্যে স্থির থাকিতে দেয় না সেইরূপ ভিতরের চঞ্চলতা মানুষের মনকে একটি বিষয়ে আবদ্ধ রাখিতে দেয় না। মনঃসংযোগ করিতে না পারিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। যাহারা ধর্ম্ম, রাজনৈতিক কিংবা দার্শনিক জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মনঃসংযোগ অত্যন্ত প্রবল ছিল। নিউটনের বিষয়ে একটি গল্প আছে; তিনি একদিন পাঠাগারে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, সেই সময়ে জনৈক ভদ্রমহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিউটন্‌কে চিন্তামগ্ন দেখিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন; নিউটন্ তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি চুরট খাইতে খাইতে চিন্তা করিতেছেন, আর সেই মহিলার কাপড়ে চুরটের অগ্রভাগ ভাঙ্গিতেছেন। অতঃপর যখন তাঁহার চিন্তা ভঙ্গ হইল তখন সেই মহিলার বস্ত্র কালিমাময় দেখিয়া অবাক্ হইয়া আপনার অভদ্রোচিত ব্যবহারে লজ্জিত ও দুঃখিত হইলেন এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহৎ লোকদিগের মনঃসংযম এইরূপই থাকে। এইরূপ মনঃসংযম থাকে বলিয়াই ধর্ম্মবীরগণ শারীরিক কষ্ট অম্লানবদনে

সহ্য করিতে পারেন—ঈশ্বরে মন রাখিয়া অকাতরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারেন। মনঃসংযোগ ধর্ম্মসাধনে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কার্য্য-তৎপরতার প্রকৃত ভাব এই যে মানুষ অলস থাকিবে না, তাহার শরীর ও মন দিবারাত্র খাটাইবে; কিন্তু তাই বলিয়া মিনিটে মিনিটে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে, চিন্তা হইতে চিন্তান্তরে বিচরণ করিবে না। মন যতবার বিক্ষিপ্ত হইবে ততবারই ফিরাইয়া নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আনিতে হইবে। যখন যে বিষয়টি ধরা যাইবে তখন সেই বিষয়টিতেই মন রাখিতে হইবে; অন্য বিষয় আসিয়া যেন বিরক্তি উৎপাদন করিতে না পারে। ধর্ম্মজগতে মনঃসংযোগের একটি প্রধান উপায় নাম সাধন। যখনই কোন বিশেষ কার্য্য না থাকে তখনই ভগবানের কোন নাম মনে মনে ভক্তির সহিত জপ করিলে ঈশ্বরে মনঃসংযোগ করিবার সুবিধা হয়।

(৭) লোভ (Love of gain.):—

ধর্ম্মজীবনের লোভ একটি প্রধান শত্রু। সংসারে লোলুপ লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। সংসারে অনেক লোকই অর্থ, অর্থ করিয়া বেড়ায়; তাহাদের সমস্ত শক্তি, সমস্ত চিন্তা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নিয়োজিত করে। তাহারা লাভালাভের গণনা দ্বারাই সমস্ত কার্য্য, সমস্ত ঘটনার মূল্য নির্দ্ধারণ করে, যে বিষয়ে যত লাভ সেই বিষয়ই তত আবশ্যকীয় মনে করে; লাভালাভের কথা ব্যতীত আর যে কোন উচ্চ কথা, উচ্চ ভাব আছে, তাহা তাহারা জানে না। বাস্তবিক সংসারে যত প্রকার অনুষ্ঠান আছে তাহার অনেকেরই মূলে অর্থ। অর্থের জন্য মানুষ না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই; জাল, জুয়াচুরী, ডাকাতি সমস্তই অর্থের জন্য মানুষ করিতে পারে। এমন কি, এই অর্থের জন্য মানুষ ভ্রাতৃ হত্যা, পিতৃ হত্যা, পুত্র হত্যা পর্য্যন্ত করিয়া থাকে। মানবের ইহা অতীব শোচনীয় অবস্থা। অর্থ উপার্জ্জন করা অন্যায় নহে।

মানবের ক্ষুধা রহিয়াছে, তৃষ্ণা রহিয়াছে ; এই ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আহারের দরকার এবং তদুপযোগী অর্থের প্রয়োজন। মানুষ শরীর রক্ষার জন্য আহার ও বিশ্রাম করিবে ইহা ভগবানের অভিপ্রায়। সুতরাং শরীর রক্ষার জন্য অর্থ উপার্জ্জনের ইচ্ছা থাকা অত্যন্ত আবশ্যক ; ইহাতে কিছুই দোষ নাই। অন্যথা, মানুষ যদি অর্থ উপার্জ্জনের চিন্তা ও চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে সংসারে দরিদ্রতার মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ইহা ভগবানের ইচ্ছা যে, মানুষ শরীর রক্ষার জন্য যত্ন করিবে, শস্য উৎপাদন করিবে, অন্য উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিবে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি মানব হৃদয়ে লোভ দিয়াছেন, ধন লালসা দিয়াছেন। কিন্তু ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নয় যে মানুষ ধন লাভকেই একমাত্র উদ্দেশ্য করিবে এবং তজ্জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবে। মানুষ বৃত্তিসমূহের যথোপযুক্ত ব্যবহার করে না বলিয়াই কতকগুলি বৃত্তি কু-প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করিবে কেন ? এই জন্য যে, সে শরীর রক্ষা করিয়া, সেই শরীর ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিবে। হায়, হায় ! মানুষ বৃত্তিগুলির অপব্যবহার করিয়া সংসারকে নরকে পরিণত করিতেছে ! প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে হইলে লোভকে সংযত করিতে হইবে। লোভ দমন করিতে হইলে সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করা আবশ্যক। ঈশ্বর লাভ করিব, সত্য লাভ করিব, ইহাই সাধকের লক্ষ্য থাকিবে ; উচ্চ লক্ষ্য না থাকিলে লোভ দমন করিতে পারা যায় না। সাধকের মনে করিতে হইবে আহার বিহার করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে ; ঈশ্বর লাভই লক্ষ্য ; সুতরাং শরীর রক্ষা কেবল ঈশ্বরের পূজা ও প্রিয়কার্য্য সাধনের জন্য। এই ভাবে মানুষ চলিলে লোভ প্রাণে স্থান পায় না। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য অর্থ উপার্জ্জন অত্যন্ত অন্যায় ; শরীর রক্ষার জন্য অর্থ উপার্জ্জন,

এবং ঈশ্বরের কার্য্য করিবার জন্য শরীর। অর্থ উপার্জ্জন লক্ষ্যসাধনের একটি সহায় মাত্র কিন্তু মূল উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং কেবল অর্থ, অর্থ করিয়াই বেড়াইতে হইবে না। জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য যাহা, তাহার ব্যাঘাত করিয়া কখনই অর্থ উপার্জ্জন করিবে না। এই ভাবে চলিলে অথ উপার্জ্জন কিংবা শরীর রক্ষার জন্য অন্যায় উপায় অবলম্বন করার পথ বন্ধ হয়। শরীর রক্ষা ভগবানের ইচ্ছা কিন্তু অন্যায় উপায় অবলম্বন করিয়া শরীর রক্ষাও ভগবানের অভিপ্রেত নহে। যদি চেষ্টা করিয়া কোনরূপে সৎ উপায়ে শরীর রক্ষা করিতে না পারা যায় তবে বরং শরীরপাত করা উচিত তথাপি অন্যায় উপায় অবলম্বন করা বিধেয় নহে। এইভাবে চলিলে লোভের আর স্থান থাকে না। বাস্তবিক স্বার্থ ত্যাগই ধর্ম্ম, লোভ সংযম করাই প্রধান নীতি। এ সংসারে সুখ ভোগ করিতে আসি নাই, আরামে থাকা উদ্দেশ্য নহে; ভগবানের ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। তজ্জন্য শরীর রক্ষা দরকার, তাই শরীর রক্ষা করিতে হইবে। জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিলে কোন কষ্ট হয় না। সংসারের অনিত্যতা চিন্তা করিলে লোভপ্রবৃত্তির দমন হয়। আর একটি উপায় এই যে মানব সাধারণের দুঃখ যন্ত্রণা ও অভাব চিন্তা করিলেও লোভের দমন হইতে পারে। অন্যের দুঃখ দেখিলে নিজের কষ্ট আর থাকে না।

(৮) আমিত্ব ও ব্যক্তিত্ব (**Egoism and individuality.**) :—

আমিত্ব জ্ঞানকে শাস্ত্রকারগণ অজ্ঞানতা প্রসূত বলিয়া মনে করেন; এবং ইহাকে ধর্ম্মজীবনের শত্রু বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। অথচ একটু আমিত্ব জ্ঞান, একটু স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান সকলের মধ্যেই দেখা যায়। ভগবান্ যখন সকল মানুষকে সমান করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, যখন প্রত্যেক মানবকেই তিনি এক একটু বিশেষত্ব দিয়াছেন এবং যাঁহার জীবনের

যেরূপ ব্রত তিনি নিয়োজিত করিয়াছেন তাহাকে তদনুরূপ উপকরণ সহিতই সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, তখন কতক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যের ভাব, ব্যক্তিত্বের ভাব অন্যায় ও অস্বাভাবিক নহে। অবশ্য সকল মানবের মধ্যে মূলতঃ এক অবিনশ্বর আত্মা রহিয়াছেন ; সেই দিক্ দিয়া দর্শন করিলে এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান, এই ভেদজ্ঞান দূর হইয়া যায়। যখন সাধন করিতে করিতে সাধকের সাংসারিক সুখ দুঃখ, হর্ষ বিষাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে না, কেবল একমাত্র তাঁহারই মহিমা, তাঁহারই জ্যোতির প্রতি দৃষ্টি থাকিবে, তখন এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান মন হইতে অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইবে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই এ সত্যটি একটু পরিষ্কার হইবে। এক পরিবারে পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য রহিয়াছে ; সকলেই আপনা লইয়া ব্যস্ত, অন্যের সুখ, দুঃখের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। সেই পরিবারে যদি সকলেরই প্রিয় একমাত্র উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির হঠাৎ সাংঘাতিক ব্যারাম উপস্থিত হয়, তখন কি আর তাহাদের কলহ বিবাদ মনে থাকে? তখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় ঐ রোগীকে কোন রকমে সুস্থ করা ; সেই সাধারণ লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহারা সেই সময়ের জন্য আপনাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ ভুলিয়া যায়। সেইরূপ এই বিচিত্রতা পরিপূর্ণ সংসারে নানা প্রকৃতির মানব রহিয়াছে, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব চিন্তায় মগ্ন ; কিন্তু যখন তাহাদের সেই একের প্রতি লক্ষ্য পড়ে, যখন তাহারা সর্ব্বহৃদয়েস্থিত এক জ্যোতি নিরীক্ষণ করে, তখন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আপনাদের স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া যায় ; এই অবস্থায় আমিত্ব, ব্যক্তিত্ব জ্ঞান একেবারেই থাকে না। কিন্তু সাধারণতঃ সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে আমিত্ব, জ্ঞান আছে। কতক পরিমাণে ইহা থাকা স্বাভাবিক ও উপকারজনক। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার 'কৃষ্ণচরিতের ভূমিকায় একস্থানে

লিখিয়াছেন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে যাহার মত পরিবর্ত্তন না হয় সে হয় দেবতা না হয় পশু। এ স্থলেও বলা যাইতে পারে যাহার স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান নাই, সে হয় দেবতা না হয় পশু। বাস্তবিক অসিদ্ধ অবস্থাতে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞান থাকাই কর্ত্তব্য। আমি একজন মানুষ, পরমেশ্বর আমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন; প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে তিনি স্বয়ং রক্ষা করিতেছেন; এ সংসারে আমার কর্ত্তব্য রহিয়াছে, আমার জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, আমি সংসারের কিছু উন্নতি করিতে পারি, আমার ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি আছে, তাহা খাটাইলে মানুষ হইতে পারি; আমি অন্যের মতে সায় দিবার জন্য আসি নাই, আমারও চিন্তা করিবার অধিকার আছে—ইত্যাকার ভাব থাকা মানবের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ইহা মানবজীবনের উন্নতির সোপান। এই স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানের তিনটি দিক্ আছে: (১) স্বাধীনতার ভাব, (২) আত্মসম্মান বোধ, (৩) আত্ম-প্রসাদ; এই তিনটি ভাব বিকৃত হইয়া (১) ক্ষমতা-প্রিয়তা, (২) অভিমান, অহঙ্কার এবং (৩) যশোলিপ্সার উৎপত্তি করে।

(১) ক্ষমতাপ্রিয়তা ও স্বাধীনতা (**Love of power and love of liberty**):—

ক্ষমতাপ্রিয়তা ধর্ম্ম-সাধনের বিশেষ অন্তরায়; অনেক লোক দেখা যায়, যাহারা অন্যের উপর আধিপত্য করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত, আপনাদের ক্ষমতা দেখাইতে অত্যন্ত উৎসুক। তাহারা যদি সৌভাগ্য-ক্রমে ধন, মান কিম্বা উচ্চ পদের অধিকারী হইল, তবে তাহা অনেক সময়ে অন্যকে অপদস্থ করিবার জন্য নিয়োজিত করে। কিসে অন্যে আমাকে ভয় করিয়া চলিবে, কিসে অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারিব, কিসে আমার হুকুম সকলে মান্য করিয়া চলিবে, এই চিন্তাতে তাহারা

সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। লোকে দুর্ব্বল মনে করিবে এই ভয়ে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহারা অনেক সময়ে ক্ষমা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অনেক সময়ে ইহাদের এরূপও মনে হয় যে যাহারা নিম্নশ্রেণীর লোক, যাহারা দীন দুঃখী, তাহাদের সঙ্গে মিশিলে, এমন কি তাহাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিলে লোকে ক্ষুদ্রচেতা বলিয়া মনে করিবে। উদারতা ছোট লোকের লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। মানবহৃদয়ে স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা মঙ্গলের জন্যই পরমেশ্বর দিয়াছেন। মানুষ অন্য কাহারও মতের অধীন হইয়া ক্রীতদাসের মত চলিবে না; অকুতোভয়ে সে আপনার মত পোষণ করিবে, আপনার মত প্রচার করিবে; অন্যের ভয়ে সে আপনার মত ও বিশ্বাস খর্ব্ব করিয়া চলিবে না; ইহা অতীব সুন্দর ভাব। যাহার স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন ইচ্ছা নাই সে মনুষ্য-নামের যোগ্য নহে। মানব জীবন ধারণ করিয়া অন্যের ক্রীতদাস হইয়া থাকিবে, অন্যের মতে মত দিয়া চলিতে হইবে ইহা বড়ই কষ্টকর! স্বাধীনতাহীন মানবে ও পশুতে বড় তারতম্য নাই। মানুস এই স্বাধীনতাকে অপব্যবহার করিয়া ক্ষমতাপ্রিয়তাতে পরিণত করিয়াছে। কোথায় মানুষ নিজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে এবং সেই পরিমাণে অন্যকেও স্বাধীনতা প্রদান করিবে; তাহা না করিয়া ক্ষমতাপ্রিয়তা দ্বারা পরিচালিত হয়; তাই দেখা যায় সবল দুর্ব্বলের উপর, রাজা প্রজার উপর, জ্ঞানী মুর্খের উপর এবং উচ্চ জাতি নিম্ন জাতির উপর অত্যাচার করিতেছে। হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলিকে বিনষ্ট করিয়া মানুষ উগ্রতা, কঠোরতা অবলম্বন করিতেছে। ধর্ম্মপিপাসু মানব স্বাধীনচিত্ত হইবেন বটে কিন্তু ক্ষমতাপ্রিয়তা একেবারে পরিত্যাগ করিবেন। তিনি ঈশ্বরের আদেশে যাহা সৎ, যাহা সাধু, তাহাই করিবেন, মানবের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিবেন, অন্যের মত

কিংবা ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন না: যেখানে অন্যায়, যেখানে অত্যাচার, তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিবেন; কিন্তু আপনার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে কখনও ব্যস্ত থাকিবেন না। তিনি ঈশ্বরের গৌরব প্রচার করিবেন, আপনার গৌরব নহে। সাধকের মনে রাখা উচিত যে, এ জগতে মানবের নিজের কোন শক্তি নাই, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ইচ্ছা পালনে নিয়োজিত করিতে হইবে; তাহাতে মানবের কিছু গৌরব নাই। যেটুকু ক্ষমতা সাধকের আছে তাহা যেন অন্যের উপকারেই ব্যয়িত হয়, পরপীড়নে নহে। আত্ম-চিন্তা এই বৃত্তি দমনের একটি প্রধান সহায়। যখন চিন্তা করা যায় যে আমার শক্তি কত অল্প, আমি যতই ক্ষমতাশালী হইনা, একগাছি তৃণও সৃষ্টি করিতে পারি না, তখন আর ক্ষমতা দেখাইবার স্পৃহা থাকে না। অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদিগের বিষয় চিন্তা করিলেও নিজের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া শক্তি প্রকাশে অনিচ্ছা জন্মিতে পারে। মানবের ইহাও ভাবা উচিত যে আজ আমি একটু ক্ষমতাশালী হইয়া অন্যের উপর অত্যাচার করিতেছি, কিন্তু আমার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি যদি আমার প্রতি এরূপ উৎপীড়ন করে তবে আমার কিরূপ ভাব হয়। এই সকল চিন্তা করিলে ক্ষমতা প্রিয়তার ভাব সংযত হইতে পারে।

স্বদেশ প্রেমেরও বিকার আছে। আপনার দেশকে ভালবাসা, তার স্বাধীনতা রক্ষা করা, তার জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করাত খুবই ভাল। কিন্তু আপনার দেশের স্বাধীনতা কেবল রক্ষা করিয়াই অনেকেই সন্তুষ্ট নহেন, তাহারা অন্য দেশকে অধীনে রাখিতে চান, অন্য দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া আপনার দেশের আর্থিক উন্নতি করিতে চান। এই ভাবকেই বলে

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism) এই ভাবটি স্বদেশপ্রেম নহে, ইহা অপর দেশের প্রতি বিদ্বেষ। এই ভাব সর্ব্ব প্রকারে বর্জ্জনীয়।

(২) অহঙ্কার ও আত্মসম্মান জ্ঞান (Pride and self-respect.) :—

স্বাধীনতার ভাব বিকৃত হইয়া যেমন ক্ষমতা প্রিয়তাতে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ আত্ম-সম্মানের ভাবও বিকৃত হইয়া অভিমান ও অহঙ্কারের সৃষ্টি করিয়াছে। অহঙ্কার মানব হৃদয়ের একটি প্রধান রিপু। মানুষ, ধন, মান, পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি, শক্তি, ধর্ম্ম এমন কি দীনতার পর্য্যন্ত অহঙ্কার করিয়া থাকে। আত্ম-সম্মান জ্ঞান অতি উচ্চ ভাব। যাহার আত্ম-সম্মান বোধ নাই তাহার মনুষ্যত্বের এখনও বিকাশ হয় নাই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া অহঙ্কার পোষণ করা কাহারও উচিত নহে। মানুষ কিসের অহঙ্কার করিতে পারে? তাহার শক্তি, জ্ঞান কিংবা ধন কত? তাহার ইচ্ছায় কি সম্পন্ন হইয়া থাকে? সে ঈশ্বর প্রদত্ত একটু সামান্য শক্তি লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছে। সে যখন দেখে যে সম্মুখে প্রতি নিয়ত অনন্ত শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে; সেই শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে মানবশক্তিকে নিয়মিত করিতেছে, তখন সে কেমন করিয়া নিজ শক্তির অহঙ্কার করিতে পারে? তাহার জ্ঞান কি? অসীম বিশ্বরাজ্যের সে কি জানে? তাহার প্রেম কত-জন লোককে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছে? তাহার ধন কত তুচ্ছ! তাহার শরীর ক্ষণভঙ্গুর। সে কি বলিয়া অহঙ্কার করিবে? মানব-সমাজের প্রতি তাকাইলেও দেখা যায় যে তাহা অপেক্ষা ধনে, মানে, জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ কত মানব রহিয়াছেন, তবে সে কি লইয়া অহঙ্কার করে? মানুষ এই সকল ভাবে না, তাই তাহার অহঙ্কার হয়। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে অহঙ্কার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। গর্ব্বিত মস্তক লইয়া ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার

নাই। অবশ্য আত্ম-সম্মান জ্ঞান থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। মানব-জীবন ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ বিকাশ; আপনাকে অবজ্ঞা করিলে ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করা হয়। বিশেষতঃ যাহার আপনার প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই তাহার উন্নতি লাভ অসম্ভব। কিন্তু অনেক সময়ে অহঙ্কার আত্মসম্মানের বেশে উপস্থিত হয়, তখন উহাকে চিনিয়া বাহির করা কঠিন ব্যাপার। আত্মদৃষ্টি থাকিলে অহঙ্কার দমিত হয়। মহৎ লোকেরা কত বিনয়ী ছিলেন; চৈতন্যের মত সাধু আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করিতেন; নিউটন্ বলিতেন, আমি অনন্ত জ্ঞান-সমুদ্রের তীরে বসিয়া মাত্র উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি; এই সকল ভাবিলে অহঙ্কার কোথায় চলিয়া যায়। যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা নানা বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদের বিষয় চিন্তা করিলে অহঙ্কার করিবার অবসর থাকে না। ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিবার যাহাদের ইচ্ছা আছে তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) যশোলিপ্সা ও আত্ম-প্রসাদ (**Love of praise and self-contentment.**) :—

আত্ম-প্রসাদ একটি সুন্দর ভাব। মানব যখন একটি মহৎ কার্য্য করে তখন পরমেশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহাকে আত্ম-প্রসাদ রূপ অমূল্য রত্ন দানে পুরস্কৃত করেন। অন্যে সে কার্য্যের বিষয় জানুক আর না জানুক, মানুষ নিজে নিজের কার্য্য জানিয়া সুখী হয়, প্রাণে শান্তি পায়। আত্ম-প্রসাদ না থাকিলে মানব জীবন বড়ই দুঃখের হইত। সংসারে সৎকার্য্য করিতে যাইয়া অনেক সময়ে অপমান, নির্য্যাতন, দুঃখ ও দারিদ্র্যের ভিতরে পতিত হইতে হয়; এই সকল পরীক্ষার মধ্যে আত্ম-প্রসাদ মানব-মনকে প্রফুল্ল রাখে। আত্ম-প্রসাদ প্রাণের মধ্যে ঈশ্বরের হাসি। মানব, বিশ্বাসচক্ষুতে দেখ, তাহা হইলে

আত্ম-প্রসাদের মধ্যে ঈশ্বরের অভয় বাণী শুনিতে পাইবে। মানুষ বিশ্বাসের ভাবে দেখে না তাই তাহারা আত্ম-প্রসাদে তৃপ্ত হয় না, তাই তাহারা অন্যের প্রশংসা লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। যশোলিপ্সা ধর্ম্ম সাধনের একটি প্রধান শত্রু। ইহা মানুষকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। যশোলিপ্সা স্বর্গের দ্বার পর্য্যন্ত মানুষের অনুগমন করে। ইহা যে কত অনিষ্টকর তাহা বলা যায় না। অন্যের প্রশংসা লাভ করিবার জন্য লোক নানা রকম চেষ্টা করে; নিজের মত, নিজের বিশ্বাস বলিদান করিয়া অন্যের মনোরঞ্জনের চেষ্টা পায়। অন্যের প্রশংসা লাভ যখন লক্ষ্য হয় তখন আর কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার থাকে না। যশোলিপ্সা মানুষকে প্রকৃতিস্থ থাকিতে দেয় না। মানুষ ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি দেখাইয়া অন্যের প্রশংসা লাভ করিতে চায়। অনেক সময়ে লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য মানুষ ধর্ম্মের ভাণ করে। যশোলিপ্সা নাই, নিন্দা প্রশংসায় অভিভূত হয় না, এরূপ লোক অতি বিরল। অনেক সময়ে দীনভাব ধারণ করিলে আবার সেই দীনতার জন্যই প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা হয়। এই রিপু হইতে মুক্তি পাইতে হইলে আত্ম-দৃষ্টি অত্যন্ত আবশ্যক; প্রতি মুহূর্ত্তে সাবধানে চলা প্রয়োজন। সাধককে মনে রাখিতে হইবে যে আমি যাহা করি তাহাতে আমার নিজের প্রশংসার কিছুই নাই; পরমেশ্বরের শক্তি লইয়া কার্য্য করিতেছি; যদি কিছু ভাল করিতে পারি তাহা তাঁহারই করুণা, আর মন্দ কার্য্য করিলে আমারই অপরাধ। তিনি প্রশংসা কিংবা নিন্দার বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্য করিবেন না; যাহা সত্য, যাহা ন্যায়, ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া তাহাই করিবেন; তাহা হইলে যশোলিপ্সার হাত কতক পরিমাণে এড়াইতে পারিবেন।

(৯) অনুশীলনপ্রিয়তা (Love of culture) :—

এই বৃত্তিটিকেও রিপুর মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে দেখিয়া অনেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন। বাস্তবিক জ্ঞানালোচনার ইচ্ছা একটি অতি উচ্চ প্রবৃত্তি। জ্ঞানলাভের স্পৃহা না থাকিলে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকে না। জন্মগ্রহণের পর একটু একটু করিয়া যখন জ্ঞানের সঞ্চার হইতে আরম্ভ হয়, তখন হইতে বিশ্বকার্য্য দর্শন করিয়া মানুষের হৃদয়ে বিস্ময় (wonder) ও আশ্চর্য্যের (admiration) আবির্ভাব হয়; এই জগৎ কার্য্যের কারণ জানিবার ইচ্ছা (curiosity) প্রবল হয়। নানা ফুল ফল পরিশোভিত এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যাহার মনে আশ্চর্য্যের ভাব উদিত না হয়, যে ব্যক্তি জগতের কৌশল দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়া কার্য্য কারণ শৃঙ্খলা অনুধ্যান করিতে ব্যস্ত না হয়, সে বাস্তবিকই হতভাগা; সে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ। কারণ-অনুসন্ধিৎসা মানবের প্রকৃতিগত বৃত্তি। 'কি এবং কেন' এই প্রশ্ন কাহাকেও শিখাইতে হয় না; উহা স্বতঃই অন্তরে উপস্থিত হয়। ইহার মূলে সত্যনিষ্ঠা। সত্য লাভ করিবার ইচ্ছা, জ্ঞানার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা মানবের স্বভাবসিদ্ধ— উপার্জ্জিত নহে। মানবের সৌভাগ্য যে, ভগবান্ তাঁহার গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটিত করিবার ক্ষমতা কতক পরিমাণে তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং জ্ঞানপিপাসা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান হইতেই মানুষ ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানে উপস্থিত হয়। ভগবানের কার্য্য কলাপের জ্ঞান কি তাঁহার জ্ঞানের সহায় নহে? ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি তাঁহার প্রাকৃতিক ও নৈতিক নিয়মগুলি কতক পরিমাণে অবগত হওয়া আবশ্যক নহে? তাঁহার তত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে কি জ্ঞানকে

পরিত্যাগ করা যায়? যজ্ঞেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যেমন যজ্ঞ করা অসম্ভব, সেইরূপ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানস্বরূপকে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে সত্যনিষ্ঠা আবশ্যক, জ্ঞান আবশ্যক।

কিন্তু এই জ্ঞানানুশীলনেরও অপব্যবহার আছে। অনুশীলনের উদ্দেশ্য সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের মহিমা অবগত হওয়া, ব্রহ্মদর্শন লাভ করা। অনেকে এই মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান এবং মাত্র কৌতূহল দ্বারা পরিচালিত হইয়া জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত হন। লোকের যেমন নানা বিষয়ে ঝোঁক থাকে, সেইরূপ অনেকের জ্ঞানালোচনাও একটা ঝোঁক হইয়া দাঁড়ায়। অনেককে দেখা যায় যে তাঁহারা জ্ঞানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান। আহার যে শরীর রক্ষার জন্য প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া যাইয়া অনেকে তৃপ্তিকর বলিয়া সাধ্যাতিরিক্ত ভোজন করেন এবং তদ্দ্বারা নানা প্রকার ব্যাধি আহ্বান করিয়া আনেন। ভোজন করিবার সময় তাঁহাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য মনে থাকে না; বাঁচিবার জন্য খাওয়া, এই সত্য না বুঝিয়া তাঁহারা যেন খাইবার জন্যই বাঁচেন। সেইরূপ অনেক লোক আছেন যাঁহারা জ্ঞানালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভুলিয়া যান; তাঁহারা ঈশ্বর লাভ, সত্য লাভকে লক্ষ্য না করিয়া কোন রকম স্বার্থসিদ্ধি কিংবা আরামই জ্ঞানের উদ্দেশ্য স্থির করেন। তাঁহারা যত পান ততই বোঝাই করেন, লক্ষ্যের দিকে কতদূর পৌঁছিলেন তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন না। বর্ত্তমান সময়ে স্কুল কলেজে অনেক যুবক জ্ঞানালোচনা করিয়া থাকেন; ইহার মধ্যে প্রকৃত সত্য লাভ করিয়া জীবনকে ধন্য করিবেন, ঈশ্বরের মহিমা অবগত হইবেন, ইহা কয় জনের লক্ষ্য থাকে? কিরূপে ভাল পাশ করিয়া উচ্চ বেতনে কার্য্য করিতে পারিব তাহাই অনেকের জীবনের উদ্দেশ্য। তাই দেখা যায় সংসারে

প্রবেশ করিয়াই অনেকে জ্ঞানালোচনা পরিত্যাগ করেন। আবার যাঁহারা তখনও জ্ঞানালোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন তাঁহাদেরও অনেকেই ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করেন না। তাই দেখা যায়, অনেকে জ্ঞানালোচনা করিতে যাইয়া জীবনের অনেক অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করেন—মানবজীবনের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ান। অসীম রহস্যপূর্ণ জগতের দুই একটি নিয়ম অবগত হইয়া তাঁহারা বিশ্ববিধাতাকে অগ্রাহ্য করিয়া বসেন। অতি সামান্য জ্ঞানের গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনেক সময়ে তাঁহারা বলেন যে প্রাকৃতিক নিয়মগুলিতে শৃঙ্খলা নাই ; আমি হইলে ইহা অপেক্ষা সুনিয়মপূর্ণ জগৎ রচনা করিতে পারিতাম। জ্ঞানের বিকারে গর্ব্ব উপস্থিত হইয়া অনেক সময়ে মানুষকে নাস্তিক করিয়া তোলে।

আবার অনেক সময়ে জ্ঞান মানবের কমনীয় বৃত্তিগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে, প্রেম, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি হৃদয়ের সুকোমল ভাবগুলিকে শুষ্ক করিয়া তোলে। একটি গল্প আছে যে, একজন রসায়ন শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের কোন শোকজনক ব্যাপার সংঘটিত হয় ; পণ্ডিতের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী আসিয়া তাঁহার নিকট কাঁদিয়া পড়িল, তখন পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে সান্ত্বনা না দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আমি তোমার চক্ষের জল বিশ্লেসণ করিতে পারি ; উহাতে কতক পরিমাণ অম্লজান, কতক জলজান, কতক লবণ রহিয়াছে। চক্ষুর জল আর কিছুই নয়, উহা কয়েকটি মৌলিক পদার্থের সমষ্টি মাত্র।" তিনি চক্ষের জলের মধ্যে ইহা ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। এই গল্পটি অতি রঞ্জিত হইতে পারে ; কিন্তু একমাত্র জ্ঞানমার্গ অবলম্বনকারী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে অন্যের সুখ দুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইতে পারেন না। তাঁহাদের হৃদয়ের স্নেহ মমতা যে হ্রাস প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অনেক সময়ে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত তাঁহার যন্ত্রাদি লইয়া বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেছেন, অথচ তাঁহার সম্মুখে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হইয়া লোক ছট্‌ফট্ করিতেছে, তিনি তাহা দেখিয়াও দেখেন না। রাস্তায় হয়ত একজন লোক মারা পড়িতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তিনি উহা করিতে অগ্রসর হন না। ইহা অতিরঞ্জন নহে; এরূপ ঘটনা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। জীবিত জন্তু আস্তে আস্তে বধ করিয়া বৈজ্ঞানিক আলোচনার নৃশংস প্রথা এই সভ্য জগতেও বর্ত্তমান্ রহিয়াছে। একটি কুকুরের মস্তিষ্ক তুলিয়া ফেলা হইল; বৈজ্ঞানিক তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন; কুকুরটা ছট্‌ফট্ করিতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন। যে কোন কথা বলিতে পারে না, যাহার প্রতিহিংসা লইবার শক্তি নাই, তাহার জীবন লইয়া এরূপ ক্রীড়া করা সুসভ্য মানবের পক্ষে কলঙ্কের বিষয় বলিতে হইবে। আমাদের যাহাতে কষ্ট হয় বৈজ্ঞানিকগণ তাহা অসঙ্কোচে করিয়া থাকেন। এইরূপে অনেকের সুকোমল বৃত্তিগুলি হীনপ্রভ হইয়া যায়। ইহাকেই বলিব জ্ঞানের বিকার।

মানবজীবনের একটি অবস্থা আছে যখন মানব ব্রহ্মে স্থিত হইয়া "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" হন; যখন তিনি ব্রহ্মসহবাস সুখে সুখী হইয়া তাঁহার আদেশে সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন, সুখেও মত্ত হন না, দুঃখেও অভিভূত হন না। এ অবস্থায় তাঁহার যে প্রেম, দয়া সহানুভূতির অভাব হয় তাহা নহে, বরং উহা আরও ঘনীভূত আকার ধারণ করে; বাহিরের উদ্বেলতা, উচ্ছ্বাসের হ্রাস হয় বটে কিন্তু গভীরতার বৃদ্ধি হয়। তখন অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত প্রেমের প্রখর স্রোত অন্তরে

অন্তরে নীরবে প্রবাহিত হয়। তখন বিশ্বজনীন প্রেম ও দয়াতে হৃদয় পরিপ্লুত থাকে, লোকের পাপ তাপ, শোক, দুঃখ বিমোচনের ইচ্ছা ও চেষ্টা হয়; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, কারণ ঈশ্বরেই তাঁহার নির্ভর। তাহা দেখিয়া স্থূলদর্শী মানবগণ মনে করে যে তাঁহার বুঝি প্রেম ও দয়া নাই; ইহা অত্যন্ত ভ্রম। এ অবস্থা ত সহজে হয় না। তুমি আমি, যাহাদের একটুও সাধন হয় নাই, আমরা যদি সুখ দুঃখের অতীত হই তবে তাহার অর্থ এই যে আমরা নির্ম্মম হইয়াছি, আমাদের পতন হইয়াছে। প্রীতি, দয়া, সহানুভূতি, ইহা অতি উৎকৃষ্ট বৃত্তি; এই সকল বৃত্তি যাহাতে সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয়, সাধকের তাহাই কর্ত্তব্য; প্রেমশূন্য জীবনে ধর্ম্মের স্থান নাই। তবে একটি কথা আছে, অনেকে এই প্রীতি দয়া ও সহানুভূতির বশবর্ত্তী হইয়া সত্য ও ন্যায়ের অবমাননা করেন, অপাত্রেও অন্যায়রূপে দয়া প্রদর্শন করিয়া দেশের অমঙ্গল উৎপাদন করেন। যেখানে কঠোরতা অবলম্বন করিলে তত্তৎ ব্যক্তিদের বাস্তবিকই উপকার হইত তাহা না করিয়া সেখানেও কোমল ব্যবহার করেন, ইহাকে আমরা দুর্ব্বলতা বলিব। প্রেম, দয়া, সহানুভূতির বাহ্য বিকাশ জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত না হইলে কুফল উৎপন্ন হয়। এখানে জ্ঞানের অত্যন্ত প্রয়োজন; কিন্তু জ্ঞান যদি ঐ সুন্দর বৃত্তিগুলিকে একেবারে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেখানে জ্ঞানকে খর্ব্ব করিতে হইবে। প্রকৃত জ্ঞান সমস্ত বৃত্তির যথোপযুক্ত স্ফূরণের সহায় হইবে। মানবজীবনের লক্ষ্য স্থির রাখিয়া জ্ঞানালোচনা করিলে কোন প্রকার কুফল উৎপন্ন হইতে পারে না।

(১০) ভাবপ্রবণতা ও প্রেম, ভক্তি (Sentimentalism and Love and Reverence):—

ভাবপ্রবণতা লোককে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে দেয় না; আপাতঃ

মনোরম যাহা, বর্ত্তমান সুখকর যাহা তাহাতেই মানব-মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়া যাহা প্রকৃত সুন্দর, প্রকৃত সুখপ্রদ, চিরশান্তি ও আরামের নিধান তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে দেয় না। এই ভাবপ্রবণতার আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে ইহা একটি অতি সুন্দর প্রবৃত্তির বিকার। যাহা না থাকিলে জগৎ শুষ্ক, মরুভূমিপ্রায় হইয়া যাইত, যাহা মানবসমাজকে এক সুখবন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই প্রেম, সেই প্রীতি বিকৃত হইয়া ভাবপ্রবণতার আকার ধারণ করে। প্রেম মানবহৃদয়ের অতি মহৎ বৃত্তি। বাহ্য জগতে যেমন মাধ্যাকর্ষণ সমস্ত পদার্থকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, কোন গ্রহ কিংবা উপগ্রহ আপনার কক্ষভ্রষ্ট হইয়া যাইতে পারে না, সকলেই মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হইয়া আপনার পথে অবিশ্রান্ত গতিতে ভ্রাম্যমান হইতেছে; সেইরূপ মানবসমাজে প্রেমই সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে। প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, মানবসমাজ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, মানুষ পশুর আকার ধারণ করিবে, পরস্পর পরস্পরের রক্তে ধরা কলঙ্কিত করিবে। প্রেম জগৎকে সৌন্দর্য্যশালী করিয়াছে; প্রেম আছে বলিয়াই মানুষ এই শোক তাপময় সংসারে সুখ ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতেছে। প্রেমেই মানবজীবন মধুময় হইয়াছে; প্রেমই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিয়া রাখিতেছে। প্রেমের মহিমা কি বর্ণনা করিব; কবিশ্রেষ্ঠ বাইরণ্ প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

"Yes, Love, indeed, a light from Heaven,
A spark of that immortal fire;
With angles shared, by Allah given,
To lift from earth our low desires;

Devotion wafts the mind above,

But Heaven itself descends in love."

"প্রেম বাস্তবিকই স্বর্গীয় আলোক; ইহা সেই অবিনশ্বর অগ্নির কণামাত্র। আমাদের নীচ বাসনাসমূহকে পার্থিব বিষয় হইতে উন্নীত করিবার জন্য দেবদূতগণের ভোগ্য এই প্রেম ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। আরাধনা মনকে উর্দ্ধে উন্নীত করে, কিন্তু প্রেমে ঈশ্বর স্বয়ংই মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করেন।"

একটি ব্রহ্ম সঙ্গীতে প্রেমের মহিমা এইরূপ বর্ণিত আছে :—

"অপূর্ব্ব প্রেমের রীতি কে বাখানে তায়
বলিতে রসনা হারে বল্গা নাহি যায়।
হৃদয়ে পশিলে সে প্রেম মৃত প্রাণ জাগে,
পরশে হরষ কত সুধা সম লাগে।
মরমে রাখিলে সে প্রেম কুবাসনা হীন,
নয়নে রাখিলে সে প্রেম দৃষ্টি হয় নবীন।
শ্রুতি যুগে রাখ সে প্রেম, নাম গুণ গানে
মধুর আনন্দ রস উথলিবে প্রাণে।
রসনাতে রাখ সে প্রেম নাম সঙ্কীর্ত্তনে
ডুবিবে সে প্রেমামৃত রস আস্বাদনে।
সে প্রেম জানিও রে ভাই সর্ব্ব রত্ন সার,
তার কাছে ধন মান সকলই অসার।"

প্রেমের স্বরূপ বর্ণনার অতীত; উহা অতীব মধুর। সকল দেশে, সকল শাস্ত্রে প্রেমের মহিমা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রেম বিকৃত হইয়া ভাবপ্রবণতা উৎপাদন করে এবং সংসারে অনেক অনর্থ সংঘটন করে। প্রেম নানা ব্যক্তির প্রতি প্রযুজ্য হইয়া নানা ভাব ধারণ

করিয়াছে; ক্রমে ক্রমে সেই সকল বর্ণনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ প্রেমকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; (১) আপনার প্রতি প্রেম, (২) অপরের প্রতি প্রেম।

(১) আত্ম-প্রেম (Self love) :—

সকলেই আপনাকে অত্যন্ত ভালবাসে; ইহা পরমেশ্বরের বিধান। পরমেশ্বরের ইচ্ছা যে, মানুষ আপনার উন্নতিবিধান করিবে, আপনার শরীর রক্ষা করিবে, আপনার মানসিক ও নৈতিক উৎকর্ষ সাধন করিবে, এই উদ্দেশ্যে তিনি মানুষকে আত্ম-প্রেম দিয়াছেন। মানুষের আপনার প্রতি ভালবাসা না থাকিলে আত্মরক্ষার চেষ্টা থাকিত না, আত্মোন্নতি বিধানের ইচ্ছা থাকিত না। কিন্তু মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া নিজের উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতির বিধান করে। ভালবাসার লক্ষণ এই যে, প্রেমিক ব্যক্তি প্রিয়জনের প্রকৃত মঙ্গল কামনা করে। মানব-আত্মার প্রকৃত মঙ্গল কি? মানবজীবনের উদ্দেশ্য ব্রহ্মলাভ ও তাঁহার আদেশ পালন। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সংসাধনে সহায়তাই প্রকৃত মঙ্গলসাধন। শরীর রক্ষা ভগবানের ইচ্ছা; কারণ শরীর সুরক্ষিত হইলে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের আদেশ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারে। তাই শরীরের প্রতি পরমেশ্বর আমাদের একটা প্রেম দিয়াছেন। মানসিক উন্নতিও ভগবানের ইচ্ছা; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহার প্রকৃতি জানিবার সুবিধা হইবে, তাঁহার নিত্যসহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভ করিবার পথ পরিষ্কার হইবে। কিন্তু মানব লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শারীরিক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানকেই জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে; তাহার যত্ন, চেষ্টা, জ্ঞানালোচনা সকলেরই উদ্দেশ্য কেবল ঐহিক সুখ সাধন। শরীরের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষ প্রকৃত তত্ত্ব হারাইয়া ফেলে; এবং আপনার প্রকৃত মঙ্গল ভুলিয়া যাইয়া কেবল বাহিরের ব্যাপারে

লিপ্ত থাকে। ইহাই আত্ম-প্রীতির বিকৃত অবস্থা। সংসারে অসংখ্য নরনারী এই মোহবিকারে নিদ্রিত হইয়া আপনার মঙ্গল চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছে; "Eat, drink and be merry"—"খাও, দাও, মজা কর" ইহাকেই জীবনের মূলমন্ত্র স্থির করিয়াছে। এই মোহ-বিকারগ্রস্থ নরনারীকে সংসারের অনিত্যতা বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। মদিরা পানে বিভোর হইয়া মানুষ যেমন কল্পিত সুখ অনুভব করে, সেইরূপ ইহারাও শরীরের মোহে মুগ্ধ হইয়া নিজের প্রকৃত মঙ্গল যাহা, তাহার পথে কণ্টক রোপণ করে। কেবল তাহা নহে, এই শরীর রক্ষার জন্য, শারীরিক সুখ লাভের জন্য, সংসারে পদ, মান প্রাপ্তির জন্য কত প্রকার গর্হিত আচরণ করে; কত দীন দুঃখীর প্রতি অত্যাচার করে, কত অসহায়া বিধবার অর্থ হরণ করে, কত নর শোণিতে ধরা রঞ্জিত করে। এই জন্যই বিশ্ববিধাতার এই পবিত্র সংসার মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তির আগার হইয়াছে। মানুষ যদি নিজের মঙ্গল বুঝিত, নিজের জীবনের লক্ষ্যের প্রতি যদি তাহার দৃষ্টি থাকিত, তবে সংসার নূতন ভাব ধারণ করিত, প্রেম, পবিত্রতা প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমগুলি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে জগৎ বিমোহিত করিত। মোহাচ্ছন্ন মানবকে তাহার প্রকৃত মঙ্গল, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রকৃত জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হইলে এই আত্ম-প্রীতি উৎকৃষ্ট ফল প্রসব করিতে পারে, জগৎ মধুরতর হইতে পারে, মানব দেবতা হইতে পারে, পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইতে পারে।

(১) অপরের প্রতি প্রেম (Altruistic feelings.):—

মানুষের যেমন প্রকৃতিগতই নিজের প্রতি প্রেম আছে, আপনার উন্নতির ইচ্ছা আছে, সেইরূপ স্বভাবতঃই মানুষ অপরকেও ভালবাসে।

মানুষ একাকী থাকিতে পারে না, তাই মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহারা মনে করেন আত্ম-প্রীতিই মানবের একমাত্র বৃত্তি; সেই আত্ম-প্রীতি, সেই স্বার্থপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ দলবদ্ধ হয়, সমাজ সংগঠন করে। আপনার সুখের জন্যই বিবাহ বন্ধন। বর্ত্তমানে যে স্বার্থ ও পরার্থ (**Egoism and Altruism**) মিশ্রিত সুচারু সামাজিক নিয়ম, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা, তাহার মূলে শুধুই স্বার্থ। পরার্থ না হইলে স্বার্থ সম্যক্ সিদ্ধ হয় না তাই পরার্থেরও বন্দোবস্ত রহিয়াছে। এই শ্রেণীর দার্শনিকগণও পরিশেষে পরার্থকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং পরার্থই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন সুখ অন্বেষণ করিলে সুখ পাওয়া যায় না; সুখ পাইতে হইলে আত্মসুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পরার্থের প্রতি মনোনিবেশ করিতে হইবে। স্বার্থ প্রবৃত্তি হইতে কিরূপে পরার্থে উপনীত হওয়া যায় এবং কিরূপেই বা পরার্থই পরিশেষে জীবনের লক্ষ্য হয় তাহা তাঁহারা সম্যক্‌রূপে প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, মানবের আদিম অবস্থায় স্বার্থ, আত্ম-প্রীতিই যে একমাত্র বৃত্তি ছিল এরূপ আমাদের মনে হয় না। আত্ম-প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে অপরের প্রতি স্বাভাবিক প্রীতি, স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে পরার্থও মানবের আদিম ও মৌলিক বৃত্তি। এই পরার্থ বৃত্তি, অপরের প্রতি প্রেম আছে বলিয়াই জগৎ সুখের হইয়াছে, পরস্পর পরস্পরের উন্নতি কামনা করিতেছে, পরস্পর পরস্পরের জন্য আপনার স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতেছে, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন, রোগীর শুশ্রূষা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, পাপীর প্রতি করুণা দ্বারা এই পাপ তাপ পূর্ণ সংসার স্বর্গের ছবি প্রদর্শন করিতেছে। পরার্থেই সংসারে সুখ; পর-প্রেমই সংসারের লবণ। এই

প্রেম নানা ভাবে মানব হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। ব্রাহ্ম কবি গাহিয়াছেন, "তোমারই প্রেম হইয়ে শতধা, বিরাজয়ে সতীর প্রেমে, জননী-হৃদয়ে করে বসতি।" বাস্তবিকই একই প্রেম নানা ভাবে নানা হৃদয়ে কার্য্য করে। এই অপরের প্রতি প্রেমকে (১) স্নেহ, (২) প্রণয়, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) স্বদেশ প্রেম, (৫) দয়া, (৬) বিশ্বজনীন মৈত্রী ও (৭) ভক্তি এই সপ্ত ভাগে বিভক্ত করা যাইতেছে।

(১) স্নেহ (Filial affection) :—

সম্পর্কে ও বয়সে যাহারা নিম্ন তাহাদের প্রতি যে প্রেম তাহাকেই স্নেহ বলা যায়। স্নেহের মধ্যে একটু কর্ত্তৃত্ব, একটু আধিপত্যের ভাব আছে; ইহার মধ্যে সর্ব্বদাই উচ্চ ও নিম্নের ভাব রহিয়াছে। স্নেহ যত দিবার জন্য ব্যস্ত হয় পাইবার জন্য তত নহে; সুতরাং ইহার মধ্যে ঈর্ষ্যা (Jealousy) আসিতে পারে না। যত প্রকার স্নেহের বস্তু আছে তন্মধ্যে পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। পুত্রের মুখারবিন্দ দর্শনে পিতার কত আনন্দ, কত সুখ! পুত্রের উন্নতির জন্য পিতার কত যত্ন, কত চেষ্টা! পিতামাতা পুত্রের ভাবী মঙ্গলের জন্য কত স্বার্থ ত্যাগ করেন, কত কষ্ট সহ্য করেন! রোগ হইলে তাঁহারা অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া সন্তানের শুশ্রূষা করেন। জগতে পিতৃস্নেহ, মাতৃস্নেহ অতুলনীয়; বাস্তবিক পিতামাতা সাক্ষাৎ দেবতা। পিতৃমাতৃস্নেহ বিধাতার বিচিত্র বিধান, জগতে অপূর্ব্ব দৃশ্য। কিন্তু এই স্নেহের অপব্যবহারে অনেক অনিষ্ট উৎপাদিত হয়। স্বার্থ মিশ্রিত হইলে অতি সুন্দর বৃত্তিও নষ্ট হইয়া যায়; স্নেহস্বরূপিণী জননীও অনেক সময়ে স্বার্থপরবশ হইয়া প্রাণের পুতলী পুত্রকে ইহলোক হইতে চিরবিদায় দেন, ইহার দৃষ্টান্ত সংসারে নিতান্ত বিরল নহে। স্বার্থপরতাতে কিরূপ অনিষ্ট সংঘটিত হইতে পারে তাহা আত্ম-প্রেম বলিবার সময়েই বলা হইয়াছে, সে বিষয়ে পুনরুল্লেখের

আবশ্যকতা নাই। আর একটি দিক্ আছে যাহাতে বিশুদ্ধ স্নেহকে বিকৃত করিয়া তোলে, এবং পরিণামে অনিষ্ট ফলের সূত্রপাত করে। অনেক পিতা মাতা সন্তানগণকে এত অতিরিক্ত ভালবাসা দেখাইয়া থাকেন যে, তাহাদের দোষ আর চক্ষে পড়ে না; তাহারা সৎপথে চলিল কি অসৎপথে চলিল, লেখাপড়া নিয়মিতরূপ করিল কি না করিল, তাহার প্রতি তাঁহারা দৃষ্টি রাখেন না। কিসে তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে তৎপ্রতিই দিন রাত্রি লক্ষ্য রাখেন। সন্তানের বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে তাঁহাদের ক্রোধ হয়। এই প্রকার ভাবকে আমরা স্নেহের বিকার অথবা মোহ বলিব। বাস্তবিক এস্থলে পিতা মাতা সন্তানের প্রকৃত মঙ্গল ভুলিয়া যাইয়া তাহাদের মনোরঞ্জনের প্রতিই দৃষ্টি রাখিতেছেন। তাঁহারা ভাবেন না যে অনেক সময়ে কঠোর শাসনই প্রকৃত স্নেহের পরিচায়ক। একটা ফোঁড়া হইলে যেমন চিকিৎসকের উচিত যে রোগীর মঙ্গলের জন্য, তাহার কষ্টের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উহাতে অস্ত্র প্রয়োগ করেন; সেইরূপ সন্তানের কোনরূপ অন্যায়, পাপ-ব্যাধি দেখিলেই পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতির সময়োচিত কঠোর কিংবা কোমল ব্যবহার দ্বারা তাহার সংশোধন করা উচিত। যিনি এরূপ করিতে না পারেন তিনি মোহে অন্ধ হইয়াছেন; তাঁহার স্নেহ বিকৃত এইরূপ স্নেহে সন্তানের মৃত্যুর পথ পরিষ্কার হয়। জ্ঞানের অভাবেই হইয়াছে। স্নেহের এরূপ বিকার হইয়া থাকে।

(২) প্রণয় (love, conjugal love):—সমবয়স্ক লোকদিগের মধ্যে যে প্রেম তাহাই এখানে প্রণয় শব্দে বাচ্য হইল। সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যেই স্নেহের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক রহিয়াছে। কিন্তু প্রণয় ভিন্ন রক্ত বিশিষ্ট, বিভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যেই অনেক সময়ে দেখা যায়। স্নেহে আর প্রণয়ে একটু

পার্থক্য আছে; সে পার্থক্য সহজেই অনুভব করা যায়। মানব যখন যৌবনে পদার্পণ করিতে থাকে, যখন একটি একটি করিয়া তাহার হৃদয়ের সুকোমল বৃত্তিগুলি প্রস্ফুটিত হয়, তখনই তাহার মনে প্রণয়ের সঞ্চার হয়, তখনই সে সমবয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই প্রণয় কেবল পুরুষে পুরুষে কিংবা স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে আবদ্ধ থাকে না। পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যেই প্রণয় বিশেষভাবে বিকশিত হইতে দেখা যায়। প্রণয়ের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে; একটু মত্ততা আছে, একটু কি যেন ভাব আছে, যাহা স্নেহ কিংবা ভক্তির মধ্যে দেখা যায় না। প্রণয়ী প্রণয়ীর সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়, তাহার সঙ্গে এক হইয়া যাইতে ইচ্ছুক হয়। প্রণয়ী প্রণয়ীর জন্য আপনার সুখ, স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে পারে, সংসারে ইহা অতি পবিত্র দৃশ্য। কিন্তু অনেক সময়ে প্রণয়িগণ আপনাদের কর্ত্তব্য ভুলিয়া কেবল পরস্পরের সঙ্গলাভের জন্যই ব্যাকুল থাকে। আত্মায় আত্মায়ই প্রকৃত প্রেম, প্রকৃত মিলন, তাহা ভুলিয়া যাইয়া শরীরকেই ভালবাসার একমাত্র জিনিস মনে করে। পরস্পরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন প্রণয়ের অন্যতম উদ্দেশ্য; তাহা লক্ষ্য না করিয়া অনেক সময়ে পরস্পরের অবনতি সাধন করে। তাই দেখা যায় যুবক যুবতীর মধ্যে প্রণয় মধুর ও পবিত্র না হইয়া ঘৃণনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যুবক হৃদয়ে স্বতঃই প্রেম উদ্বেলিত হয়; ইহাকে রুদ্ধ করা যায় না; রুদ্ধ করা আমাদের অভিপ্রায়ও নহে। কিন্তু সাময়িক শারীরিক সুখকেই প্রেমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য করিয়া প্রেমের যে অপব্যবহার হইতেছে, তাহা দর্শন করিয়া কাহার হৃদয় না কাঁদিয়া উঠে? যাহা পবিত্র, যাহা মধুর, যাহা শোক তাপময় জীবনে সুখের স্বপ্ন, তাহাকে দুর্গন্ধযুক্ত হইতে দেখিলে কাহার প্রাণে না কঠিন আঘাত লাগে? হায়, হায়!

মোহে মত্ত নরনারী প্রেমকে কলুষিত করিতেছে, স্বর্গের ফুলকে নরকে পচাইতেছে। ইহা দেখিয়া আর প্রেম, প্রণয়, ভালবাসার কথা বলিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল তাহা নহে, নিঃস্বার্থতাই যাহার প্রকৃতি, আত্মোৎসর্গই যাহার ধর্ম্ম, সেই প্রেমকে মানুষ স্বার্থসাধনে পরিণত করিতেছে! প্রেমে অকৃতজ্ঞতা, স্বার্থান্ধতা, কপটতা দর্শন করিয়া অনেক সাধু ব্যক্তির হৃদয়ও সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়।

এই যে প্রণয়ের ভাব যাহা যুবক যুবতীগণের মনে আধিপত্য করিতেছে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ দাম্পত্য প্রেমেই দেখিতে পাওয়া যায়। দাম্পত্য প্রেম ভগবানের বিচিত্র বিধান। দুইটী হৃদয় নদী কোন অজ্ঞাত প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া আপনা আপনি ক্রীড়া করিতেছিল, আজ তাহারা কোন অজ্ঞাত শক্তিবলে একত্র মিলিত হইয়া তরঙ্গ তুলিয়া নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম পূর্ব্বক নানা দেশ জনপদ উর্ব্বরা করিয়া অনন্ত সাগর পথে চলিল; এ দৃশ্য কি সুন্দর নহে? দম্পতি যুগল প্রণয়-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের পথে চলিবে; চলিতে চলিতে যখন পাপ, তাপ, দুঃখ, যন্ত্রণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িবে, তখন পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিবে, ইহা কি বিবাহের প্রধান লক্ষ্য নহে? দম্পতিগণের পরস্পরের সহিত কিরূপ গভীর সম্বন্ধ, কিরূপ ভাবে সংসারে তাঁহাদের চলিতে হইবে তাহা নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীত দুইটিতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়ঃ—

"তুমি হে প্রেমের রবি আলো করি চরাচর,
যত কর বিতরণ অক্ষয় তোমার কর।
দুজনের আঁখি পরে, তুমি থাক আলো করে,
তা হ'লে আঁধারে আর বলহে কিসের ডর?
তোমারে হারায় যদি, দুজনে হারাবে দোঁহে,
দুজনে কাঁদিবে বসি অন্ধ হয়ে ঘন মোহে;

এমনি আঁধার হবে পাশাপাশি বসে রবে,
তবুও দোহার মুখ চিনিবে না পরস্পরে।
দেখ প্রভু চিরদিন, আঁখি পরে থেক জেগে,
তোমারে ঢাকে না যেন সংসারের মন মেঘে ;
তোমারি আলোকে বসি, উজল আনন শশী
উভয়ে উভয়ে হেরে পুলকিত কলেবর।”

আর একটি সঙ্গীত এই ঃ—

“দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায় ?
সম্মুখে রয়েছ তার, তুমি প্রেম পারাবার,
তোমার অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুইজনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুইজনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাযাণ পর্ব্বত কত,
দুই চ’লে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুঃখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশাবে তোমার পায়”।

এই ভাব কি মধুর, কি সুন্দর ! মানুষ তাহা ভুলিয়া যাইয়া দাম্পত্য সম্পর্ককে সাংসারিকতায় ডুবাইয়াছে, পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপায়ে পরিণত করিয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জীববৃদ্ধি করা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত নহে। ভগবানের আদেশ জানিয়া পবিত্র চিত্তে, সংযতভাবে জীবপ্রবাহ বর্দ্ধিত করা ধর্ম্ম। বিবাহিত জীবনের

ইহা একটি কর্ত্তব্য। কিন্তু কুপ্রবৃত্তির পরিচালনা করা বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। মানুষ প্রণয়কে অপবিত্র করিয়াছে, জগৎকে পাপের আগার করিয়া তুলিয়াছে। শরীরের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষ আত্মাকে ভুলিয়াছে; তাই প্রণয়ে কীট, ভালবাসায় গরল, প্রেমে কলঙ্ক দেখা যাইতেছে।

(৩) শ্রদ্ধা (respect):—গুরুজনের প্রতি যে প্রেমের বিকাশ তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে। ইহা ভক্তিরই অন্তর্গত; তবে সাধুগণের প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি যে প্রেম তাহাকেই আমরা ভক্তি নামে অভিহিত করিলাম। শ্রদ্ধার ভিতরে প্রেম, সম্মান, ভয় ও বাধ্যতার ভাব আছে, এই সকল ভাব একত্র হইয়াই শ্রদ্ধার উৎপত্তি করিয়াছে। যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ, সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা জ্ঞানে, পদে শ্রেষ্ঠতর তাঁহারাও শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিগণের মধ্যে পিতা মাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুশাস্ত্রে পিতামাতাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলা হইয়াছে। পিতামাতার প্রতি যে প্রেম, তাহা শ্রদ্ধা না হইয়া ভক্তি নামেও অভিহিত হইতে পারে। ইহ সংসারে পিতামাতার তুল্য শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র কেহ নাই। মানব সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই পিতামাতার কত অনুগ্রহ লাভ করে। জন্মাবধি তাঁহারা সন্তানের জন্য কত কষ্ট সহ্য করেন তাহা বর্ণনা করা যায় না। যাঁহারা শিক্ষা দান করিয়া অজ্ঞান অন্ধকার দূর করেন তাঁহারাও পূজনীয়। সর্ব্বপ্রযত্নে গুরুজনদিগকে সুখী করা, তাঁহাদের বাক্য পালন করা, সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। অনেকে স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া পিতামাতার প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা অত্যন্ত অধর্ম্মের কার্য্য। পিতামাতার তুলনা নাই। কিন্তু এই শ্রদ্ধার ভাবও বিকৃত হইতে পারে। যখন

গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে যাইয়া মানুষ ঈশ্বরের আদেশ লঙ্ঘন করে, সত্যের অবমাননা করে, তখন উহাকে শ্রদ্ধার অপব্যবহার বলিব। কারণ পরমেশ্বরের এ ইচ্ছা নয়, মানুষ তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের বাক্য পালন করিবে। এই স্থানে সাধককে সতর্ক হইতে হইবে। "সত্যাৎ পরতরো নহি" সত্য হইতে কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। এই কথাটি মনে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে।

(৪) স্বদেশানুরাগ (Patriotism) :—স্বদেশের প্রতি যে আন্তরিক প্রীতি তাহাকেই স্বদেশানুরাগ বলা যায়। ইংরাজীতে ইহাকে Patriotism বলে। এমন লোক অতি অল্পই আছে যাহার স্বদেশের প্রতি ভালবাসা নাই। ইংরাজীতে 'স্বদেশ প্রেম' (Love of fatherland) শীর্ষক একটি কবিতা আছে; তাহার এক স্থান উদ্ধৃত করা গেল :—

"Breathes there the man with soul so dead,
Who, never, to himself hath said,
'This is my own—my native land,'
Whose heart has ne'er within him burn'd,
As home his footsteps he hath turn'd,
From wand'ring on a foreign strand ?"

"সংসারে এমন লোক কি কেহ আছে, যাঁহার আত্মা এত নিস্তেজ যে সে দূর দেশ বেড়াইয়া যখন স্বদেশে পাদবিক্ষেপ করিয়াছে তখন আনন্দোৎফুল্ল চিত্তে "এই আমারই স্বদেশ" এই কথা বার বার বলে নাই, এবং যাহার হৃদয়ে উৎসাহের অগ্নি প্রজ্জলিত হয় নাই?"

ইহাতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে দেশের প্রতি কবির কিরূপ অনুরাগ। সকলেরই অল্পাধিক পরিমাণে স্বদেশের প্রতি প্রেম আছে। তাই দেখা যায়, কেহ স্বদেশের নিন্দা করিলে আর সহ্য হয় না; পৃথিবীতে যত

সুন্দর সুন্দর বস্তু আছে তদ্দ্বারা মাতৃভূমিকে সাজাইতে ইচ্ছা হয়; দেশের স্বাধীনতা, দেশের গৌরব রক্ষার জন্য একান্ত ইচ্ছা হয় এবং দেশের উন্নতির জন্য আগ্রহ হয়। তাই দেখা যায়, শত শত বীর দেশের স্বাধীনতা, দেশের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ধন, মান, স্বার্থ এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন; কত প্রতাপ সিংহ, কত অ্যাল্‌ফ্রেড্‌, কত লিওনিডাস্‌ অনন্ত কষ্ট দেশেরই জন্য সহ্য করিয়াছেন। আহা! প্রতাপ ও অ্যাল্‌ফ্রেড্‌ রাজপুত্র হইয়া দস্যু তস্করের ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, প্রজাবর্গের দুঃখে অভিভূত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিয়াছেন; কত কষ্ট, কত যন্ত্রণা, অনাহার, অনিদ্রা, সমস্ত সহ্য করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন! কত ওয়াসিংটন্‌, কত ম্যাজিনি, কত গারিবল্ডি দেশের লুপ্ত স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

অবশ্য একটি দিক্‌ আছে, যে দিক্‌ হইতে দর্শন করিলে স্বদেশে আর বিদেশে পার্থক্য থাকে না। যাঁহার হৃদয় এত উদার যে বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে, অন্তঃকরণ এত প্রশস্ত যে জগৎকেই আপন গৃহ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে পৃথক্‌ কথা; তিনি সমস্ত স্থানকেই আপনার মনে করেন, সমস্ত দেশের উন্নতিতে সুখী হন এবং অবনতিতে ম্রিয়মাণ হন। এরূপ লোক অতি বিরল। এখানে আমরা বলিব যাঁহার হৃদয় স্বদেশের জন্য বিশেষভাবে ক্রন্দন করে না, যিনি অন্য দেশ অপেক্ষা স্বদেশকে ভালবাসেন না, তিনি হয় দেবতা না হয় পশু। স্বদেশ প্রেম থাকা মানব মাত্রেরই স্বাভাবিক। সকলেই যদি স্বদেশপ্রেমিক হইয়া আপন আপন দেশের উন্নতিবিধানে কৃতসংকল্প হন, তবে সমস্ত দেশেরই উন্নতি হইতে পারে। মানবজীবন এমন জটিল, তাঁহার উন্নতি সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপর এত নির্ভর

করে যে, দেশের উন্নতি না হইলে আত্মোন্নতি সাধন করা অসম্ভব। সুতরাং স্বার্থের জন্য আপনার এবং ভবিষ্যৎবংশীয়দের উন্নতির জন্যও অন্ততঃ স্বদেশের উন্নতিসাধনে যত্নবান্ হওয়া মানবমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

এই স্বদেশানুরাগও আবার অনেক সময়ে বিকৃত ভাব ধারণ করে। স্বদেশের গুণকীর্ত্তনের, পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তি কাহিনী গানের প্রবৃত্তি অতি স্বাভাবিক; ইহাতে দেশের উন্নতির জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিতে উৎসাহ জন্মে, নির্জীব প্রাণেও জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হয়; পূর্ব্ব-পুরুষগণের বীরত্ব ও পুণ্যকাহিনী স্মরণ করিয়া স্বদেশের জন্য আত্মবলিদান করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু নিজের দেশেরও অতিরিক্ত প্রশংসা করিলে ইষ্ট না হইয়া বরং অনিষ্টই উৎপন্ন হয়। আমাদের দেশের সকলই উৎকৃষ্ট; আমাদের ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান সাহিত্য জগতে অতুলনীয়; অন্যের নিকট আমাদের শিক্ষা করিবার কিছুই নাই। এই প্রকার রক্ষণশীলতার ভাবই দেশের অবনতির প্রধান কারণ। চীন দেশ অতি প্রাচীন; চীনদেশবাসীগণ আপনাদের প্রাচীন সভ্যতার গর্ব্বে স্ফীত হইয়া নূতন যুদ্ধ প্রণালী শিক্ষা করেন নাই, তাই তাঁহারা দুই দিনের সভ্যতাপ্রাপ্ত জাপানবাসীদের নিকট অপদস্থ হইলেন। ভারতবাসীগণেরও অহঙ্কার কিছু অতিরিক্ত। তাঁহারা মনে করেন যে সর্ব্ববিষয়েই আমরা অন্য জাতি অপেক্ষা উন্নত আছি; আমরা আর্য্যসন্তান, আমরা আবার ম্লেচ্ছদের নিকট কি শিক্ষা করিব? আমাদের ভীষ্ম, দ্রোণ, আমাদের মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, আমাদের শুক ও জনক জগতে অতুলনীয়; আমরা কেন বিদেশী লোকের নিকট শিক্ষা করিতে যাইব? এই প্রকার ভাব প্রকৃত স্বদেশ প্রেম নহে। যেমন পিতৃপিতামহ অতুল

ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জমিদার হইলেও তাহা চিন্তা করিয়া আমার দারিদ্র্য দূর হয় না এবং আমার জঠরাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় না; সেইরূপ পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরব স্মরণ করিয়াও আমাদের দুর্গতি দূর হয় না। আমাদের চেষ্টা চাই, শিক্ষা চাই, আত্মোৎসর্গ চাই। প্রকৃত দেশহিতৈষী ব্যক্তি আপনাদের দোষ অনুসন্ধান করিয়া তৎসংশোধনে ব্যস্ত হইবেন; পূর্ব্বের যাহা ভাল তাহা রক্ষা করিবেন এবং যাহা মন্দ তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন গ্রহণ করিবেন। স্বার্থপরতা অনেক সময়ে দেশের উন্নতির ব্যাঘাত জন্মায়। যদি প্রাচীন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন নিয়ম প্রচলিত হয়, তবে অনেকের স্বার্থে আঘাত লাগে; তাই তাহারা প্রাচীনের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া নূতনকে তাড়াইতে চান। অনেকে আবার বাহিরের উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত। আমাদের দেশে আজ কাল রাজনৈতিক আন্দোলনের মহা হুল স্থূল পড়িয়াছে! শ্বেতাঙ্গ পুরুষগণ অনেক স্থলে কৃষ্ণকায় ব্যক্তিগণের প্রতি অত্যাচার করেন; অনেক সময়ে ধর্ম্মাধিকরণে ন্যায় বিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অনেক সতী নারীর সতীত্বরত্ন অপহৃত হইতেছে; নিঃস্ব প্রজাগণ দিন দিন করভারে প্রপীড়িত হইতেছে; উপযুক্ত দেশীয়দিগকে অবহেলা করিয়া বিদেশীয়দিগকে উচ্চপদ প্রদান করা হইতেছে; এই সকল অবিচার দর্শন করিয়া স্বদেশবৎসল ব্যক্তিগণের ইহা সংশোধন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে; ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু যখন দেখিতে পাই যে তাহাদেরই অনেকে আবার নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উপর অত্যাচার করিতেছেন, নারীজাতির দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিত করিতেছেন, দেশে দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত করিতেছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব যে তাহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী? রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টা ভাল, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই; কিন্তু দেশহিতৈষিগণের

ইহা কি জানা উচিত নয় যে, দেশের নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উন্নতি না হইলে প্রকৃত উন্নতি অসম্ভব? তাঁহারা যদি দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের অবস্থা, নারীজাতির দুর্গতি, যুবকগণের দুর্নীতি, দেশের ধর্ম্মহীনতার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতেন, এই সকল চিন্তা করিয়া যদি দুই বিন্দু অশ্রুপাত করিতেন এবং এই সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত; তাঁহাদিগকেও দেশের প্রকৃত হিতৈষী বলিতাম। নতুবা এরূপ বিকৃত দেশ হিতৈষণায় দেশের অপকার ব্যতীত উপকার নাই। অনেক দেশহিতৈষীকে এইরূপ বিকৃত ভাব অবলম্বন করিতে দেখা যায়। এই বিকৃত ভাব দূর হইয়া যাহাতে প্রকৃত দেশ হিতৈষণার ভাব হৃদয়ে জাগে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

(৫) দয়া (Kindness):—দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া তাহার প্রতি যে প্রেম ও তাহার দুঃখ নিবারণের যে ইচ্ছা তাহাকেই দয়া বলা যাইতে পারে। দয়া কেবল গরীবের দুঃখ বিমোচনে নিবদ্ধ নহে। রোগীর শুশ্রূষা, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, পাপীকে আশ্বাস বাণী, সমস্তই দয়ার কার্য্য। দয়া মানব হৃদয়ে একটি সুন্দর প্রবৃত্তি। যেখানে দুঃখ দারিদ্র্য, যেখানে পাপ তাপ অত্যাচার, সেখানেই দয়া মূর্ত্তিমতী দেবতার ন্যায় উপস্থিত থাকিয়া দুঃখ যন্ত্রণা দূর করে। মানব হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি না থাকিলে জগৎ মরুভূমি হইত, সংসারে দুঃখ যন্ত্রণার অবধি থাকিত না, মানব জীবন এত আদরের হইত না। দয়া আছে বলিয়াই মানুষের মনুষ্যত্ব, মানুষে ও পশুতে পার্থক্য। এ দয়ারও আবার বিকার আছে। অনেকে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়াই, যে চায় তাহাকেই দান করেন। ইহাতে দান গ্রহীতার অনিষ্ট হয়, সংসারেরও ক্ষতি হয়। ভগবানের

এরূপ অভিপ্রায় নয় যে, এখানে লোক অলস হইয়া বসিয়া থাকিবে আর অন্যে তাহার জন্য খাটিবে; সে পৃথিবীর কোন উপকার করিবে না, অথচ অন্যে তাহার উদরান্নের জন্য প্রাণপণ করিবে। সকলেই সংসারের কিছু কিছু কার্য্য করুক, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা। যিনি অলসকে দান করিয়া আলস্যের প্রশ্রয় দেন তিনি দেশের মহা অনিষ্ট সাধন করেন। যাহারা শত চেষ্টা করিয়াও উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না, নানা প্রকার কষ্টভোগ করিতেছে, দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগকে সাহায্য করা মনুষ্যত্বের কার্য্য; কিন্তু অনুপযুক্তকে দান করিলে অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, দেশের দুর্গতি বৰ্দ্ধিত হওয়ার সুবিধা করিয়া দেওয়া হয় এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভবিষ্যতে যে অন্নাভাবে মরিবে তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃত দুঃখী ব্যক্তি যে অর্থদ্বারা উপকৃত হইতে পারিত তাহা অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে দান করিলে বাস্তবিকই প্রত্যবায় হয়। এরূপ দয়াকে সংযত করিয়া জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হওয়া কৰ্ত্তব্য। পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা উচিত। অনেকে দুঃখীর দুঃখ দেখিয়া কেবল ক্রন্দনই করিতে থাকেন, দুঃখ দূরের চেষ্টা করেন না; ইহাকেও প্রকৃত দয়া বলা যায় না। দয়া যেন ন্যায়কে অতিক্রম না করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

(৬) বিশ্বজনীন মৈত্রী (universal love):—যখন মানব হৃদয়ের প্রেম স্থান, কাল কিংবা পাত্রবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া অনন্ত জগৎকে আলিঙ্গন করে, যখন তাঁহার হৃদয় সৰ্ব্ব দেশের, সর্ব্ব কালের, সৰ্ব্ব জাতির নরনারী, কেবল নরনারী কেন জীবজন্তুকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রসারিত হয়, তখনই তাঁহার জগৎব্যাপী প্রেমকে বিশ্বজনীন মৈত্রী বলিব। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বরোপাসনার দুইটি অঙ্গ, (১) নামে রুচি,

(২) জীবে দয়া। এই বিশ্বজনীন মৈত্রীই জীবে দয়া, বা ঈশ্বরের প্রিয়-কার্য্য সাধন অথবা প্রতিবেশীকে নিজের ন্যায় ভালবাসা প্রভৃতি ভাষা দ্বারা অভিহিত হয়। বিশ্বজনীন মৈত্রীর ভাব সহজে মানবহৃদয়ে উদিত হয় না; ইহার বীজ হৃদয়ে ঘুমন্তভাবে রহিয়াছে; সাধনা দ্বারা ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরে যতই ভক্তি বর্দ্ধিত হয় মানবের হৃদয়ও ততই প্রসারিত হইয়া জগৎকে আলিঙ্গন করে। এই ভাব যখন প্রাণে উদিত হয়, তখন নিজ পরিবারে আর মন আবদ্ধ থাকে না; জগৎ এক পরিবার হইয়া যায়; তাই কপিলাবস্তুর রাজকুমার, সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, অতুল সম্পদ, স্নেহের আধার পিতা, প্রেমের প্রতিমা তরুণী ভার্য্যা, স্নেহের আস্পদ নবপ্রসূত কুমারকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত সংসার সাগরে ঝাঁপ দিলেন, মানবের জরা-মরণ-ব্যাধি দূর করিবার উপায় উদ্ভাবনের জন্য সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিলেন। তাই ভক্তচূড়ামণি গৌরাঙ্গ স্নেহময়ী জননী ও পতিপ্রাণা ভার্য্যার প্রেমবন্ধন ছিন্ন করিয়া পথের ভিখারীর বেশ ধারণ করিলেন। তাই ঈশা ও মহম্মদ্ জগতের নরনারীর প্রেমে আপনাদিগকে হারাইলেন, তাঁহাদের উন্নতিকল্পে জীবন মন বিসর্জ্জন করিলেন। আর সেদিন যে হাউই দ্বীপে ফাদার ডামিয়েন্ কুষ্ঠরোগিগণের সেবা করিতে যাইয়া সংক্রামক ব্যাধিতে জীবন হারাইলেন, উহার মূলে কি? আবার ঐ যে নবীন সন্ন্যাসিনীগণ সংসারের সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, উহাদের মূলেই বা কি? এই সর্ব্বত্রই সেই বিশ্বজনীন প্রীতির বিকাশ দেখিতে পাই। ঈশ্বরভক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ইহাঁরা বিশ্বজনীন প্রেমে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। জগৎ ইঁহাদের পরিবার; আপনার বলিতে ইঁহাদের কিছুই নাই অথচ সকলই ইঁহাদের নিজের। এই রকম দৃশ্য আছে বলিয়াই জগৎ মধুময় হইয়াছে, পাপতাপময় সংসার বাসের উপযুক্ত

হইয়াছে। এ প্রবৃত্তির বিকৃতির সম্ভাবনা অতি অল্প। তবে লোকের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে, যাহাতে দুঃখযন্ত্রণা বাস্তবিক দূরীভূত হইতে পারে, সকলের স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া সাময়িক এক উত্তেজনা দ্বারা যদি কার্য্য করা যায় তাহাতে কতকপরিমাণে অনিষ্ট ঘটিতে পারে। প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানরূপ কর্ণধার না থাকিলে জীবন তরণী সুপথে চলিতে পারে না।

(৭) ভক্তি (Reverence) :—"পূজ্যেষ্বনুরাগঃভক্তিঃ", পূজ্যের প্রতি, পূজার উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ তাহারই নাম ভক্তি। পূজার উপযুক্ত কে? যাঁহার চরিত্র উন্নত, সৎ প্রবৃত্তি প্রবল, যিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ তিনিই পূজার উপযুক্ত পাত্র; সুতরাং চরিত্রবান্ ধার্ম্মিকগণই পূজা ও ভক্তির উপযুক্ত। আর যিনি সমস্ত গুণের আধার, প্রেম পুণ্য ও পবিত্রতার অনন্ত প্রস্রবণ, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পূজার উপযুক্ত ও ভক্তির পাত্র। ভক্তি প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধুগণেই প্রযোজ্য। ভক্তির মধ্যে প্রেম আছে, কিন্তু সে প্রেমে আবিলতা নাই। ভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাসে তরঙ্গ আছে, কিন্তু পরে উহা প্রশান্ত মহাসাগরের মত নির্ব্বাত, নিষ্কম্প হয়। ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, আনুগত্য আছে। ভক্তিতে ভয় আছে কিন্তু তাহা প্রেম মিশ্রিত, অতি মধুর। বিশ্বজনীন মৈত্রী ভক্তিরই কন্যা; দয়া দাক্ষিণ্য ভক্তি হইতে প্রসূত; জ্ঞান ভক্তির সহচর, কর্ম্ম ভক্তির পুত্র। পবিত্রতা, স্বার্থত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, সাম্য, দয়া প্রভৃতি হৃদয়ের প্রকৃষ্ট বৃত্তিগুলি ভক্তিমাতারই গর্ভসম্ভূত। প্রকৃত ভক্তি হইলে মানবের কিছুরই অভাব থাকে না। ভক্তিদেবী সমস্ত গুণরাশি লইয়া আবির্ভূতা হন; ভক্তির সঞ্চার হইলে সমস্ত বৃত্তিগুলিই প্রস্ফুটিত হইয়া যথাযোগ্য কার্য্য করিতে থাকে। যিনি ভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যেরই অধিকারী। এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট

বৃত্তিরও বিকার আছে; মানুষ অনবধানতা বশতঃ স্বভাবসিদ্ধ ভক্তির ভাবকে অনেক সময়ে কলঙ্কিত করে এবং তদ্দ্বারা অশেষ অনিষ্টের সূত্রপাত করে।

প্রথমতঃ সাধুগণের প্রতি স্বতঃই সকলের ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হয়। যেখানে সাধুতা, যেখানে স্বার্থত্যাগ, যেখানে প্রেম ও বৈরাগ্য দেখা যায়, হৃদয়ের ভক্তিনদী উচ্ছ্বসিত হইয়া আপনাপনিই সেইদিকে গড়াইতে থাকে; কেহ তাহা রোধ করিতে পারে না। ইহা স্বভাব-সিদ্ধ ও কল্যাণপ্রদ। যে সাধুকে ভক্তি করিতে জানে না, তাহার মহা আধ্যাত্মিক ব্যাধি জন্মিয়াছে বলিতে হইবে। জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে যে অনেক সময়ে নরহত্যাকারী কালান্তক যমসদৃশ ঘাতকের উত্তোলিত অসিও সাধুর তীব্র অথচ ভক্তি ও বিশ্বাসব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছে। সাধুর সংস্পর্শে অত্যন্ত কলুষিত প্রকৃতিও পুণ্য ও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়; তাঁহার প্রসন্ন বদন, জ্বলন্ত বিশ্বাস, উন্মাদিনী ভক্তি ও উজ্জ্বল বিবেক ও বৈরাগ্য দর্শন করিলে কাহার না হৃদয়ে সাধুভাব জাগরিত হয়? তাই মানুষ তাঁহার গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে, তাঁহার প্রতিমা গঠিত করিয়া মন্দিরে মন্দিরে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। তাই দেখা যায়, ভারতে ও অন্যান্য স্থানে সাধুগণ ঈশ্বরের অবতার রূপে পূজিত হইতেছেন; রাম, কৃষ্ণ, যীশু ও বুদ্ধদেব প্রভৃতি নরপুঙ্গবগণকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করা হইতেছে। ভাবপ্রবণ মানুষ তাঁহাদের অতুলনীয় চরিত্র, অলৌকিক কার্য্যকলাপ দর্শন করিয়া মনে করিয়াছে যে এরূপ কার্য্য মানবের সাধ্যাতীত; অতএব ইঁহারা দেবতা। মানবের শক্তির বিকাশ হইলে কতদূর যে পৌঁছাইতে পারে তাহার ধারণা অনেকেরই নাই; তাই ভাবপ্রবণ মানুষ ঈশ্বরের সিংহাসনে মানুষকে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতেছে। ইহা একদিকে অজ্ঞানতা অপরদিকে ভাবপ্রবণতার ফল। ভক্তির সঙ্গে জ্ঞান মিশ্রিত থাকিলে এরূপ অনর্থ সংঘটিত হইতে পারে না। মানুষ কেবল খৃষ্ট, বুদ্ধ প্রভৃতি জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণকে অবতার স্বীকার করিয়াই নিবৃত্ত হয় নাই; আজও জগতে নূতন নূতন অবতারের সৃষ্টি করিতেছে। ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস সেদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; আজই একদল লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন! ভাব-প্রবণতার ইহাই পরিণাম। এইরূপ অবতারবাদে দুই প্রকার অনিষ্টের উৎপন্ন হয়; প্রথমতঃ অনন্ত ঈশ্বরকে সীমাবদ্ধ করিয়া তাঁহার মহিমা খর্ব্ব করা হয়; তাঁহাকে মানবের ন্যায় সুখ দুঃখের অধীন করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়; ইহাতে মানুষের প্রত্যবায় আছে। দ্বিতীয়তঃ যেখানে সাধুতা, যেখানে ঈশ্বরনিষ্ঠা, সেই স্থানেই অবতার কল্পনা করাতে মানবের শক্তি বিকাশের পথে কণ্টক রোপণ করা হয়; কারণ এরূপ হইলে মানুষ সহজেই মনে করিতে পারে যে রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, ইঁহারা ঈশ্বর ছিলেন, তাই তাঁহাদের এত প্রেম, এত জ্ঞান দেখা যায়; আমরা সামান্য মানুষ আমাদের উঁহাদিগকে অনুকরণ করিবার প্রয়াস করা মহাপাপ। ভক্তির বিকারে এইরূপ অনিষ্টই সংঘটিত হয়। সাধক অত্যন্ত সাবধানে চলিবেন।

দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরে ভক্তি। "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে", ঈশ্বরে যে একান্ত অনুরক্তি তাহাকে ভক্তি বলে। জগতের কার্য্যকলাপ আলোচনা করিলে স্বতঃই জগৎ রচয়িতার প্রতি প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে ভক্তি উত্থিত হয়। এমন জগতে কে আছে যাহার মন কখনও পরম করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিগদগদচিত্তে ধাবিত হয় নাই? তাঁহার অসীম জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অতুল সৌন্দর্য্য

ও অসীম শক্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে কাহার হৃদয়ে বিস্ময়, প্রেম ও ভক্তির ভাব জাগরিত না হয়? মানব, তুমি পবিত্রতার আদর কর, তবে কেন তুমি সেই পবিত্রতার আধারকে ভক্তি করিবে না? তুমি সৌন্দর্য্য ভালবাস, তবে তুমি কেমন করিয়া সেই সকল সৌন্দর্য্যের আধারকে ভাল না বাসিয়া থাকিবে? শারদীয়া পূর্ণশশী যাঁহার করুণায় জ্যোৎস্নামালা বিকীরণ করে, নানা ফুল ফল পরিশোভিত এই ধরিত্রী যাঁহার করুণায় মানবের প্রাণে আনন্দ ধারা ঢালিয়া দেয়, যাঁহার করুণায় পিতা মাতা, ভাই বন্ধুদের অকৃত্রিম স্নেহ ও ভালবাসা পাইয়া এই মর জগতেও মানব আপনাকে সুখী মনে করে, তাঁহার প্রতি কি সহজেই ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হয় না? যত সাধন, যত ভজন, সকলেরই লক্ষ্য ঈশ্বরে ভক্তি লাভ। ভক্তির বর্ণনা করা সাধ্যাতীত; ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী!" যাঁহার ভক্তি আছে, মুক্তিকে সে গ্রাহ্য করে না।

এই যে ভক্তি, ইহারও অনেক সময়ে বিকার দেখিতে পাওয়া যায়। সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিলেই সহজে বোধগম্য হইবে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেককে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের নাম করিলেই তাহাদের চক্ষে জল আসে, সঙ্কীর্ত্তনে মত্ততা জন্মে, রোমাঞ্চ, ক্রন্দন, অচেতন প্রভৃতি ভাবের অনেক লক্ষণ প্রত্যক্ষ হয়, অথচ তাহাদের চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিতেছে। এই ভাবকে কি ভক্তি বলিব? ইহা ভক্তির বিকার। এই সকল লোকের ভাবের প্রাবল্য আছে, উচ্ছ্বাস আছে, কিন্তু জ্ঞানের অভাবে সেই ভাব ভক্তিতে পরিণত না হইয়া বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে। আবার অনেকে আছেন যাঁহারা প্রকৃত

ভক্তির পাত্র যিনি, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য পদার্থে ভক্তি অর্পণ করেন। অনেক সময়ে যেমন দেখা যায় যে হীন বুদ্ধি ব্যক্তিরা প্রিয়জনের শরীরকেই ভালবাসে; আত্মায় আত্মায় যে ভালবাসা তাহা ভুলিয়া যাইয়া শরীরকেই ভালবাসার পাত্র মনে করে, শরীরেই মুগ্ধ হয়, শরীরের জন্যই পাগল হয়। অবশ্য যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার শরীর কেন, সমস্ত পদার্থই আদরের হইয়া উঠে, ইহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু যদি মানুষ আত্মাকে ভুলিয়া যাইয়া প্রিয়জনের শরীরকেই মাত্র ভালবাসার জিনিষ করিয়া লয়, তবে এ ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে। শরীরের বিনাশেই এ প্রেমের বিনাশ হয়। সেইরূপ ধর্ম্ম-জগতেও একদল লোক আছেন যাঁহাদের ভাব যথেষ্ট আছে কিন্তু সেই ভাব প্রকাশ করিতে যাইয়া ঈশ্বরের একটা শরীর কল্পনা করেন। তাই তাঁহারা নিরাকার ঈশ্বরকে নানাপ্রকার রূপে, নানাপ্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া আপনাদের ভক্তি তাঁহাতেই অর্পণ করেন। প্রেমের একটা নিয়ম এই যে প্রেমিকদ্বয় এক প্রকৃতির হওয়া আবশ্যক। যে পর্য্যন্ত উভয়ে এক প্রকৃতির না হয় সে পর্য্যন্ত প্রেম ঘনীভূত হয় না। ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তি অর্পণ করিতে হইলে আপনার চিন্তা জড় হইতে কতকটা উন্নত করিতে হইবে, নিজের মন সত্য, প্রেম ও পবিত্রতা দ্বারা পূর্ণ রাখিতে হইবে। কিন্তু এ বড় দুরূহ সাধন; তাই নিজে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে চেষ্টা না করিয়া মানুষ ঈশ্বরকে মনোমত গঠন করিয়া লয়; তাঁহাকে হস্তপদ বিশিষ্ট একটি সুন্দর মানুষ-রূপে কল্পনা করে, তাঁহাকে সুখ, দুঃখ, হর্ষ বিষাদের অধীন করে; এবং তাঁহাকে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশবর্ত্তী করিয়া তোলে। প্রকৃত প্রেম ও ভক্তির পাত্র যে মহান্ আত্মা তাঁহাকে ধারণা করিতে চেষ্টা না করিয়া আপনার কল্পিত মূর্ত্তিকেই

পূজা, অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহাও ভক্তির এক প্রকার বিকৃত অবস্থা। প্রকৃত ভক্তি আত্মারই অনুগামী, আত্মাতেই তৃপ্ত; উহা শরীরে প্রীত নহে। তবে ভক্ত এই জগৎকেও ভালবাসেন, ইহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ হয়; কারণ ইহা তাঁহার প্রাণেশ্বরেরই প্রেম তুলিকাতে চিত্রিত। জগৎ ঈশ্বরেরই ভাব ও চিন্তা, তাই জগৎ তাঁহার নিকট প্রিয় হয়; মানুষ তাঁহারই সন্তান, মানুষে তাঁহারই ছায়া পড়িয়াছে, তাই জগতের নরনারীও তাঁহার প্রেমের পাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া ভক্ত ঈশ্বরের স্থান অন্যকে প্রদান করেন না। ঈশ্বর মহান্ আত্মা, জগৎ তাঁহার মনের কল্পনা; সেই আত্মাতেই ভক্তি নিহিত করিতে হইবে, কোন মূর্ত্তিতে নহে। ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি কোন দেবতা কিংবা অন্য কেহ পাইতে পারেন না।

অবশ্য অজ্ঞানাবস্থায় ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি না বুঝিয়া যদি মানুষ অপরকে প্রদান করে তবে তাহার ততটা দোষ হয় না; কিন্তু জানিয়া শুনিয়া এরূপ করা মহাপাপ। সমস্ত মানবের হৃদয়েই অস্ফুট ভাবে অনন্তত্বের ভাব নিহিত রহিয়াছে অনুশীলন দ্বারা তাহা প্রস্ফুটিত হয়; সুতরাং বাল্যকালে দেশের সামাজিক ও ধর্ম্মের অবস্থা অনুসারে মানবের ধর্ম্মভাব কতক পরিমাণে নিয়মিত হয়; সেই সময়ে যদি কোন ব্যক্তি না বুঝিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে কোন মূর্ত্তি কিংবা সৃষ্ট পদার্থের পূজা করে তবে তাহাকে দোষী বলা যায় না; কিন্তু তাহার জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই সে ঈশ্বরতত্ত্ব কতক পরিমাণে অনুভব করিতে থাকে। ঈশ্বর এক মহান্ আত্মা, এই সত্য বুঝিয়াও যদি সেই ব্যক্তি সমাজ ভয়ে কিংবা পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ কল্পিত দেবতাকে ভক্তি প্রদান করে তবে সে আধ্যাত্মিক ব্যভিচার করিল বলিতে হইবে। বাস্তবিক ঈশ্বরের প্রাপ্য ভক্তি অন্যকে প্রদান করা বিধেয় নহে।

ভক্তির আর একটি নিয়ম এই যে, উহা যেমন একদিকে ঈশ্বরকেই প্রদান করিতে হইবে, অন্যকে প্রদান করিলে প্রত্যবায় হয়, ব্যভিচার হয়, সেইরূপ আবার ষোল আনা ভক্তিই তাঁহাকে অর্পণ করিতে হইবে; সমস্ত প্রাণ, মন, শক্তি তাঁহারই শ্রীপদে সমর্পণ করিতে হইবে; ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার অধিকার নাই। ভক্তি সমস্ত জীবন চায়, সম্পূর্ণ আনুগত্য চায়। কতক সংসার করিব, কতক ধর্ম্ম করিব, এরূপ ভাব লইয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা সমস্তই তাঁহাতে অর্পণ করিতে হইবে; তৎপর তিনি যাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রদান করিবেন কৃতজ্ঞতার সহিত তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার আবশ্যক। "Our God is Jealous God." তিনি অন্যের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন না। যেমন সতী নারী আপনার প্রাণ, মন, সুখ, দুঃখ, সমস্তই পতিপদে সমর্পণ করেন; পতিই তাঁহার প্রাণ, পতিই তাঁহার গতি; পতির আদেশই তাঁহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ; পতি ভিন্ন আর কিছু তিনি জানেন না। সেইরূপ সাধককেও সমস্তই প্রভুর পদে প্রদান করিতে হইবে; তিনি যদি সুখে রাখেন তাহা ভাল, যদি দুঃখে পাতিত করেন তাহাও সুখের। এই ভাব হইলে প্রকৃত ভক্তিলাভ হয়। ভক্তি লাভ হইলে আর কিছু বাসনা থাকে না, তখন প্রাণ মন এক নূতন ভাব ধারণ করে, জগৎ মধুময় হয়; ভক্তপ্রাণ ঈশ্বর প্রাণে আসিয়া দেখা দেন।

ন্যায়পরতা (Sense of Justice):—আর একটি বৃত্তির কথা বলিয়াই এই অধ্যায় শেষ করা যাইবে। সেটি ন্যায়পরতা: ইংরাজীতে ইহাকে Sense of Justice বলে। বৃত্তি সকল আলোচনা করিলে ন্যায়পরতাকে আদিম ও মৌলিক বৃত্তি বলা

যাইতে পারে। সমস্ত বৃত্তির সমুচিত ব্যবহার করিতে হইলেই ন্যায়পরতার আবশ্যক। যাহা সত্য, যাহা ন্যায় তাহা করা উচিত এই জ্ঞান সকলেরই আছে। কি উচিত, কি অনুচিত, কি ভাল, কি মন্দ, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধতা আছে বটে, কিন্তু যাহা উচিত, যাহা ন্যায় তাহা করিতে হইবে ইহা সকলেই স্বীকার করেন; এই ভাবই ন্যায়পরতা। ন্যায়পরতা সমস্ত বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঐ সকল বৃত্তিকে নিয়মিত করে। ন্যায়পরতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি। ইহার অভাব হইলে কোন প্রবৃত্তির কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। ন্যায়পরতার বিকার নাই। ন্যায় ও অধিকার এক কথা নহে। আমার অধিকার (Right) যাহা তাহা দয়ার অনুরোধে খর্ব্ব করিতে পারি, কিন্তু ন্যায়কে (Justice) কোন মতে বিসর্জ্জন করিতে পারি না। আমার বাড়ীতে আমার যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার অধিকার আছে; আমার টাকা আমার যথেচ্ছ ব্যয় করিবার ক্ষমতা আছে; এই অধিকার, এই ক্ষমতা আমি প্রয়োগ করিলেও পারি না করিলেও পারি; কিন্তু অপরের প্রাপ্য টাকা তাহাকে শোধ করিতেই হইবে; এখানে আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এখানে ন্যায় অনুসরণ করিতেই হইবে। ন্যায় কিছু কঠোর; ন্যায় দয়াকে নিয়মিত করিবে; দয়া দ্বারা অধিকার (Right) নিয়মিত হইতে পারে কিন্তু ন্যায় কাহারও কথা শুনিবে না। **Justice must be done though heaven may fall**—স্বর্গ চূর্ণ হইয়া যাউক, তবুও ন্যায়কে রক্ষা করিতে হইবে!

বৃত্তি সমূহের আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিলাম যে কোন বৃত্তিই এত উৎকৃষ্ট নয় যে তাহার অপব্যবহার হইতে পারে না; আবার কোন প্রবৃত্তিই এমন অপকৃষ্ট নয় যে তাহা হইতে কোন সুফলই উৎপন্ন হয় না। ভগবান্ যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন তাহাদের সকলেরই উপকারিতা

আছে; তবে ব্যবহারের দোষে অনেক প্রবৃত্তি কুফল উৎপন্ন করে। সাধক অতি সাবধানে অগ্রসর হইবেন এবং যে প্রবৃত্তি যে উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য ভগবান্ প্রদান করিয়াছেন সাধক সেই বৃত্তিটি সেই জন্যই নিয়োজিত করিবেন। তাহা হইলেই রিপুগণ ধর্ম্মপথের সহায় হইবে, জীবন উন্নত হইবে, মন পবিত্র হইবে। এইরূপে সাধক পরা ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্য।

যে সকল বৃত্তি মানব মনে কার্য্য করে তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়? এই প্রশ্নটি সাধকের মনে স্বভাবতঃই উদিত হইতে পারে। সকল বৃত্তিরই মৌলিক উদ্দেশ্য অতি মহৎ; ভগবান্ মানবের দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্যই এই সকল বৃত্তি দিয়াছেন; মানুষ কতক পরিমাণে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে: তজ্জন্যই সে মৌলিক বৃত্তিগুলিকে বিকৃত করিয়া অনেক সময়ে অনর্থ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। মানুষ যদি বৃত্তিগুলির সৎব্যবহার করিত, তাহা হইলে সংসারে এত পাপ, এত অত্যাচার স্থান পাইত না। কিন্তু এখানেই এই প্রশ্নটি মীমাংসিত হইল না। এক সময়ে যদি দুই তিনটি প্রবৃত্তি মনে উদিত হয় তবে সাধক কোন্ বৃত্তির অনুসরণ করিয়া চলিবেন? মনে করুন এক ব্যক্তি আহার করিতে বসিয়াছে, এমন সময়ে এক গরীব আসিয়া অন্ন প্রার্থনা করিল, গৃহে আর অন্ন নাই; এখন সে নিজে আহার করিবে, না গরীবকে আপনার অন্ন প্রদান করিবে? আহার করা অন্যায় কার্য্য নহে, দরিদ্রকে দান করাও বিধেয়; এখন এই দুই কর্ত্তব্যের মধ্যে

কোন্‌টি সে রক্ষা করিবে ? এখানে হয়ত সহজেই মীমাংসা হইতে পারে, কিন্তু এমন অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয় যখন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক ও দার্শনিক ডাক্তার মার্টিনো (Dr. Martineau) তাঁহার নীতি বিজ্ঞান পুস্তকে (Types of Ethical Theory, Vol.II.) এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন ; তাঁহার মত চিন্তা করিয়া দেখিলে এই গভীর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে কতক পরিমাণে সুবিধা হইতে পারে। নীতিবিষয়ে তিনি সহজ জ্ঞানের (intuition) মত বিশ্বাস করেন। তিনি বলেন যখনই দুইটি পরস্পর বিরোধী বৃত্তি এক সময়ে আমাদিগকে কার্য্য করিতে প্রোৎসাহিত করে তখন আমরা স্বভাবতঃই বুঝিতে পারি যে তাহাদের মধ্যে কোন্‌টি উচ্চতর প্রবৃত্তি। আমাদের সেই উচ্চতর প্রবৃত্তির প্রেরণা অনুসারেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য। সেই উচ্চতর প্রবৃত্তির বোধের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুসারে কার্য্য করিবার ঔচিত্য বোধও জন্মিয়া থাকে। ইহা যুক্তি তর্ক দ্বারা স্থির হয় নাই ; মানবের অন্তরে যে বিবেক (conscience) আছে, সেই ইহা বলিয়া দেয়। ইহাকে conscience, (বিবেক বা ধর্ম্মবুদ্ধি) moral sense (নৈতিক জ্ঞান) বা voice of God (ঈশ্বরের বাণী) প্রভৃতি যে কোন নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মার্টিনো এইরূপ সহজ জ্ঞানের (intuition) উপরই নীতির ভিত্তি সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি মানবের নৈতিক কার্য্যের তারতম্য করিতে যাইয়া ফলের প্রতি ততদূর লক্ষ্য রাখেন নাই ; কার্য্যের উদ্দেশ্য দেখিয়াই সমস্ত বিচার করিয়াছেন। পরিণাম ফলের কথা যদিও মধ্যে মধ্যে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তদ্বিষয়ে তিনি তাঁহার সমস্ত পুস্তকে বিশেষ আলোচনা করেন নাই। তিনি মানসিক বৃত্তিসমূহকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন ; (১) শারীরিক বৃত্তি (Propensions), (২) প্রবৃত্তি

(Passions), (৩) হৃদয়ের বৃত্তি (Affections), (৪) মানসিক বৃত্তি (Sentiments)। ইহার প্রত্যেক বিভাগেরই মৌলিক (Primary) অবস্থা ও বিকৃত (Secondary) অবস্থা আছে। আবার প্রত্যেক বিভাগেই দুই তিনটি বৃত্তি আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) মৌলিক শারীরিক বৃত্তি (Primary Propensions)—

ক্ষুধাতৃষ্ণা (appetites), চঞ্চলতা, (Spontanious activity).

বিকৃত শারীরিক বৃত্তি (Secondary propensions)—

আরামস্পৃহা (love of ease), ইন্দ্রিয়াসক্তি (sensual pleasures), লোভ (love of gain), ক্ষমতাপ্রিয়তা (love of power), স্বাধীনতার ভাব (love of liberty).

(২) মৌলিক প্রবৃত্তি (Primary passions)—বিদ্বেষ (antipathy), ভয় (fear), ক্রোধ (anger).

বিকৃত প্রবৃত্তি (Secondary Passions.)—নিন্দাপরায়ণতা (censoriousness), প্রতিহংসাপরায়ণতা (Vindictiveness), এবং সন্দিগ্ধচিত্ততা (Suspiciousness).

(৩) মৌলিক হৃদয়ের বৃত্তি (Primary affections.)—স্নেহ (filial affection), প্রণয় (social affection), দয়া (compassion).

বিকৃত হৃদয়ের বৃত্তি (Secondary affection.)—ভাবপ্রবণতা (sentimentalism).

(৪) মৌলিক মানসিক বৃত্তি (Primary sentiments)—আশ্চর্য্য (wonder), বিস্ময় (admiration) ও ভক্তি (Reverence).

বিকৃত মানসিক বৃত্তি (Secondary sentiments.)—

অনুশীলন প্রিয়তা (Love of culture.)

এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কতকগুলি বৃত্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন;

তাহারা দুই কিংবা ততোধিক মৌলিক বৃত্তির সংযোগে উৎপন্ন; তাহাদিগকে যৌগিক বৃত্তি বলা যাইতে পারে।

এই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য তিনি বৃত্তিসমূহের উচ্চ নীচ তারতম্য অনুসারে এক তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। সেই তালিকা প্রণয়নের মূলে সহজজ্ঞানসম্ভূত বিবেকের আদেশ। লোকের সুবিধার জন্য তিনি বৃত্তিসমূহের নৈতিক রাজ্যে স্থান নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন :—

(১) নিন্দাপরায়ণতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা।

(২) ভোগলিপ্সা, ইন্দ্রিয়াসক্তি।

(৩) ক্ষুধা, তৃষ্ণা।

(৪) চঞ্চলতা, কার্য্যতৎপরতা।

(৫) লোভ।

(৬) ভাবপ্রবণতা।

(৭) বিদ্বেষ, ভয়, ক্রোধ।

(৮) ক্ষমতাপ্রিয়তা, স্বাধীনতাপ্রিয়তা।

(৯) অনুশীলনপ্রিয়তা।

(১০) আশ্চর্য্য, বিস্ময়।

(১১) স্নেহ, প্রণয়, দয়া।

(১২) ভক্তি।

মার্টিনো ভক্তিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন; তিনি সত্যপ্রিয়তাকেও ভক্তির সমতুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বাস্তবিক সত্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা ব্যতীত ভক্তি ভক্তিই নহে। প্রকৃত ভক্তিতে হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়েরই পূর্ণ বিকাশ আবশ্যক। তিনি বৃত্তিসমূহের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে সর্ব্ব প্রথমে লিখিত বৃত্তি নিকৃষ্টতম এবং সর্ব্বশেষে লিখিত বৃত্তি সর্ব্বোচ্চ। প্রত্যেক বৃত্তিই তাহার উপরে

লিখিত বৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং নিম্নে লিখিত বৃত্তি হইতে নিকৃষ্ট। এই ভাবে যখন দুইটি বৃত্তি আমাদের হৃদয়ে এক সময়ে উপস্থিত হইবে তখন যেটি শ্রেষ্ঠ সেই অনুসারেই কার্য্য করিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলিয়াছেন, মনে করুন একজন ইংরেজ বাঙ্গালীকে অত্যন্ত ঘৃণা করে; বাঙ্গালীর প্রতি তাহার বিদ্বেষ (antipathy) আছে; এখন সে অর্থ লোভের (love of gain) বশবর্ত্তী হইয়া এক বাঙ্গালী কন্যাকে বিবাহ করিল; তাহার এই কার্য্য ন্যায়ানুমোদিত কি না? ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন বৃত্তিসমূহের তালিকায় দেখা যায় যে বিদ্বেষ (antipathy) লোভের (love of gain) নিম্নে লিখিত; সুতরাং লোভের সঙ্গে তুলনায় বিদ্বেষ ভাবই শ্রেষ্ঠ প্রবৃত্তি; কিন্তু যদি সে ভালবাসা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এই বিবাহ করিত তবে কার্য্যটি ভাল হইত; কারণ ভালবাসা (social affection) বিদ্বেষভাব (antipathy), হইতে শ্রেষ্ঠতর বৃত্তি।

এইরূপে দেখা যায় কোন একটি কার্য্য করা কর্ত্তব্য কি না তাহা নির্ণয় করিতে হইলে কি উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সেই কার্য্য করিতে হয় তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক; তদনুসারেই কার্য্যের ঔচিত্যা-নৌচিত্য স্থিরীকৃত হইবে। মার্টিনো বৃত্তিসমূহের গুণানুসারে যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন উহা বিবেক দ্বারাই অধিগত, না ইহার মধ্যে কতক-পরিমাণে অভিজ্ঞতার ফল আছে তাহা বলা যায় না। আর ইহাও ঠিক যে কেবল উদ্দেশ্য দেখিয়া কার্য্যের বিচার করিলে ন্যায় বিচার হয় না; অনেক সময়ে অবস্থা দেখিয়াও কার্য্যের গুণাগুণ বিচার করিতে হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি কোন স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাকে প্রতিদিন ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত স্কুলে কার্য্য করিতে হয়। এই সময়ে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সংক্রামক পীড়া আরম্ভ হইল;

কোন ব্যক্তি সেই স্থানে পীড়িত লোকদের শুশ্রূষা করিতে যাইতে ইচ্ছুক নহে। এখন সেই শিক্ষক কি আপনার অধ্যাপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেবাব্রতে ব্রতী হইতে পারেন? অনেকে বলিবেন লোকের জীবন রক্ষার্থ তাঁহার অধ্যাপনা পরিত্যাগ করা উচিত; কিন্তু বাস্তবিক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি না তদ্বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে। কারণ তিনি যখন ছাত্রগণের অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাহাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য; সেই কর্ত্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া যতদূর অন্য কার্য্য করিতে পারেন ততই মঙ্গল; কিন্তু অন্য কার্য্যের জন্য তিনি নিয়মিত কার্য্যের বাধা করিতে পারেন না। এইরূপ করিতে গেলে তাঁহা দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না, সংসারে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। আজ যদি তিনি অধ্যাপনা অবহেলা করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে শুশ্রূষা কার্য্যে যাইতে পারেন, তবে কল্য যখন অন্যত্র ইহা অপেক্ষাও অধিকতর ব্যারামের প্রকোপের কথা শুনিবেন, হয়ত তখন তিনি এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তথায় চলিয়া যাইবেন। এইরূপে তিনি প্রত্যহই স্থান ও কার্য্য পরিবর্ত্তন করিবেন, সুতরাং তাঁহার দ্বারা সংসারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হইবে না, কেহই তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে না। তবে যদি তাঁহার প্রাণ রোগীর শুশ্রূষার জন্য কাঁদিয়া উঠে তবে চিরকালের জন্য তিনি শিক্ষকতার কার্য্য হইতে বিদায় লইতে পারেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিনি শিক্ষক থাকিবেন সে পর্য্যন্ত নিজের এই বিশেষ কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়া অন্য কার্য্যে যাওয়ার তাঁহার অধিকার নাই। এস্থলে আর একটি কথা আছে; এমন যদি কাহারও ব্যারাম হয় যাহার তিনিই মাত্র অভিভাবক তাহা হইলে অনন্যোপায় হইয়া তাহার শুশ্রূষার জন্য যদি তিনি অধ্যাপনা কার্য্যের মধ্যে মধ্যে ব্যাঘাত করেন, তবে তাহাতে তাঁহার অপরাধ

নাই; তবে এস্থলেও যতদূর সম্ভব স্কুলের কার্য্যে তাঁহাকে মনোনিবেশ করিতে হইবে, যদি একান্ত দেখেন যে স্কুলের বিশেষ ক্ষতি হইতেছে তবে উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে, অথবা কার্য্য ত্যাগ করিতে হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, অবস্থাভেদে কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। একই কার্য্য এক অবস্থায় ন্যায় ও অন্য অবস্থায় অন্যায় বলিয়া বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে রামায়ণ হইতে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারেঃ—প্রজাবৎসল রামচন্দ্র লোকাপবাদ শ্রবণ করিয়া প্রজারঞ্জনার্থ বিনা দোষে পতিপ্রাণা প্রিয়তমা ভার্য্যা সীতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন; এই কার্য্যটি তাঁহার পক্ষে উচিত কি অনুচিত হইয়াছিল? বর্ত্তমান সময়ে নীতির যেরূপ আদর্শ তাহাতে রাম যদি এই যুগের লোক হইতেন তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা করিতাম; এবং তাঁহার এই কার্য্য অতি গর্হিত বলিয়া মনে করিতাম। কারণ যখন তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে সীতার নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্কের রেখা মাত্র স্পর্শে নাই, তখন বাহিরের লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বিনা অপরাধে তাঁহার গুরুতর শাস্তিবিধান করা অত্যন্ত অন্যায়। প্রজারঞ্জন, রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু প্রজার অন্যায় আবদার রক্ষা করিতে যে রাজা ব্যস্ত তিনি নিশ্চয়ই ভীরু, কাপুরুষ। বিশেষতঃ সীতা রামের যেমন স্ত্রী, তেমন আবার প্রজা; বিনা অপরাধে দশজন প্রজার অনুরোধে একজন প্রজার শাস্তিবিধান করা অত্যন্ত অন্যায়। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করাই রাজার ধর্ম্ম। রামচন্দ্র সেই নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন যে নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রোমান্ শাসনকর্ত্তা পাইলেট্ যীশুখৃষ্টকে নিরপরাধ জানিয়াও স্থানীয় লোকের

অনুরোধে ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের সমসাময়িক নীতির আদর্শ ও তাঁহার মনের উদ্দেশ্য দেখিলে আর তাঁহাকে দোষী বলিতে পারা যায় না।

সেই সময়ে যে কোন উপায়ে প্রজারঞ্জন করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব্বেই জনৈক ঋষি তাঁহাকে প্রাণপণে প্রজারঞ্জন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। রামও সেইরূপ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সীতাকে তিনি আপনার অঙ্গস্বরূপ মনে করিতেন; সীতার নির্ব্বাসন আর আত্মনির্ব্বাসন তাঁহার নিকট একই কথা ছিল; বাস্তবিক সীতাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তিনি অযোধ্যায় থাকিয়াও সুখভোগ করিতে পারেন নাই। তিনি প্রজারঞ্জনের জন্য, তাহাদের সুখ শান্তির জন্য স্বার্থত্যাগের এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমাকে বিসর্জ্জন করিলেন, নিজেও একপ্রকার নির্ব্বাসিত হইলেন। এই নির্ব্বাসনে রাম অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইয়াছিলেন; সুখ শান্তি তাঁহার হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে অনেক সময়ে হস্তে আপনার হৃৎপিণ্ডও ছিন্ন করিতে হয়; তাই তিনি সীতাকে নির্ব্বাসিতা করিয়া আপনার সমস্ত সুখ শান্তি বিসর্জ্জন করিলেন। বর্ত্তমান্ শতাব্দীতে বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়নও দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণের প্রতিমা জোসেফাইনকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু রামে আর নেপোলিয়নে পার্থক্য এই যে, নেপোলিয়ন্ আবার গৃহী হইয়া সুখী হইলেন, ক্রমে জোসেফাইন্‌কে ভুলিতে লাগিলেন; আর রামচন্দ্র সীতাগত প্রাণ হইয়া শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বিবাহ করিতে পারিতেন; অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে ভার্য্যার আবশ্যক হওয়াতে

সকলে তাঁহাকে বিবাহ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু সীতাপতি রাম সে কথা গ্রাহ্য করিলেন না; গ্রাহ্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তিনি সোণার সীতা নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞ সমাপন করিলেন, ভার্য্যানুরক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। তথাপি কি রাম নিন্দনীয়? অবস্থা বিবেচনা করিয়া কার্য্যের বিচার করিলে রামের কখনও নিন্দা হইতে পারে না। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। বাস্তবিক উদ্দেশ্য ও অবস্থা অনুসারে কার্য্যের নৈতিক গুণের তারতম্য হয়। কোন্ কার্য্যটি উচিত, কোন্‌টি অনুচিত অন্যে তাহা বুঝাইতে পারে না; সাধক নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। মার্টিনোর প্রদত্ত তালিকা পূর্ণ না হইলেও ইহাদ্বারা সাধকের যে অনেক উপকার হইতে পারে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আর একটি প্রশ্নের কথা সাধকের মনে স্বতঃই উদিত হইতে পারে; সে প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুতর অথচ তাহার উত্তর দেওয়া বড়ই কঠিন। সে প্রশ্নটি এই—কোন সময়ে, কোন অবস্থাতে মিথ্যা কথা বলা যাইতে পারে কি না? মনে করুন রোগী রোগ যন্ত্রণায় জিজ্ঞাসা করিতেছে যে তাহার ব্যারামের কিরূপ অবস্থা; চিকিৎসক জানেন যে তাহার মৃত্যু অতি নিকট; তখন তিনি তাহাকে কি উত্তর দিবেন? একজন দস্যু, অথবা পাগল আসিয়া আমাকে কোন ব্যক্তির বিষয় জিজ্ঞাসা করিল; আমি জানি যে, ঐ দস্যু কিংবা পাগল তাহাকে পাইলেই হত্যা করিবে; সে ব্যক্তি কোথায় আছে তাহাও আমি জানি; এবং তাহাকে ঐ দস্যু কিংবা পাগলের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার শক্তিও আমার নাই; এই অবস্থাতে আমি প্রকৃত কথা বলিতে বাধ্য কি না? এ অতি কঠিন সমস্যা।

ডাক্তার মার্টিনো এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করিয়াছেন; তিনি বলেন মানুষ দুইটি কারণে সত্য কথা বলিতে বাধ্য। (১) যেরূপ ভাবে মানবসমাজ গঠিত তাহাতে মূলতঃ পরস্পরের মধ্যে একটি সন্ধি, একটি প্রতিজ্ঞা, একটি **covenant** রহিয়াছে; সেই প্রতিজ্ঞাটি এই যে পরস্পর পরস্পরকে সত্য ঘটনা (true facts) জানাইবে। প্রকাশ্যে পরিষ্কার রূপে এই প্রতিজ্ঞা করা হয় নাই বটে, কিন্তু সমাজেব মূলে ইহা বর্ত্তমান্ রহিয়াছে। এই প্রতিশ্রুতি যদি সমাজ বন্ধনের মূলে না থাকিত তবে সমাজ চলিতে পারিত না। সময়ে সময়ে মানুষ এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বলিয়াই সমাজে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। সুতরাং সমাজবদ্ধ মানবের নিকট সেই প্রতিজ্ঞানুসারে সকলেই সত্য কথা বলিতে বাধ্য। (২) প্রকৃতিতে যে ঘটনা ঘটে তাহা অটুট রূপে ভাবিতে ঈশ্বরের নিকট আমরা বাধ্য। প্রাকৃতিক ঘটনার নিয়ম (**Natural order of things**) অতিক্রম করিতে মানবের নৈতিক অধিকার নাই। সুতরাং মানুষকে সত্য কথা বলিতেই হইবে। এখন বর্ত্তমান ঘটনা সমূহে এই দুই কারণ প্রযোজ্য কি না তাহা বিচার করিয়া মার্টিনো বলেন যে পাগল কিংবা নরহত্যাকারী দস্যু, কিংবা আসন্নমৃত্যু রোগী 'প্রভৃতির নিকট প্রথম কারণে আমরা সত্যকথা বলিতে বাধ্য নহি। কারণ তাহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়াতে তাহারা মানব সমাজের বহির্ভূত হইয়াছে; বিশেষতঃ দস্যু ও পাগল সমাজ-দ্রোহী। তাহারা সমাজের (Social commonwealth) অন্তর্ভূক্ত নহে। সমাজবদ্ধ মানবের যে সকল অধিকার আছে তাহা উপভোগ করিতে তাহাদের কোন দাবী নাই। সুতরাং ইহাদের নিকট সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া সত্য কথা বলিতে মানুষ বাধ্য নহে। দ্বিতীয় কারণে প্রাকৃতিক ঘটনা

যথাযথ বর্ণন করিতে ঈশ্বরের নিকট মানুষ দায়ী ; এস্থলেও স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণের নিকট আমরা প্রকৃত কথাই বলিতেছি। সত্যপালন অবস্থা নিরপেক্ষ হইলেও সত্যকথা বলা অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হয়। কারণ নীরবেও সত্যপালন করা যায়, কিন্তু কথা বলিতে হইলেই অন্ততঃ দুইজন লোকের আবশ্যক ; এ স্থলে মানুষের চিন্তা যদি ঘটনার অনুযায়ী হইল, তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট আর অপরাধ রহিল না ; সুতরাং কথা বলিতে যাইয়া যদি এই সকল স্থলে প্রকৃত কথা না বলা হয় তাহাতে কোন দোষ ত হইতেই পারে না ; বরং এই সকল লোককে অনেক সময়ে কুপথ হইতে বিরত করা হয়। বিশেষতঃ বিকৃত মস্তিষ্ক লোকের নিকট কথা বলা আর বৃক্ষাদির নিকট কথা বলা একই কথা। তাহারা তাহাদের অধিকার লঙ্ঘন করিয়া আমার নিকট কথা জিজ্ঞাসা করে কেন ? যেমন তাহারা অন্যায়রূপে আমার নিকট প্রশ্ন করে সেইরূপ আমিও যদি প্রকৃত কথা না বলি তাহা হইলে আমার কোন দোষ হয় না, কারণ তাহারা মানব সমাজের (Social common wealth) বহির্ভূত, তাহাদের সঙ্গে সামাজিক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে বাধ্য আমরা নহি ; আর যখন আমার উদ্দেশ্য সৎ রহিয়াছে এবং চিন্তা ঘটনানুযায়ীই করিতেছি তখন এরূপ অবস্থায় প্রবঞ্চনা করিলে ঈশ্বরের নিকটও আমরা অপরাধী হইতে পারি না। মার্টিনো এই সকল কথা বলিয়া অবশেষে বলিয়াছেন যে যদিও যুক্তি দ্বারা দেখা যায় যে স্থান বিশেষে মিথ্যা কথা বলিলে কোন দোষ হয় না, কিন্তু হৃদয় ঐরূপ অবস্থাতেও মিথ্যা কখন সমর্থন করে না। আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলিতে উপদেশ দেয় না।

বাস্তবিক দেখিতে গেলে কোন্ অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলা

যায় না। প্রথমে সেই রোগীর বিষয় বিবেচনা করা যাউক; তাহার আসন্ন মৃত্যুর কথা বলিলে তাহার মনে এত আশঙ্কা হইতে পারে যে, মৃত্যু আরও নিকটতর হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে মৃত্যুকেই মহা অমঙ্গলকর ঘটনা বলিয়া মনে করা উচিত নয়। মৃত্যু মানবের নিশ্চিতই, তবে দুই একদিনের অগ্র পশ্চাৎ মাত্র। সুতরাং তজ্জন্য মিথ্যা কথা দ্বারা আত্মাকে কলুষিত করা বিধেয় নহে। অনেক সময়ে মৃত্যুকথা বলিলে রোগীর উপকারও হইতে পারে। আসন্ন মৃত্যু জানিয়া কেহ কেহ পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইতে পারেন এবং মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন। তবে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাবশ্যক স্থলে রোগের প্রাবল্যের কথা বলা কর্ত্তব্য নহে, কেবল এ স্থলে কেন, কোথাও অনাবশ্যক অপ্রিয় কথা সত্য হইলেও প্রকাশ করা উচিত নহে। তৎপর পাগল কিংবা দস্যু সম্বন্ধে এই বলা যাইতে পারে যে তাহারা হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির কথা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে আমি কোন উত্তর না দিতে পারি; এ বিষয়ে আমার পূর্ণ স্বাধীনতা রহিয়াছে; কিন্তু তাহাতে যদি তাহারা সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে আক্রমণ করে তবে আমি সেই ব্যক্তির রক্ষার জন্য ইহাদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারি; এবং অসমর্থ হইলে বরং তাহার জীবন রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে পারি, তবুও মিথ্যা কথা বলিতে পারি না। একজনের জীবনকে সত্য অপেক্ষা অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করা উচিত নহে। মানবজীবন অনন্ত কাল স্থায়ী; ইহজীবন রক্ষা করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য; কিন্তু যেখানে সত্যপথে চলিতে যাইয়া ইহজীবন বিনষ্ট হয় সেখানে মিথ্যাপথ অবলম্বন করিয়া অনন্ত জীবনে কলঙ্কের রেখা স্পর্শ করিতে দেওয়া সাধকের

কর্ত্তব্য নহে। অপরকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কিন্তু যেখানে অপরকে কিংবা নিজকে রক্ষা করিতে যাইয়া সত্যের অপলাপ করিতে হয়, সেখানে জীবনদানে সত্যকেই রক্ষা করা ধর্ম্মানুমোদিত। কোন অবস্থাতেই ইহজীবনের সামান্য মঙ্গলের জন্য মিথ্যাপথ অবলম্বন করা যাইতে পারে না।

সাধুর লক্ষণ।

প্রকৃত সাধু কে? সাধুর লক্ষণ কি? ইহা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। আমাদের দেশে গৈরিকবসন পরিহিত জটাজুটধারী গৃহত্যাগী অনেক সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের অনেকে অতি কঠোর শরীর নিগ্রহ করিয়া থাকেন, শীতাতপ সহ্য করিয়া থাকেন; অনেক কৃচ্ছ্রসাধন করেন। তাহাদের মধ্যে অনেক লোক আছেন যাঁহারা বাস্তবিকই ধর্ম্মপ্রাণ, প্রকৃত সাধু; তাঁহাদের সদা প্রসন্ন মুখমণ্ডল, জ্ঞান ও প্রেম বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন দর্শন করিলে প্রাণে আনন্দ হয়, হৃদয় পবিত্র হয়। কিন্তু আবার এমনও অনেক আছে যাহারা কেবল স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মের বহিরাবরণ ধারণ করে; এই শেষোক্ত লোকের সংখ্যাই সংসারে অধিক। সাধু সন্ন্যাসীদের দুষ্কার্য্য দেখিতে দেখিতে উহাদের প্রতি লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। সংসারে ভেকধারী সন্ন্যাসীর দল হইতে প্রকৃত সাধু চিনিয়া লওয়া দুষ্কর। আমাদের দেশের লোকের ধারণা এই যে সাধু হইতে হইলে সংসারের বাহির হইতে হয়; তাই তাহারা সাধুর অন্বেষণে সন্ন্যাসীর দলে যাইয়া উপস্থিত হয়। সাধু হইতে

হইলে যে সংসার পরিত্যাগ করিতে হয় এমন নহে। মানব-ইতিহাসে সংসারী ও উদাসীন উভয় দলের মধ্যেই ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধু দেখিতে পাওয়া যায়। রাজর্ষি জনক, ধর্ম্মপ্রাণ মহম্মদ্ প্রভৃতি মনীষিগণ গৃহী হইয়াও ধর্ম্মের উচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিলেন; আবার বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ ধর্ম্ম লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যায় যে সংসারে থাকা কিংবা সংসার পরিত্যাগ করা, বিশেষ প্রকারের বেশভূষা ধারণ করা প্রভৃতি ব্যাপারের উপর সাধুতা নির্ভর করে না। সাধুতা কোন প্রকার বহিরাবরণে নিহিত নহে; উহা অন্তরের জিনিষ। দেশ, কাল ও জাতি নির্ব্বিশেষে সকলেই সাধুতা লাভ করিতে পারে। যাঁহার হৃদয়ে সাধুতা আছে, যিনি ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন, যাঁহার প্রাণে ভগবান্ একবার প্রকাশিত হইয়াছেন তাঁহার কি এক অপূর্ব্ব শ্রী হয়, কি এক তেজ হয়, কি এক প্রেমের ভাব হয় তাহা দর্শন করিয়া জগৎ চমকিত ও মোহিত হইয়া যায়।

ভগবদ্গীতায় নানা স্থানে সাধুর লক্ষণ বর্ণিত আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যখন সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া, সমস্ত আসক্তি বর্জ্জিত হইয়া মানুষ ঈশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ করে তখনই সাধুতা লাভ হয়।

গীতা বলিতেছেন:—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥
"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥
"যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥
"রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥
"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসোহ্যাশু বুদ্ধিঃপর্য্যবতিষ্ঠতে ॥
"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতোমুনেঃ ॥
"আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী।
"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥"

"হে পার্থ, আত্মাতে স্বয়ং তুষ্ট হইয়া যখন (সাধক) মনোগত সমুদয় কামনা পরিত্যাগ করেন তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন।

"যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, যিনি অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত সেই ব্যক্তিকে স্থিতধী মুনি বলা যায়।

"যিনি সকল বিষয়েই আসক্তিশূন্য এবং সেই সেই শুভ বা অশুভ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত বা বিষাদিত হন না তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"যখন তিনি ইন্দ্রিয় বিষয় সকল হইতে কচ্ছপাঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদা প্রত্যাহৃত করেন তখন তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়।

"আসক্তি ও দ্বেষহীন আত্মবশীভূত ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা বিষয় ভোগ করিলেও বশীভূতচিত্তব্যক্তি শান্তিলাভ করেন।

"(চিত্ত) প্রসাদ জন্মিলে তাঁহার সর্ব্ব দুঃখের বিনাশ হয়; প্রসন্নচিত্তব্যক্তির বুদ্ধি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়।

"(অজ্ঞানাচ্ছন্ন) সর্ব্বভূতের পক্ষে যাহা নিশাস্বরূপ তাহাতে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি প্রবুদ্ধ থাকেন, যাহাতে (বিষয়বুদ্ধিতে সর্ব্বভূত প্রবুদ্ধ থাকে তাহা আত্মতত্ত্বদর্শী মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ।

"যেমন নানা নদীকর্ত্তৃক আপূর্য্যমাণ হইয়াও অচঞ্চল, এতাদৃশ সমুদ্রে (অনন্ত) জল প্রবেশ করে (তাহাতেই মিশাইয়া যায়) সেইরূপ যাহাতে কামনা সকল প্রবেশ করে (লীন হয়) তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন কিন্তু ভোগ কামনাশীল ব্যক্তি শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

"যে ব্যক্তি সমুদায় কাম্যবস্তু উপেক্ষা করিয়া নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও ভোগসাধনে আসক্তি শূন্য হইয়া ভোগাদি করেন অথবা যেখানে সেখানে ভ্রমণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন।"

সাধু হইতে হইলে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিতে হয় না। বরং অনাসক্ত ভাবে ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হয়। এ সম্বন্ধে গীতা কি বলিতেছেন দেখুন :—

"ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোহশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥"

"লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।"

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥"

"অতএব তুমি ফলাসক্তি শূন্য হইয়া সর্ব্বদা অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের

অনুষ্ঠান কর। যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হন।"

সাধু যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মেতেই সমর্পণ করিবেন।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্‌যৎকর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

"গৃহস্থ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন; এবং যে যে কর্ম্ম করিবেন সমস্তই ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।"

অনেক সময়ে সাধুর কোন কার্য্যের আবশ্যক হয় না বটে, কিন্তু লোক শিক্ষার জন্য অনেক রকম আচরণ করিতে হয়; এসম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন:—

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা তাহা করে; তিনি যাহা প্রমাণ করেন লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।"

সাধু কি রকম আহার বিহার করিবেন, তৎসম্বন্ধে গীতা বলিতেছেন:—

"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥"

"হে অর্জ্জুন, অত্যধিক ভোজনকারীর যোগ হয় না, একান্ত অনাহারীরও হয় না, অতি নিদ্রাশীলেরও হয় না, অতি জাগরণশীলেরও হয় না।

যিনি নিয়মিত আহার বিহার করেন, কর্ম্ম সকলে নিয়মিতরূপে চেষ্টা করেন এবং নিয়মিতরূপ নিদ্রিত ও জাগরিত থাকেন, তাঁহার যোগ দুঃখ নিবারক হয়।"

সাধুর প্রকৃতি কিরূপ, তাঁহার কিরূপ সন্তোষ, লোকের প্রতি কিরূপ ভাব, ঈশ্বরে কিরূপ প্রীতি তাহা প্রদর্শন করিয়া গীতাকার বলিতেছেন :—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি নাকাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥"

"ব্রহ্মে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (নষ্ট বস্তুর জন্য) শোক করেন না এবং (অপ্রাপ্ত বস্তু) আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বভূতে সমান হইয়া অতি শ্রেষ্ঠ মদ্ভক্তি লাভ করেন।"

"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ;
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥"

"সর্ব্বজীবে সমভাবে অবস্থিত ও মরণশীলগণের মধ্যে অবিনাশী পরমাত্মাকে যিনি দেখেন, তিনিই সম্যক্ দেখেন।"

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥"

"সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত পরমাত্মদর্শনকারী আপনাকে কষ্ট দেন না, তজ্জন্য শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন।"

গীতাকার অন্যত্র বলিতেছেন :—

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধি র্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

"যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
"অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
"যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥
"তুল্য নিন্দা স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥
"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ।"

"সর্ব্বভূত সম্বন্ধে অদ্বেষ্ট, মৈত্র, কৃপালু, আসক্তিহীন, নিরহঙ্কার, সুখে দুঃখে সমজ্ঞানী, ক্ষমাশীল, সদাসন্তুষ্ট সংযতচিত্ত, যোগী, মদ্বিষয়ে (ঈশ্বর বিষয়ে) স্থির লক্ষ্য ও আমাতে মনোবুদ্ধি সমর্পণকারী যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

"যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হন না, আর যিনি হর্ষ, পরশ্রীকাতরতা, ভয় ও চিত্তক্ষোভ হইতে মুক্ত তিনি আমার প্রিয়।

"সকল বিষয়েই নিস্পৃহ, শুচি, অনলস, উদাসীন (পক্ষপাতশূন্য) চিন্তাশূন্য এবং সমুদয় উদ্যম পরিত্যাগী যে আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়।

"যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় পাইয়াও দ্বেষ করেন না, ইষ্টনাশে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাক্ষা করেন না ও যিনি শুভাশুভ পরিত্যাগী ও মদ্ভক্তিমান্ তিনি আমার প্রিয়।

"শত্রু ও মিত্রে এবং মান ও অপমানে একরূপ, শীতোষ্ণ, সুখ দুঃখে বিকারশূন্য, আসক্তিশূন্য, নিন্দা ও প্রশংসায় সমভাবাপন্ন, মৌনী, যৎকিঞ্চিৎ পাইলেই সন্তুষ্ট, বাসস্থান হীন, স্থিরচিত্ত, এতাদৃশ ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়।

"যাঁহারা উক্তবিধ এই অমৃতরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, শ্রদ্ধাশীল, মৎপরায়ণও আমার ভক্ত, তাঁহারা আমার অতীব প্রিয়।"

গীতাকার অতি সুন্দরভাবে সাধুর লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তাঁহার সর্ব্বজীবে সমানভাব; তিনি সুখেও হৃষ্ট হন না, দুঃখেও অভিভূত হন না, সুখ, দুঃখ, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দাস্তুতি এই সকলের অতীত হইয়া তিনি ব্রহ্মেতেই স্থিতি করেন এবং প্রাণে ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিয়া সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে দিন অতিবাহিত করেন।

সাধুদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাদের কার্য্য অকার্য্য অন্যে নির্ণয় করিতে পারে না; ভগবান্ যাঁহাকে যেরূপ আদেশ করেন, তিনি সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাই দেখা যায় একদল ব্রহ্মনিষ্ঠ ধ্যান ধারণাতেই বিশেষভাবে রত থাকেন, সাধারণ কার্য্যে বিশেষভাবে আসিয়া যোগ দেন না; তাঁহাদের নিকট যাঁহারা ধর্ম্মার্থী হইয়া উপস্থিত হন, তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করেন। আবার আর এক শ্রেণীর ব্রহ্মভক্ত আছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে তাঁহার সত্য দেশ দেশান্তরে প্রচার করেন, লোকের দুঃখ যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হন। প্রথমোক্ত সাধুগণ যে দুঃখীর দুঃখ বিমোচনে প্রয়াসী নহেন, তাঁহাদের দুঃখে ব্যথিত নহেন তাহা নহে; তবে তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী পৃথক্; ঈশ্বর যাঁহাকে যেরূপ আদেশ করেন তিনি

সেইরূপই কার্য্য করিয়া থাকেন। প্রথমোক্ত ভক্তগণকে 'সাধু' (**saints**) বলা হইয়া থাকে; আর শেষোক্ত ধার্ম্মিকগণকে কর্ম্মবীর (**Heroes**) আখ্যা প্রদান করা হয়। বাস্তবিক দেখিতে গেলে উভয় শ্রেণীস্থ সাধুগণই পূজনীয়, ঈশ্বরের ভক্ত।

ধর্ম্ম যখন প্রাণে আসে, ঈশ্বর যখন অন্তরে প্রকাশিত হন, তখন জীবনের গতি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। তখন মনে হয় যেন এক নূতন রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছি, প্রকৃতির যবনিকা যেন উত্তোলিত হইয়াছে, জগতের সমস্ত রহস্য যেন ভেদ হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত সাধু কোন সাম্প্রদায়িক নিয়মে আবদ্ধ নহেন; ঈশ্বর তাঁহাকে যেরূপ আদেশ করেন তিনি সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার আর কিছুর অভাব থাকে না; পরম মাণিক যাঁহার হৃদয়ে জ্বলিতেছে, তিনি আর কিসের জন্য প্রার্থী হইবেন? তাঁহাকে দর্শন করিলেই মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। তিনি বেশী কথা বলেন না, বক্তৃতা করেন না, অথচ কোটি কোটি নরনারী তাঁহার অলৌকিক চরিত্র দর্শনে মোহিত হইয়া যায়; তাঁহাদের প্রাণে ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। "অনুরাগীর নয়ন দেখ্‌লে চেনা যায়"; বাস্তবিক ভক্ত যিনি, তাঁহাকে দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। তাঁহার শরীরের সংস্পর্শে চারিদিকের বায়ু পবিত্র হয়; যিনি একজন সাধু দর্শন করিয়াছেন তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন। সাধুর স্পর্শে পাপী নবজীবন লাভ করে; তাঁহার দৃষ্টিতে এমন মধুরতা, এমন কোমলতা, এমন প্রেম আছে, যাহাতে লোক একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া যায়, দুর্দ্দান্ত নরহত্যাকারীর হস্ত হইতে উত্তোলিত অসি স্খলিত হয়, পাপাসক্ত হৃদয় পবিত্রভাবে পূর্ণ হয়। তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করে; তাঁহার অসীম করুণার স্রোত দীন

দুঃখীর প্রতি অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মেতেই তাঁহার সুখ, ব্রহ্মেতেই তাঁহার শান্তি; তিনি দিন রাত্রি কেবল ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন। প্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস প্রশমিত হয় বটে, কিন্তু প্রবল ভক্তির স্রোত অন্তরে অন্তরে খরবেগে প্রবাহিত হয়। সে স্রোতে জগতের নরনারীর পুঞ্জীকৃত পাপরাশি ভাসিয়া যায়। তাঁহার চিত্ত সর্ব্বাদাই প্রসন্ন। তিনি ব্রহ্মে স্থিত হইয়া সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করেন এবং তদ্গতচিত্তে তাঁহার আদেশ পালন করেন।

নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক নিয়ম।

এখানে নৈতিক আদর্শ ও নৈতিক নিয়মের যে প্রণালী দেওয়া হইল, তাহা ডাঃ মার্টিনোর অনুমোদিত। সকলে এ প্রণালীর অনুমোদন করেন না। অনেকে conscience—বিবেক—বলিয়া যে পাপ পুণ্য নির্ণয় করিবার এক শক্তি আছে, তাহাই স্বীকার করেন না। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজে বিবেকের খুব আধিপত্য ছিল। পাছে মিথ্যা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে প্রত্যেক কথাতে ব্রাহ্মগণ "বোধ হয়" বলিতেন। তখন পাপবোধ, অনুতাপ, ক্রন্দন, প্রার্থনার ভাব খুব প্রবল ছিল। এখন সে পাপবোধও নাই, অনুতাপ, ক্রন্দনও নাই, প্রার্থনার প্রাবল্যও নাই। ইহা যে অবনতির লক্ষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একদল দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা "আনন্দ" চান; আমি সে আনন্দবাদী দলের কথা বলিতেছি না, যাঁহারা সুখে, দুঃখে, সর্ব্ব অবস্থায় কেবল আনন্দময়ের লীলাই দেখেন, দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আনন্দ সম্ভোগ করেন। বর্ত্তমান আর একদল আছেন, তাঁহারা আনন্দের উপাসক।

ভগবান আনন্দময়; তাঁহার আনন্দ রস সম্ভোগ করাই ত লক্ষ্য। কিন্তু তাহা ঈশ্বরের করুণা ও সাধন সাপেক্ষ। যাঁহারা আনন্দময়ের আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও সংগ্রাম, পরীক্ষা, অনুতাপ ও ক্রন্দনের ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

(১) আমারেও কর মার্জ্জনা,

আমারেও দেহ নাথ অমৃতের কণা।

(২) হৃদয়-বেদনা বহিয়া প্রভু, এসেছি তব দ্বারে।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী গাহিয়াছেন—

ভাই রে, গভীর পাপের কালি ঘুচিবার নয়,

বিনা তাঁরি কৃপা বারি জানিও নিশ্চয়।

ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গাহিয়াছেন—

(১) মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়?

(২) পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই।

বাল্য অবস্থাতেই আনন্দের অনুসরণ করার অর্থ আমোদ-প্রমোদকেই আনন্দ মনে করা। ধর্ম্ম জীবন লাভ করা তত সহজ নয়। তুমি হাসিয়া খেলিয়া আমোদ করিয়া বেড়াইবে, আর বলিবে, আনন্দময়ের স্পর্শ সম্ভোগ করিতেছি, তাহা হইবে না। পাপবোধ, অনুতাপ, কাতর ক্রন্দন ও প্রার্থনা চাই। এই অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যেক সাধককে যাইতেই হইবে।

আমাদের প্রাণে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তির অনন্ত আদর্শরূপে ভগবান্ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। মানুষ যত বড় জ্ঞানী, প্রেমিক, পুণ্যবান্ বা শক্তিশালীই হউক, সে অনুভব করে, সে অতি সামান্যই জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তি লাভ করিয়াছে। এই যে ক্ষুদ্রতা বোধ, ইহা কোথা

হইতে আসিল? প্রাণের ভিতরে অনন্ত জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তির উৎস ভগবান্ রহিয়াছেন, তাই মানুষ যতই উন্নত হউক সে আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে ক্ষুদ্র বোধ করিতেছে। এখানেও নীতিজ্ঞানের একটি প্রণালী গঠিত হইয়াছে, ভগবান্ প্রাণে থাকিয়াই মানুষকে উন্নততর জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শক্তির পথে আহ্বান করিতেছেন। সুতরাং ডাঃ মার্টিনোর পন্থা যাঁহারা অনুসরণ করিতে চান না, তাঁহাদের প্রাণেও ভগবান্ নীতির আদর্শ প্রকাশ করেন।

ব্রাহ্মসমাজের বাণী।

গত মাঘোৎসবের সময় (১৯৩২) "ব্রাহ্মসমাজের বাণী" বিষয়ে দুই দিন মন্দিরে বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রথমদিনে আমি হাসপাতালে ছিলাম। অপর দিনের বক্তৃতাও দূর হইতে শুনিতে পাই নাই, আর শেষ পর্য্যন্ত থাকিতেও পারি নাই। সুতরাং শ্রদ্ধেয় বক্তৃগণ কি বলিয়াছেন, তাহা জানি না। এখানে এ বিষয়ে আমার কি ধারণা তাহাই বলিতে চাই।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম ও প্রধান বাণী "একমেবাদ্বিতীয়ম্"—ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, ঈশ্বর সত্যস্বরূপ, নিরাকার, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের আধার। একমাত্র তাঁহারই উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধিত হয়। এই উপাসনা কি? কাঙ্গাল হরিনাথ গাহিয়াছেন—

শক্তি পূজা কথার কথা না।
যদি কথার কথা হ'ত
চিরদিন ভারত
শক্তি পূজে শক্তিহীন হ'ত না।

সুধু ডাকের গয়নায়, ঢাকের বাজনায়
শক্তি পূজা হয় না।

এক মনো-বিল্বদল ভক্তি গঙ্গাজল

হৃদয় শতদল দিলে হয় সাধনা।

দিলে আতপান্ন কি মিষ্টান্ন

মা যে তাতে ভোলেন না।

এক জ্ঞান-দীপ জেলে একান্তে ধূপ দিলে

ব্রহ্মময়ী পূর্ণ করেন কামনা।

বনের মহিষ অজা মায়ের বাছা

মা সে বলি লন না।

যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ

বলিদান কর বিলাস বাসনা।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব—এক নিরাকার, সত্যস্বরূপ জ্ঞান প্রেম পুণ্যের আধার পরমেশ্বরে প্রীতি ও সেই প্রীতিদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্য অনুভব করিয়া জনসেবাই তাঁহার উপাসনা।

এই উপাসনা আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিকতা ব্রাহ্মসমাজের আর একটি বাণী। **God is a spirit and He must be worshipped in spirit and in truth** ঈশ্বর নিরাকার চিন্ময় আত্মা—তাঁহার সত্য উপাসনা করিতে হইবে। ধূপ, ধূনা, নৈবেদ্য, পত্র, পুষ্প ও ফলে তাঁহার উপাসনা হয় না। তাঁহার উপাসনা আধ্যাত্মিক—প্রেম ভক্তি ও আত্মসমর্পণ ও জন সেবা দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। আধ্যাত্মিকতা ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম বাণী। ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম বাণী—স্বাধীনতা। আধ্যাত্মিকতা হইতে স্বাধীনতা আসিয়াছে। ঈশ্বর হৃদয়ে হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। তিনি হৃদয়ে থাকিয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ

করিতেছেন। সুতরাং ধর্ম্মলাভের জন্য অভ্রান্ত শাস্ত্র কি অভ্রান্ত গুরুর প্রয়োজন নাই। It is not that God spake in ancient times but He also speaketh now. পরমেশ্বর যে প্রাচীন কালেই কেবল ঋষিদের অন্তরে কথা বলিতেন তাহা নহে, তিনি এখনও সকলের হৃদয়ে কথা বলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ ভাবে তত্ত্বসকল পাওয়া যায়। তবে সকল শাস্ত্র, সকল দর্শন, বিজ্ঞান, সকল ভক্তবাণী, সকল সাহিত্য, ইতিহাস, যাহাতে সত্য পাওয়া যায়, তাহাই শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিতে হইবে। সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ সত্যই অবিনশ্বর শাস্ত্র। দেল্ কেতাবে ভগবান্ যে সত্য প্রকাশ করেন তাহার সঙ্গে সব মিলাইয়া লইতে হইবে। কেবল এই ধর্ম্মবিষয়েই যে স্বাধীনতা, তাহা নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। সমাজ ছিল ব্রাহ্মণ ও দলপতিগণের অধীন, দেশ ছিল রাজার অধীন। ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিলেন, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীন; প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে ব্রহ্ম বিরাজিত থাকিয়া নূতন নূতন তত্ত্ব সাক্ষাৎভাবে প্রকাশ করেন। পূর্ব্বে এদেশে সমাজ গঠনে জাতিভেদ ছিল, ব্রাহ্মণজাতিরই আধিপত্য ছিল। পরিবার গঠনে নারীজাতির স্থান অতি নিম্নে ছিল; শিক্ষা ও স্বাধীনতা তাহার ছিল না। ব্রাহ্মসমাজ ঘোষণা করিলেন—

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার
যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি,
নাহি জাত বিচার।

কাঙ্গাল হরিনাথ গাহিয়াছেন :—

কাঙ্গাল কয় কাতরে, জাত বিচারে
শক্তি পূজা হয় না।

সকল বর্ণ এক হ'য়ে ডাক মা বলিয়ে
নইলে মায়ের দয়া কভু হবে না।
নইলে ভারতের দুঃখ কভু যাবে না।

জাতি ভেদের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণেতর জাতি মুক্তি লাভ করিলেন। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা হইল। সমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। সুখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজ যে সকল সামাজিক অসাম্য দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন; ব্রাহ্মগণ নির্য্যাতিত হইয়াছেন, দেশ সেই সকল সংস্কারের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছেন। জাতিভেদ দূর হইতেছে, নারা জাতি শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছেন। অসবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইতেছে, বাল্য বিবাহ উঠিয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে সকল দেশেই রাজারই প্রজার উপর অধিকার ছিল। প্রজার কোনও অধিকার ছিল না। রাজা রামমোহন রায় দেশ শাসনেও প্রজার অধিকার ঘোষণা করিলেন। অপর দেশের স্বাধীনতার পতাকা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। স্বাধীনতার সংগ্রামে কোনও দেশ পরাজিত হইয়াছে শুনিয়া দুঃখে ক্ষোভে ম্রিয়মান হইলেন। তদবধি ব্রাহ্মসমাজ রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান সংগ্রামেও কত ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকা নির্য্যাতন সহ্য করিতেছেন। স্বাধীনতা—সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতাই ব্রাহ্মসমাজের বাণী। ব্রাহ্মসমাজের সংগ্রাম—স্বাধীনতার সংগ্রাম।

ব্রাহ্মসমাজের আর একটি বাণী উদারতা ও সার্ব্বভৌমিকতা। ধর্ম্ম কোনও বিশেষ শাস্ত্র কিংবা সাধুতে আবদ্ধ নহে। ব্রাহ্মসমাজ সকল ধর্ম্মকেই সম্মান করেন। সকল শাস্ত্র, সকল সাধুর নিকটই অবনত মস্তকে শিক্ষা গ্রহণ করেন। কেবল তাহা নহে; বিজ্ঞান

দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, নাটক, নভেলেও যদি সত্য থাকে ব্রাহ্মসমাজ অবনত মস্তকে সে সত্য গ্রহণ করিবেন।

From the most minute and mean
A virtuous mind can moral glean.

অতি সাধারণ ও সামান্য বিষয় হইতেও ধর্ম্মপ্রাণ হৃদয় নীতি গ্রহণ করিতে পারেন। বেদ পুরাণ, বাইবেল কোরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র হইতেই সাধুবচন গ্রহণ করেন। ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিয়া স্বয়ং যখন তত্ত্ব প্রকাশ করেন, তখন সেই প্রকাশিত তত্ত্ব সার্ব্বভৌমিক। সকলের প্রাণেই সেই তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

আর একটি বাণী—নীতিমূলকতা। অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে—যাঁহারা ভক্তির চর্চ্চা করেন কিন্তু নীতির সঙ্গে ধর্ম্মের যে অচ্ছেদ্য, সম্বন্ধ তাহা কার্য্যতঃ স্বীকার করেন না। ব্রাহ্মসমাজ বলেন ধর্ম্ম নীতি ছাড়া হয় না। পবিত্র হও, সত্যনিষ্ঠ হও, তবে ধর্ম্মসাধন হইবে। নীতি বিনা ধর্ম্ম হয় না।

আর একটি বাণী—সামাজিকতা। অনেক ধর্ম্মে যোগ, জ্ঞান, ভক্তি সাধনের ব্যবস্থা আছে,—কিন্তু তাহা সমাজ বিমুখ। ধর্ম্ম যদি চাও, সমাজ পরিত্যাগ কর; নির্জ্জন গিরিগুহায় যাইয়া সাধন কর। ব্রাহ্মসমাজ বলেন, ধর্ম্মসাধনের ক্ষেত্র এই গৃহপরিবার, এই সমাজ। সমাজের সেবা কর, দুঃখীর দুঃখ বিমোচন কর; নিরন্নকে অন্ন দান কর, রোগগ্রস্তের সেবা কর, সমাজ সংস্কার কর, অর্থনৈতিক উন্নতি কর; রাজনৈতিক অধিকার লাভের চেষ্টা কর। স্ত্রী পুত্র পরিবার বন্ধন নহে। তাহারাই ধর্ম্মসাধনের সহায়। সমাজ ও ধর্ম্মের সেবা কর। ঈশ্বরে প্রীতি রাখিয়া, তাঁহার প্রীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্য বোধে মানবের ও জীবজন্তুর সেবা কর। ধর্ম্ম সমাজ ত্যাগে নহে; সমাজের সেবাতে।

আর একটি বাণী এই—সর্ব্বাঙ্গীনতা। ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গীন ও সর্ব্বতোমুখীন। জীবনে এমন কোনও বিভাগ নাই যাহা ধর্ম্মের অধিকারের বাহিরে। তুমি ধর্ম্মসাধন করিতে চাও? জীবন ঈশ্বরের হাতে দাও। তাঁহার প্রীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার প্রীতির জন্য জীবনের প্রত্যেকটি কার্য্য কর। প্রতি পাদবিক্ষেপে তাঁহাকে স্মরণ কর। আপনার পরিবার পালন, বিদ্যা শিক্ষা, অর্থ উপার্জ্জন, জনশ্রেয়ঃ সাধন, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির চেষ্টা, ধর্ম্মপ্রচার সকলই ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত। কোনও কাজ নাই যাহা ধর্ম্মের অধিকারের বাহিরে। সুতরাং জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, ভাব ও কার্য্য, প্রত্যেক ঘটনাটিতে ঈশ্বরকে প্রাণে রাখিয়া চলিতে হইবে।

আর এক ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায়রূপে একটি মন্ত্র আছে। তাহা—'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্'। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্মের আর একটি বাণী—পরিবারে ধর্ম্মসাধন।

এ সাধনের জন্য মহর্ষি শিখাইয়াছেন—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

হে লোকেশ, হে চৈতন্যময় অধিদেব, হে মঙ্গলময় বিভো, তোমার আজ্ঞাতে লোকের হিতের জন্য ও তোমার প্রীতির জন্য আমি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিব।

সম্পূর্ণ